কথামৃত – তৃতীয় পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ঠাকুর শীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে কেদারের উৎসব

মাস্টারমশাই এই পর্বে একসঙ্গে অনেক দিনের কথা বলছেন; ১৩ই অগস্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পর পর কয়েক দিনের কথা এই অংশে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য ভক্তসঙ্গে আছেন।

কথামৃতে শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্যের কথা অনেকবার আসে। হালিসহরে তাঁর বাটি। সরকারী অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করতেন। অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন; সেখানে থাকার সময় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর সাথে সর্বদা ঠাকুরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এখানে কেদার চাটুজ্যের সম্বন্ধে বলছেন, **"ঈশ্বরের কথা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত"**। যাঁরা সাত্ত্বিক ভক্ত, বিশেষ করে যাঁদের মধ্যে বৈষ্ণব ভাব বেশী, তাঁদের এই জিনিস হয়, ঈশ্বরের কথা শুনলে চোখে জল চলে আসে। বলছেন, কেদার আগে ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে এই দিন কেদার উৎসব করেছেন। সমস্ত দিনটা আনন্দমুখরিত। একজন গানের ওস্তাদও এসেছেন।

সমাধিতত্ত্ব, সর্বধর্ম-সমণ্বয়, এই জিনিসগুলি নিয়ে ঠাকুর কথা বলছেন। **ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে সমাধিতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, "সচ্চিদানন্দলাভ হলে সমাধি হয়। তখন কর্মত্যাগ হয়ে যায়"**।

ঠাকুরের আগমনের আগে ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তখন বিভিন্ন সন্ত-মহাত্মারা নিজের মত সাধনা করতেন। কোন একজন গুরুর কাছে যেটা শিখেছেন, সেটাকে অবলম্বন করে সাধনা করে, সিদ্ধিলাভ করে নিজের শিষ্যদের বা যেখানে থাকতেন সেখানকার লোকেদের শিক্ষা দিতেন। ফলে অন্য অঞ্চলের সাধকরা কি সাধনা করেছেন বা করছেন, সেই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকতেন না। যেমন বাংলার একজন সত্যিকারের বড় সাধকের পাঞ্জাবে যে অন্য একটা সাধনার ধারা আছে, সেই ব্যাপারে তাঁর কোন ধারণা থাকত না।

আজকে যে আমরা হিন্দু ধর্মে এত শাস্ত্র দেখি, তার একটা বড় কারণ এটাই, একটা যে সেন্ট্রাল অথরিটি ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথগুলিকে, সমস্ত রীতি-নীতিকে সংগ্রহ করে এনে ভুলভ্রান্তিগুলিকে সংশোধন করে একটা জায়গা দাঁড় করাবেন, সেটা হিন্দু ধর্মে নেই। কথামৃত খুব ভাল করে পড়লে দেখা যাবে, ঠাকুর-স্বামীজী আসার পর থেকেই ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের সব কিছু এক জায়গায় চলে এসেছে। গীতাতে সমণ্বয় করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক ঠিক সমণ্বয় বলতে যেটা বোঝায়, হিন্দুদের বিভিন্ন ধারা যে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা ঠাকুরের সময়েই হয়েছে।

ঠাকুর বলছেন, সচ্চিদানন্দলাভ হলে সমাধি হয়। এখন সচ্চিদানন্দ শব্দ বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই, আচার্য শঙ্করও সচ্চিদানন্দের প্রচুর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোন তর্কাতর্কিতে না গিয়ে, যদি গভীরে গিয়ে আধ্যাত্মিক বিচার করতে শুরু করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, আমরা যে কোন জিনিসের যে জ্ঞানলাভ করি, সেখানে দুটি বুদ্ধি থাকে। আচার্য শঙ্কর যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন সেগুলিকে আধার করেই

আমরা বলছি। আমরা যখন বলছি, এই ফুল আছে, সচরাচর ভাবে আমরা মনে করি, ফুল আছে জানলাম, এটাই জ্ঞান। আচার্য শঙ্কর বলছেন, না, ওখানে দুটি বুদ্ধি থাকে – একটা 'ফুলের' বুদ্ধি, আরেকটা 'আছে' বুদ্ধি, অস্তিত্বের বুদ্ধি; দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বুদ্ধি। আগামীকাল যদি সব ফুলের নাশ হয়ে যায়, 'আছে' এই বুদ্ধিটা থেকে যাবে। শীতকালে যে ফুল দেখা যায়, গরমকালে সেই ফুলগুলো আর দেখা যাবে না, তখন অন্য ফুল এসে যাবে। কিংবা ফুলের মধ্যে ফল নেই, ফলের মধ্যে ফুল নেই। ফুল ঝরে গেল, কিন্তু ফল এসে গেছে। তার মানে 'আছে' এই বোধটা সব সময় থাকছে। একটা বস্তুর বোধ যদি চলেও যায়, কিন্তু অস্তিত্ব বোধটা থেকে যায়।

আরও সহজ করে যদি দেখা হয়, সমুদ্র আছে তার সঙ্গে ঢেউও আছে, একটা ঢেউ চলে গেলে অন্য ঢেউ থাকবে, তার মানে যতক্ষণ এই সমুদ্র আছে ততক্ষণ ঢেউও আছে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, এই রকম বিচার করে করে সমস্ত বস্তুকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তখনও কিন্তু অস্তি বোধটা থেকে যাবে, 'আছে' এই জিনিসটা থাকবে। যখন ওই জায়গাতে পৌঁছে গেল, 'অস্তি', 'আছে' শুধু এটা যখন থেকে যায় আর বাকি সব কিছু চলে যায়, তখন এটাকে তিনি বলছেন – 'সৎ', 'আছে', যেটাকে বলছেন pure existence। যেমন, আমি এই কলমটাকে নিলাম, আমি এখন কলমের pure existenceটা দেখছি, আমি সেই সৎকেই দেখছি, কিন্তু কলম রূপে দেখছি। এই কলম যদি চলে যায়, বই রূপে দেখব, বইটা যদি চলে যায়, এই মাইক্রোফোন রূপে দেখব।

আমরা সব সময় সৎকে দেখছি, কিন্তু আলাদা আলাদা রূপে। এই আলাদা আলাদা যত বস্তু আছে, সব বস্তুকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তারপরেও এই 'অস্তি' থেকে যাবে। এখন মানুষ যখন বোধ করে, এমনকি যখন ভুল বোধ করে, তখনও কিন্তু একটা বস্তু থাকে। যেমন যখন দড়িতে সর্পের ভ্রম হয়, তখনও কিন্তু ভ্রম জ্ঞানটা থাকে, একটা কিছু থাকে। যে জিনিসটা আছে, একমাত্র সেটারই জ্ঞান হয়। এখন মাত্র সৎই আছে, তার মানে যে জ্ঞানটা হয়, যখন জ্ঞানের ভিত্তিগুলিকে নামিয়ে নামিয়ে এক জায়গায় করা হবে, তখন দেখা যাবে সৎই আছে। তার মানে যা কিছু জ্ঞান হয় সৎরই জ্ঞান হয়। তাহলে এই জ্ঞান কার হবে? কারণ অন্য কিছু তো নেই, আছে তো শুধু সৎ। তার মানে সৎ আর জ্ঞান এক। আর মানুষ আনন্দ যেটা পায়, সেটা ভাবে পায়। ভাব মানে যেটা আছে, অভাব জিনিসটা সব সময় দুঃখ দেয়। একটা জিনিস যদি চলে যায়, সেটা সব সময় দুঃখ দেবে, মানুষকে নিরানন্দ দেবে। আনন্দ সব সময় তখনই হয় একটা জিনিসের মানুষ যখন জ্ঞান পায়, একটা জিনিস যখন আছে, তখনই জ্ঞান করে। যে জিনিসটা নেই তার জ্ঞান পাওয়ারও প্রশ্ন নেই।

এখন আছে শুধু সৎ। আর আমাদের ভিতরে যে আনন্দ, তা যে রূপেই আসুক, সুখ রূপে আসুক, ভালবাসা রূপে আসুক, সেটা আছে। একটা জিনিস আছে বলে আমরা যে একটা বোধ করি, এটাই সৎ। আমাদের যে একটা জ্ঞান হয়, বোধ হয় যে জিনিসটা আছে, এটাও সত্য, আর আমাদের যে আনন্দ হয়, এটাও সত্য। আনন্দ হওয়া মানেই মনে একটা বোধ হওয়া। শুদ্ধ চৈতন্য, চিৎ ছাড়া কিছু নেই, কারণ সৎ ছাড়া কিছু নেই। তার মানে সৎটাই চিৎ, চিৎটাই আনন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ; এই তিনটেকে মিলিয়ে বলেন – সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ মানে, যিনি সৎ তিনিই চৈতন্য, তিনিই আনন্দ। অন্যান্য ভাষ্যকাররা অবশ্য এটাকে মানবেন না।

যখন আমি বলছি ফুল আছে, এর মধ্যে ফুলটাকে যদি আমি না দেখি, তখন 'আছে'টাকে দেখব। এটা কখন হয়? এই যে বহু চিন্তা, এই বহু চিন্তাটা যখন চলে যায়। আমি যে নানান রকম জিনিস দেখছি, এই নানা যতক্ষণ দেখতে থাকব ততক্ষণ এক বোধ আসবে না। বহু বোধটা চলে যাওয়া মানে, আমার মনে জ্ঞানের যে বহু কিছু রয়েছে, এই বহুটা চলে যাওয়া। জ্ঞানের বহু চলে যাওয়ার পর যেটা থাকে, সেটা একও না দুইও না, যেটা আছে সেটা আছে। এটাকেই আমরা আগে বললাম সৎ, যেখানে মনে আর কোন ছাপ পড়ছে না, বাইরে থেকে ও ভিতর থেকে কোন ইনপুট আসছে না, মনে

কোন রকম চাঞ্চল্য হচ্ছে না, যোগশাস্ত্র যেটাকে বলছেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধ – এটাকেই বলছেন সমাধি। সমাধি হয়ে যাওয়া মানে, মন একেবারে শান্ত হয়ে গেল। গীতাতেও যখন সমাধি শব্দ আসে, সেখানেও তার অর্থ এটাই।

এখন সমস্ত কিছু শান্ত হওয়াও যা একত্ব বোধ হওয়াও তাই। এটাই অদ্বৈত, যেখানে বোধে বোধ করা হয়। কথায় কথায় অদ্বৈত জ্ঞান বলা হয় ঠিকই, কিন্তু অদ্বৈত জ্ঞান হয় না, অদ্বৈত জ্ঞান কখনই হতে পারে না। কারণ জ্ঞান হওয়া মানেই আমি আলাদা, বস্তু আলাদা এবং জ্ঞান আলাদা। কিন্তু যে ব্যাখ্যা করা হল যিনি বোধ করছেন তিনি সৎ, যাকে বোধ করছেন তিনি সৎ আর এই বোধের যে পদ্ধতি এটাও সৎ। এটাকেই ঠাকুর কথামৃতে অনেকবার বলবেন – ধাতা, ধ্যায়, ধ্যান এক; জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এক। কারণ যিনি সৎ তিনিই চৈতন্য হয়ে যান। এগুলো শোনার পর দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কি করে জিনিসগুলিকে অন্য ভাবে বলা হয় আমরা বুঝি না। ঠাকুর বারবার বলছেন, ধাতা, ধ্যেয়, ধ্যান এক হয়ে যায়, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এক হয় যায়। তার মানে, এটাই অদ্বৈত। জ্ঞান জিনিসটাই চলে যাওয়া এটা একমাত্র অদ্বৈতেই হয়।

ঠাকুর শুরু করেছিলেন এই বলে, সচ্চিদানন্দলাভ হলে সমাধি হয়। যোগশাস্ত্রের দু-নম্বর সূত্রে বলছেন *চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*, তৃতীয় সূত্রে বলছেন, *তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্*, তখন পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন। তার মানে সমাধি ও জ্ঞান এই দুটো জিনিস এক। এই জিনিসটা আবার পথের উপর নির্ভর করে। যাঁরা চিত্তবৃত্তি নিরোধের পথ নিচ্ছেন, তাঁরা মনটাকে শান্ত করার পথ নিচ্ছেন। যাঁরা জ্ঞানমার্গের পথ নিচ্ছেন; এনাদের সমাধিটা আগে এবং জ্ঞানটা পরে। কিন্তু যাঁরা ভগবানকে ভালবাসেন, ভক্তিমার্গে যাঁরা যাচ্ছেন; তাঁদের সচ্চিদানন্দলাভ আগে এবং সমাধি পরে।

আমরা যে 'আগে' 'পরে' যে শব্দ নিচ্ছি, এটাও ভুল। আসলে 'আগে' 'পরে' বলে কিছু হয় না। আপনি একটা অন্ধকার ঘরে আছেন। একজন এসে ঘরে একটা আলো জ্বালিয়ে দিল, এখানে আলো জ্বালানোও যা অন্ধকার চলে যাওয়াটাও তাই। এখানে আগে আলোটা জ্বালল বলে অন্ধকার চলে যাচ্ছে বলা যাবে না, কারণ দুটো এক; অন্ধকার যাওয়াও যা, আলো হওয়াও তাই, ঠিক তেমনি আলো হওয়াও যা অন্ধকার যাওয়াও তাই। সচ্চিদানন্দলাভ যা, সমাধি হওয়াও তাই; সমাধি হওয়াও যা সচ্চিদানন্দলাভও তাই। ঠিক তেমনি চিত্তবৃত্তি নিরোধও যা স্বরূপে অবস্থানও তাই; স্বরূপে অবস্থান যা চিত্তবৃত্তি নিরোধও তাই।

ঠাকুর এই জায়গাতে যাদের বলছেন তাদের এত বিস্তারে বোঝাচ্ছেন না, ছোট্ট একটা বাক্যে বলে দিলেন – সচ্চিদানন্দলাভ হলে সমাধি হয়। কিন্তু এবার ঠাকুর এর যা ব্যাখ্যা করছেন, এই ব্যাখ্যা তিনি ভক্তিমার্গের দিক থেকে বলছেন।

"তখন কর্মত্যাগ হয়ে যায়। আমি ওস্তাদের নাম কচ্ছি এমন সময় ওস্তাদ এসে উপস্থিত, তখন আর তার নাম করবার কি প্রয়োজন"।

আগে যে ওস্তাদ গান করেছিলেন ঠাকুর তাঁর কথা বলছেন। ঠাকুর ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের ওস্তাদ; এনারা যখন বলেন, তখন আশেপাশে যা কিছু আছে সব কিছুকে টেনে এনে সহজ ভাবে বলে বেরিয়ে যাবেন। একজন ওস্তাদ নৃত্যশিল্পী আরেকজন সাধারণ নৃত্যশিল্পীর মধ্যেই এটাই তফাৎ। সাধারণ নৃত্যশিল্পী অনেক কিছু সামলে নিজের অর্জিত বিদ্যার মধ্যেই নৃত্যকলা প্রদর্শন করবে, কিন্তু যিনি ওস্তাদ, তাঁর কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই না। বড় বড় ওস্তাদ ফুটবল প্লেয়াররা বলকে পায়ের এই পিছনে, এই সামনে, এই পাশে নিয়ে নাচিয়ে যাচ্ছে। ওস্তাদ মানে, তিনি যে বিষয়ে ওস্তাদ, সেই বিষয়কে নিয়ে যে কোন ভাবে নাচিয়ে বেরিয়ে যাবেন, ওনার কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই না। আমরা যখন শাস্ত্রের কোন কিছুর ব্যাখ্যা করব, তখন অনেক প্রস্তুতি নিতে থাকব, চিন্তা করতে থাকব, কি কি

উপমা দেওয়া যেতে পারে, কোন কোন কোটেশান নেওয়া যাবে ইত্যাদি এই রকম অনেক ভেবে চিন্তে, মনটাকে অনেকক্ষণ ধরে শান্ত করে বলতে শুরু করব। আর ঠাকুর এখানে কত অনায়সে একটা কঠিন জিনিসকে কত সহজ ভাবে বলে দিলেন। দর্জির দোকানে যাঁরা ওস্তাদ ফ্যাশান ডিজাইনার একটা দামী কাপড়কে এদিক ওদিক করে কয়েকটা টুকরো করে আবার মিলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবেন।

এখন ওখানে গানের ওস্তাদ উপস্থিত আছেন, গান হয়েছে; ঠাকুর ওই ওস্তাদকে নিয়ে বলছেন, ওস্তাদের নাম কচ্ছি এমন সময় ওস্তাদ এসে উপস্থিত, তখন আর তার নাম করবার কি প্রয়োজন! ছোট বাচ্চাদের নামে একটা খুব সুন্দর কথা আছে, বাচ্চাগুলো যখন বাড়িতে থাকে তখন এমন উৎপাৎ করে যে জ্বালা ধরে যায়। দূরে যখন চলে যায় তখন আবার বুকে ব্যাথা করতে শুরু হয়। এখন আপনি হয়ত নিজের সন্তানকে নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছেন, বাড়িতে থাকতে কত জ্বালাত, কত কি করত; বলতে বলতেই হঠাৎ সন্তান এসে হাজির হয়ে গেল; এরপর আর ওকে নিয়ে আপনি কি আর আলোচনা করবেন।

যেখানে ঠিক ঠিক পরাভক্তি হয়, প্রেমাভক্তি হয় অর্থাৎ খুব উচ্চমানের ভক্তি যেখানে হয়, সেখানে এই জিনিসগুলি দেখা যায়। ভাগবতে যেখানে রাসলীলার বর্ণনা আছে সেখানেও দেখাচ্ছেন গোপীদের মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, হঠাৎ তিনি গোপীদের ভিতর থেকে উধাও হয়ে গেলেন। আবার একটা সময় তিনি সবার মাঝখানে এসে হাজির হয়ে গেলেন। যাকে নিয়ে আপনি ভালবেসে আলোচনা করছেন, আলোচনা করেই যাচ্ছেন; হঠাৎ তিনি নিজেই এসে হাজির হয়ে গেলেন, এরপর আর কিসের আলোচনা! লোকেরা যে এত জপধ্যান করছেন, তপস্যা করছেন, ঈশ্বরকে কাছে পাওয়ার জন্য; সেই ঈশ্বর এখন সাক্ষাৎ, আর কিসের তপস্যা, কিসের জপধ্যান!

"মৌমাছি ভনভন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ না ফুলে বসে। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্মত্যাগ করলে হবে না। পুজা, জপ, ধ্যান, সন্ধ্যা, কবচাদি, তীর্থ–সবই করতে হয়"।

এই প্যারাগ্রাফে দুটি কথা নিয়ে ঠাকুর বলছেন – সমাধি জিনিসটা কি, সচ্চিদানন্দকে দিয়ে কিভাবে সমাধি লাভ হয় আর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাথে সমাধির, অর্থাৎ সমাধির সাথে কর্মের কি সম্পর্ক। আমরা যদি একটু বিচার করি, যে কোন কাজ যে আমরা করছি, কেন কাজ করছি? ছোটবেলা বাবা-মা কত বকাঝকা করে পড়তে বসতে বলত, পড়তে চাইতাম না। আরও বড় হলাম, আমরা যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে গেছি, সন্ন্যাসী হওয়ার আগে বড়রা যখন যা কাজ করতে আদেশ দিতেন সঙ্গে সঙ্গে করে দিয়েছি। কাজ কেন করা হয়? কারুর কাছে উত্তর নেই। আর আমাদের সমাজে ট্রেনিং দেওয়া হয়, কাজটাকে কিভাবে ভাল ভাবে সমাধান করতে হবে। কিন্তু এটা শেখানো হয় না, কাজ কেন করতে হয়।

আমরা খুব গভীরে গিয়ে যদি বিচার করি, উচ্চ আদর্শের দিক থেকে যদি বিচার করি, তাহলে দেখা যাবে সমস্ত কর্ম তিন জায়গা দিয়ে হয় – শরীর দিয়ে হয়, বাণী দিয়ে হয় আর মন দিয়ে হয়। যে কোন কর্ম, বাহ্য-প্রস্রাব থেকে শুরু করে পূজা-অর্চনা, যে কোন কর্ম আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি কর্মের উদ্দেশ্য, সে আপনাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। এ-কি কথা বলছেন? আমি যে টয়লেটে যাচ্ছি, এই টয়লেটে যাওয়াটাও আমাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে? অবশ্যই। এখানে এটা বলা হচ্ছে না যে এটাই তোমাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে; এটাই বলা হচ্ছে যে, ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার জন্য এগুলো করা হচ্ছে। বাস্তবিকই সব কর্ম করার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার জন্য, শুধু আমরা এটা জানি না। আমরা যা কিছু কর্ম করি, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার জন্যই করা হয়।

কাজ দু-প্রকার – শুভকর্ম আর অশুভকর্ম। শুভকর্ম করা হয় এইজন্য যে, আমাদের মধ্যে যে বন্ধনগুলি রয়েছে, যাতে সেই বন্ধনগুলি থেকে আমরা মুক্তি পাই। আমাদের ঋষিরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের বর্ণনা করে গেছেন। এর মধ্যে অর্থ, যে টাকা-পয়সা অর্জন করা হয়, এটা

এইজন্যই করা হয়, আমাদের শরীরের উপর যত রকম বন্ধন আছে, এই বন্ধনগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আপনার টাকা নেই, বাসে ধাক্কা খেতে খেতে, গরমে কষ্ট করে আপনাকে গন্তব্যস্থলে যেতে হবে। আপনার টাকা আছে, এসি ট্যাক্সিতে করে আরামে চলে যেতে পারেন। টাকা থাকলে আপনি ট্রেনে না গিয়ে প্লেনে যাবেন। আরও টাকা আছে, আপনার নিজস্ব একটা প্রাইভেট জেট প্লেন থাকবে। আপনার সময়ের উপর নিয়ন্ত্রন, সুবিধার উপর নিয়ন্ত্রণ, সমস্ত শারীরিক অশান্তি, শারীরিক কষ্ট, এগুলো থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। আমরা খাই কেন? ক্ষুধা শরীরের একটা বন্ধন। টয়লেটে কেনে যেতে হচ্ছে? শরীরের বন্ধন। এগুলো যদি না করা হয়, তাহলে শরীর খারাপ করবে। যে কোন শারীরিক কাজ করা হয় শারীরিক বন্ধনগুলি থেকে মুক্তির জন্য।

অর্থের পর কাম হল দ্বিতীয় পুরুষার্থ। মানুষ যে মন দিয়ে, বাণী দিয়ে, শরীর দিয়ে কর্ম করে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ; এই চারটে উদ্দেশ্যর বাইরে আর কোন উদ্দেশ্য নেই। অর্থের ব্যাখ্যা করা হল। কাম জিনিস আমাদের মনকে সমস্ত ইমোশানস থেকে মুক্ত করে দেয়। মনে খিচখিচানি আছে, যেমন বাচ্চা ছেলে, তার মা কাছে নেই, কান্নাকাটি করছে, চেঁচামেচি করছে। মাকে পেয়ে গেল, তার মন শান্ত হয়ে গেল। যে কোন ভোগ যে করা হয়, মনের মধ্যে যে ছটফটানি আছে, এটাকে শান্ত করার জন্য ভোগ করা হয়। দেহের ছটফটানি শান্ত হয় অর্থ দিয়ে, মনের ছটফটানিটা শান্ত হয় কামের ভোগ দ্বারা।

আর আমরা হিন্দুরা জানি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাব, ভাল কর্ম না করলে নরকে যেতে হবে; এই অশুভ যোনি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ধর্ম, অর্থাৎ তীর্থ, উপবাস এগুলো সব করা হয়। কিন্তু এগুলো সব কিছু করা হয়, যাতে শুভ কর্ম করে করে ধীরে ধীরে মানুষ মুক্তির দিকে চলে যাবে। পরে ঠাকুর এটার উপর বলবেন, এগুলো করার উদ্দেশ্য সব কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য – আমার এটা লাগবে না, কিন্তু এখন সাময়িক একটা ঝামেলায় আছি আমাকে এটা করতে হবে। আপনি ট্রেনে কলকাতা থেকে দিল্লী অনেকবার যাতায়াত করেছেন। কোন সময় আসানসোল, ধানবাদ স্টেশনে আপনার কিছু ঝামেলা হয়েছিল। তাই বলে পরের বার ট্রেনে দিল্লী যাওয়ার সময় আপনি বলতে পারেন না যে, আমি ধানবাদ, আসানসোল যাব না। ট্রেন ওই রুট দিয়েই যাবে, চোখ কান বন্ধ করে আপনাকে ওই স্টেশনগুলিকে পেরিয়ে যেতে হবে। ধর্ম, অর্থ, কাম সব কটার উদ্দেশ্য হল, আমাদের শরীরের, মনের আর পারলৌকিক জীবনের যত রকম বন্ধন আছে, সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া। এরপর অন্তিম যেটা, শুদ্ধ মুক্তি, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া যেটা, সেটার জন্য চেষ্টা করা শুরু করতে হবে।

তাহলে দাঁড়াল, আমরা যত কর্ম করছি, সব কর্ম করার উদ্দেশ্য হল মুক্তি। তাহলে যারা খুন করছে, চোরাচালান করছে, দুর্নীতি করছে, খুব গর্হিত কাজ করছে, তারাও কি মুক্তির জন্যই এগুলো করছে? আসলে তারা মনের যে বিবর্তনের স্কেল, সেই স্কেলে এত নীচে যে ওরা এখনও ঠিক ঠিক শুভকর্মের অনুষ্ঠান করার স্তরে আসেনি। এখন এরা প্রচুর অশুভ কর্ম করতে থাকবে, ধরা পড়ে প্রচুর মার খাবে। বারবার মার খেতে খেতে সেখান থেকে তার একটু চেতনা জাগবে। তার মানে, ধর্ম, অর্থ, কাম; জীবনের যে তিনটে উদ্দেশ্য, এই জায়গাতে আসতে এদের এখনও শত শত কোটি জন্ম লাগবে, কিন্তু যাচ্ছে সেখানেই। কোথায় যাচ্ছে?

যেখানে ব্রাহ্মণদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের আচরণ, শীল, স্বভাব কেমন হত; সন্ত-মহাত্মার আচার যেমনটি হয়, শেষ পর্যন্ত সবাইকে ওই জায়গাতে পৌঁছাতে হবে। ওই জায়গাতে পৌঁছালেই হবে না, উদ্দেশ্য হল মুক্তি। মুক্তি মানে, সচ্চিদানন্দলাভ, যেটা বলা হল। মুক্তি মানে সমাধি, মুক্তি মানেই সচ্চিদানন্দলাভ। তার মানে, যারা বাজে কাজ করছে, মন্দ কাজ করছে, সাধারণ কাজ যে করছে, ভাল কাজ যে করছে, সবাই জেনে হোক, না জেনে হোক, সবাই কাজ করছে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। যাঁরা জপধ্যান, তপস্যা শুভকর্মাদি করছেন, তাঁরা সবটাই পুরো জেনেবুঝে করছেন – আমাকে

ঈশ্বরের দিকে যেতে হবে, আমাকে সচ্চিদানন্দলাভ করতে হবে। কিন্তু সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য একটাই – ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ। এরপর যিনি ঈশ্বরে পৌঁছে গেলেন, তাঁর আর কিসের কর্ম! ট্রেনে দিল্লী যাচ্ছেন, দিল্লী পৌঁছে গেলেন, আর কেন ট্রেন বসে থাকবেন। এবার ট্রেন থেকে নামুন, যেটার জন্য ট্রেনে চাপা সেটা তো হয়ে গেছে। ঈশ্বরলাভের পর আর কেন কর্ম করতে হবে!

কিছু প্রশ্ন আছে, যেগুলো আমার কাছেও আশ্চর্য লাগে। আচার্য শঙ্কর বার বার এই কথা বলছেন, জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয় কখন হতে পারে না। ব্যাসদেবও ঠিক একই কথা বলছেন, ঠাকুরও একই কথা বলছেন। কিন্তু এখনও দেখি এগুলোকে নিয়ে লোকেদের কত রকম প্রশ্ন, স্বামীজী বলেছেন কর্ম করতে, কর্মযোগের কথা বলে গেছেন। স্বামীজী বলছেন, তুমি একটা তামসিকের ডিপো হয়ে আছ, কর্ম করে করে ভিতরে রজোগুণটা জাগাও। এই যে তুমি শুয়ে আছ, একটা ঢ্যামনা সাপ হয়ে পড়ে আছ, এর মূলে হল তোমার আগের আগের প্রচুর অশুভ কর্ম। ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে তোমার কত শত শত জন্ম লাগবে। কেউ একজন এসে তোমাকে একটা ধাক্কা মারলেন, 'এই ওঠ, হাঁট ব্যাটা, চলতে শুরু কর'। এবার তুমি একটু চলতে শুরু করলে। কিন্তু এই যে পরিষ্কার করে বলা হল, জ্ঞান বলতে কি, কর্ম বলতে কি, কর্ম কিভাবে জ্ঞানে নিয়ে যায় আর কেন জ্ঞানের পরে কর্ম হতে পারে না। এটাই পরের প্যারাতে ঠাকুর বলছেন।

"লাভের পর যদি কেউ বিচার করে, সে যেমন মৌমাছি মধুপান করতে করতে আধ আধ গুনগুন করে"। তার এখন জ্ঞান হয়ে গেছে, সে দেখছে তিনিই সব হয়েছেন। জ্ঞানের পরেও সে ঈশ্বরীয় কথাবার্তা করবে, কারুর ভাল করার জন্য দু-চারটে কথা অবশ্যই বলবে। এর বাইরে সে আর কোন কাজে নামবে না, কারণ এখন তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। একটা শিশু মাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে, মার জন্য ব্যাকুল হয়ে কেঁদে যাচ্ছে। এবার সে মাকে পেয়ে গেল, আর তো মাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজার দরকার নেই। এখন সে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু তখনও মাকে নিয়ে একটু মজা করবে, গাল ধরে টানবে, হাল্কা রাগ দেখাবে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য মাকে খুঁজে বার করাটা শেষ। এর উল্টোটা যদি আমরা দেখি, একটা মেলাতে বাচ্চা হারিয়ে গেছে। মা পাগলের মত বাচ্চাকে ফিরে পাওয়ার জন্য ছুটোছুটি করছে। হঠাৎ বাচ্চাকে দেখছে একটা খেলনার দোকানের সামনে নানা রকমের খেলনা দেখে যাচ্ছে। প্রথমেই মা গিয়ে বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরবে, এ-ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। কিছুক্ষণ পরে আদর করবে। মহাপুরুষরা যে কর্ম করেন, সেটাও যেন সচ্চিদানন্দকে আদর করছেন, এর বেশী কিছু না।

ওস্তাদটি বেশ গান গাহিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বলিতেছেন, "যে মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীতবিদ্যা, তাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে"। ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টি, সৃষ্টি হল তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর শক্তির প্রকাশ। সেইজন্য জগতে শুধু দুটো জিনিসই আছে – এক ব্রহ্ম, আর এক শক্তি। হয় মানুষকে পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে যেতে হয়, আর তা নাহলে জগতে শক্তি অর্জন করতে হয়। এই দুটোর মধ্যে কোন একটা যদি না থাকে, তাহলে সে হল ঠাকুর রেগে গিয়ে যে গালাগাল দিতেন – ঢ্যামনা শালা ইত্যাদি। হয় সমস্ত ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে চলে যেতে হবে, না হলে শক্তি অর্জন কর। শক্তি অর্জন মানে ধর্ম, অর্থ, কাম। এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, যখন কোন একটা জিনিসে শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, তার মানে সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে। কারণ শক্তি জিনিসটা পুরোপুরি ঈশ্বরের।

আপনি বলতে পারেন, যারা খুনোখুনি করছে, সন্ত্রাসবাদীরা আছে, জেহাদীরা আছে, দিনরাত যারা বোমা মারছে, নিরীহ লোকদের নির্বিচারে গুলি করে মারছে, এখানে কি আছে? হ্যাঁ, এখানেও শক্তির প্রকাশ অবশ্যই আছে। পরে তন্ত্রশাস্ত্র থেকে ঠাকুর বলবেন – বিদ্যাশক্তি আর অবিদ্যাশক্তি। শক্তি তো বটেই। তবে কি, ওই শক্তিগুলো খুব গর্হিত কর্ম। এখানে বলছেন, একজন কোন একটা কিছুতে

ভাল, বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানে কত ভাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে কত ভাল, বুঝতে হবে সেখানে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ আছে। গীতাতেও ভগবান এই কথা বলছেন।

সমস্যা হল, কোন একটা জিনিসে মানুষ যখন ভাল হয়, তখন নিজের সাফল্য দেখে নিজেকে নিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। খুব খেটে অর্জন করেছে কিনা, মানুষ যখন খেটে কিছু অর্জন করে তখন সে ওটাকে ছাড়তে চায় না। গ্রীক মিথলজিতে নার্সিসাসের কাহিনী আছে, সে নিজের ছবিকে দেখে এমন মুগ্ধ হয়ে গেছে যে, ওখান থেকে আর উঠে আসতে পারছে না। পিগম্যালিয়ান, এটাও একটা গ্রীক মিথলজি, পরে এটাকে নিয়ে মাইফেয়ার ল্যাডি সিনেমা তৈরী হয়। সে এত সুন্দর একটা মূর্তি বানিয়েছে, যেটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে, ছাড়তে পারছে না। মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, সে যে জিনিসটাকে সৃষ্টি করে, সেটাকে সে ছাড়তে পারে না। কত সাধনা করে, বহু কষ্টে সে সঙ্গীতবিদ্যা অর্জন করেছে, সে ওটাকে আর ছাড়তে পারবে না; তখন ওই সঙ্গীতই গুটিপোকার মত ওকে বেঁধে ফেলে। সেখান থেকে আর বেরোতে পারে না। ঠাকুরও পরে বলবেন, একটা দিকে বেশী এগিয়ে গেলে ঈশ্বরের দিকে আর মন যায় না। ফলে কি হয়, যারা ভোগের জগতে অনেক এগিয়ে গেছে, যেমন আমেরিকা আদি, এরা আর ঈশ্বরের দিকে যেতে পারবে না, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। যাদের মধ্যে একটা গুণ আছে, বিশেষ কর যদি সত্ত্বগুণ হয়, বিদ্যা সব সময় সত্ত্বগুণ থেকে আসে, বিদ্যা একমাত্র সত্ত্বগুণই দেয়। কোন একটা গুণে যদি খুব এগিয়ে থাকে, বুঝতে হবে সেখানে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ আছে। ওস্তাদ খুব ভাল গান করেন, সেইজন্য ঠাকুর এই কথা বললেন।

এখন দেখতে হবে এরা কি সত্যিই কখন ঈশ্বরের দিকে যেতে পারবে? বিশ্বের একজন এক নম্বর ক্রিকেটার, এখন সে যদি ঈশ্বর সাধনায় নামতে চায়, সে কি তা করতে পারবে? না, পারবে না। কারণ ক্রিকেট খেলাটা আসছে রজোগুণ থেকে। রজোগুণেও ঈশ্বরের প্রকাশ রয়েছে, যে ভাল খুন করতে পারে সেটাও ঈশ্বরের প্রকাশ, কিন্তু তমোগুণের প্রকাশ। ঈশ্বরের দিকে যেতে গেলে সত্ত্বগুণ না হলে হবে না। এখন বিদ্যা জিনিসটা আসে সত্ত্বগুণ থেকে, কিন্তু ওটাকে যখন প্রয়োগ করা হয়, তখন তমোগুণ, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ তিনটেতেই চলে যায়। সেইজন্য দেখতে হবে ওর মনটা কোথায় আছে। মন যদি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবেই সে ঈশ্বরের দিকে যেতে পারবে, তা নাহলে ওটা আরও বেশি করে তাকে জগতের দিকে নিয়ে যাবে। ওস্তাদ ঠাকুরের নাম শুনেছেন, এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে ইনি ঈশ্বরের ভাবে আছেন, থিয়েটারওয়ালাদের মত ইনিও ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন।

ওস্তাদ–মহাশয়, কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ–ভক্তিই সার, ঈশ্বর তো সর্বভূতে আছেন; তবে ভক্ত কাকে বলি? যার মন সর্বদা ঈশ্বরেতে আছে। আর অহংকার অভিমান থাকলে হয় না। 'আমি'রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়। আমি যন্ত্র।

এই যে একটু আগে বলা হল, মানুষ যখন শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কোন একটাতে অনেক এগিয়ে যায়, বোঝা যায় যে সেখানে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ, সত্ত্বগুণ তাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু যেমনি 'আমি' বোধটা এসে গেল, 'আমি ভাল গায়ক', 'আমি ভাল লেখক', 'আমি একজন ভাল কবি', এই 'আমি'টা যেমনি ঢুকে গেল, এবার আস্তে আস্তে এটাই ওকে নীচে নামিয়ে দেবে। ঠাকুর তখন বলছেন, 'আমি'রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না; এটা একটা উপমা, একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন, যদি আমিত্ব এসে যায়, অহংকার যদি এসে যায়, তখন তার সত্ত্বগুণটা কমে যাবে। অহংকারে সত্ত্বগুণ থাকে না, অহংকার রজোগুণ থেকে আসে। অহংকার এসে গেছে মানে, রজোগুণ ঢুকে গেছে, আর এগোতে পারবে না।

যদি আপনার একটা বিদ্যা থাকে, যে বিদ্যাতে আপনি সত্যিই বিরাট, বুঝতে হবে আপনাকে ঈশ্বর কৃপা করছেন। এবার আপনার মধ্যে যদি আমিত্ব ঢুকে যায়, এই বিদ্যা আপনাকে জগতের দিকে নিয়ে চলে যাবে। আপনার মধ্যে আমি বোধটা আছে কিনা, অহংকার বোধ আছে কিনা, এটা একমাত্র আপনিই জানতে পারবেন, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। তিনটে গুণই প্রকৃতির, সত্ত্বগুণটা যদিও বলা হয় প্রকৃতির মধ্যে, কিন্তু আমি বোধ, অহংকার এটা পুরোপুরি প্রকৃতির এলাকার। আমরা যদি কল্পনা করি, ঈশ্বরের আলো একটা আয়নাতে পড়ছে, আয়নাটা পরিষ্কার, আলোর প্রতিফলনটাও জোড়ালো, এটা হল সত্ত্বগুণ। আরেকটা আয়না আছে, যার পিছনের পলিশিংটা খারাপ। কাঁচের পিছনে যদি সিলভার নাইট্রেট বা ওই ধরণের পলিশিং থাকে তবেই সেই কাঁচের প্রতিফলন হবে। কারণ আলোর যে ফোটনগুলো থাকে, সেগুলো কাঁচের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে ফেরত চলে আসে। এবার আপনি ওই কাঁচের পিছনে কালো রঙ লাগিয়ে দিলেন, কাঁচের প্রতিফলিত করার শক্তিটাই নষ্ট হয়ে গেল। সেই কাঁচ, কিন্তু পিছনের কোটিংটা পালটে গেছে। অহংকার প্রকৃতির এলাকা। প্রকৃতি আরও নীচে নিয়ে যাচ্ছে, সে কি করছে, ঈশ্বরের প্রকাশটা আটকে দেয়। একটা তো হল মুর্খের অহংকার, এদের দ্বারা কিছু হবে না, এদের কিছু হবেও না। কিন্তু যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ রয়েছে, যারা একটা শুভ কাজ করতে পারে, একটা গুণ রয়েছে, তাদেরও যদি অহংকার হয়ে যায়, যদি মনে করে এই বিদ্যাটাই আমাকে সব কিছু দিয়েছে, এটাতেই আমি এগোব; তার মানে অহংকার এসে গেল। এবার আস্তে আস্তে ওকে জগতের দিকে টেনে নামিয়ে দেবে। ভক্তি জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন –

(কেদারাদি ভক্তদের প্রতি)–"**সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; আর দড়ি দিয়েও উঠতে পার। আবার একটা আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার**"। এখান থেকে ঠাকুর আবার ধর্মের কথা বলছেন।

"**যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বলি, তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে**"।

এখানে ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার। কোন মহাপুরুষের যদি সমাধিতে গিয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে যায়, এরপর এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান তিনি তাঁর শিষ্যদের শিখিয়ে দেন। সবাই তাই করেন, যীশুও তাই করেছেন, ঠাকুরও তাই করেছেন, আগেকার দিনের বৈদিক ঋষিরাও তাই করেছেন। এখন ঋষিরা, ঋষি বলতে আমরা অবতারকেও বলছি, ওই আধ্যাত্মিক সত্য এটা হল একেবারে raw form, এটাকে নেওয়া যায় না, সরাসরি হজম করা যাবে না। এই আধ্যাত্মিক সত্য সমাজে নামে, মনে নামে, সাহিত্যে নামে ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক সত্য যখন সমাজে নামে, তখন তাকে আমরা বলি ধর্ম। যখন মনে নামে, আমরা তখন তাকে বলছি আচার-আচরণ আর সাহিত্যে যখন নামে, তখন বলি পৌরাণিক কথা। একই আধ্যাত্মিক সত্য বিভিন্ন এলাকায় নামছে আর তার নাম পালটে যাচ্ছে। ঈশ্বরই আছেন, এই সত্য যখন আরব দেশের সমাজে নামল, তখন এসে গেল ইসলাম। ঈশ্বরই আছেন, এটা যখন ভারতে নামল তখন হিন্দু ধর্ম হয়ে গেল। ঈশ্বরই আছেন, এটা যখন সেমাইট ভূমিতে গিয়ে নামল, প্রথমে এলো জুদাইজম, পরে এলো খ্রীশ্চানিটি। ঈশ্বরই আছেন, এটাকে নিয়ে যাঁরা যোগ অনুশীলন করছেন ওনারা হয়ে গেলেন বৌদ্ধ। একই সত্য যেমনি সমাজে নামবে, application পালটে যাবে।

সমাজ মানেই imperfect, মার্কিস্টরা যাই বলে থাকুক, কিছু দিন পর পরই বলবে নূতন সমাজ তৈরী করতে হবে; মাও-সে-তুং এলেন, চীনে একটা নূতন সমাজ এসে গেল, যার নাম কম্যুনিজম্। অথচ আজকে ক্যাপিটেলিজম্ সবচেয়ে বেশী ওখানেই আছে। পারফেকশান, একেবারে নির্দোষ, বলছেন, *নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম*, দোষমুক্ত একমাত্র ঈশ্বর, বাকি সব কিছুতে দোষ আছে। মনের

ভিতর দোষ থাকবে, সমাজে দোষ থাকবে, সাহিত্যে দোষ থাকবে; imperfection সব জায়গায় থাকবে। সেইজন্য কোন পৌরাণিক বর্ণনা perfect না, কোন আচার-আচরণ perfect না।

আমরা যখন বলি ওই ধর্মে এই দোষ, অন্য ধর্মের লোকেরা বলছে হিন্দু ধর্মে এই দোষ আর যখন এক অপরকে গালাগাল দিতে থাকে তখন এনারা সবাই ধর্মের উৎসটাই ভুলে যান। আর যখন অপরকে গালাগাল দেয়, তখন করে কি, নিজের ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যকে নিয়ে আসবে আর সেটাকে অপরের ধর্মীয় অনুশীলনের সাথে তুলনা করবে। সোস্যাল মিডিয়া আসার পর এগুলো খুব পপুলার হয়ে গেছে। একটু যদি খেয়াল রাখেন তাহলে দেখতে পাবেন, নিন্দা যখন করছে আর নিজেকে শ্রেষ্ঠ যখন বলছে, তখন বলবে আমার সিদ্ধান্ত আর তোমার প্র্যাক্টিস। যদি তুলনা করতে হয় তাহলে আমার সিদ্ধান্তের সাথে তুলনা কর। আর আমার ধর্মের অনুশীলন নিয়ে যদি বল, তাহলে আগে তোমার নিজের ধর্মীয় অনুশীলনগুলিকে দেখ। আমি আপনি একই, আমিও যেমন আপনিও তেমন। কিন্তু আমি যদি আপনাকে নিন্দা করি তখন আমার ক্ষেত্রে বলব আমি লিবারাল, আপনার ক্ষেত্রে বলব স্বেচ্ছাচার। আমার ক্ষেত্রে বলব, আমি determind, আপনার ক্ষেত্রে বলব, আপনি dictatorial। একই ভাব, কিন্তু তার শব্দগুলো পালটে যায়। সামনের লোককে ছোট করার জন্য যখন তার নিন্দা করতে চাই তখন শব্দগুলো পালটে যায়। একই ভাব, শব্দ দিলে পরিবর্তন হয়ে যায়। মানুষ মাত্রেই এই দোষ আছে। সেইজন্য বলছেন, যখনই ধর্ম, ধর্ম মানে আধ্যাত্মিক সত্যগুলো যখন সমাজে নামানো হয়; দোষ আধ্যাত্মিক সত্যে নেই, দোষ রয়েছে সমাজে, ধর্মে তাই দোষ থাকবেই। 'সবাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে' এই কথা বলে পর পর ঠাকুর অনেক কথা বলে যাচ্ছেন।

"**ব্যাকুলতা থাকলেই হল; তাঁর উপর ভালবাসা, টান থাকলেই হল। তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান**"। এটা বলার পর ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন, ছোট শিশু 'বাবা' বলতে পারে না, হয়ত 'পা' কি 'বা' বলতে পারে, কিন্তু বাবা তাকেও সেই ভালবাসাই দেবে, যে ভালবাসা বাবা বলতে পারা ছেলেকে দেন। যে সমাজেই থাকুক, একজনের যদি সত্যিই ঈশ্বরের প্রতি টান হয়েছে, তাতে কিছু আসে যায় না; সে কি ধর্মের অনুশীলন করেছে, কি কি করেছে, এগুলো কোন ব্যাপার না; ঈশ্বরের প্রতি তার টান আছে কিনা। সেখান থেকে ঠাকুর মনের ভাবের উপর নিয়ে আসছেন।

"**আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে**"। এখানে ঠাকুর 'ব্যক্তি' শব্দ দিয়ে বলছেন, আসলে যাঁরা শুনছেন তাঁরা অতটা বুঝবেন না বলে এ-ভাবে বলছেন; সেই আধ্যাত্মিক সত্তাকেই ডাকছেন। খুব নামকরা উদাহরণ নিয়ে আসছেন, "**এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে একঘাটে বলছে জল; মুসলমানরা আর-একঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি; ইংরেজরা আর-একঘাটে খাচ্ছে বলছে ওয়টার; আবার অন্য লোক একঘাটে বলছে aqua**"।

"**এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম**"।

নানা নাম কেন? এই যে একটু আগে বর্ণনা করা হল, আধ্যাত্মিক সত্য যখন সমাজে নামে তখন তাকে বলছে ধর্ম, মন দিয়ে যখন আধ্যাত্মিক সত্যকে দেখছে তখন আসে ফিলজফি, ফিলজফিতেই নামকরণ আসে; যখন কথাকাহিনীতে নামছে তখন তার নাম হয়ে যায় পুরাণ। সেইজন্য খ্রীশ্চান মিথলজি আর হিন্দু মিথলজি পুরো আলাদা। আলাদা হতে বাধ্য, সাহিত্য পুরো আলাদা, আচার আচরণে অনেক তফাৎ এসে যাবে। আর নামকরণ যখন হচ্ছে তখন সেটাও আলাদা আলাদা হবে। যদি গভীরে যাওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে আসলে সবাই ওই একই সত্তার কথা বলছে।

এই এক পাতার মধ্যে ঠাকুর অনেকগুলো বিষয় নিয়ে বললেন, সচ্চিদানন্দ, সমাধি, এর সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক, আর কিভাবে সব ধর্মের মেলবন্ধনটা কোথায় হচ্ছে। ঠাকুর কক্ষণ সব ধর্ম সমান বলছেন না। ঠাকুর বলতে চাইছেন, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সেই এক। কিন্তু তত্ত্ব যখন ব্যবহারিক প্রয়োগ

নামবে, আবার আচার-অনুষ্ঠানে যখন নামবে, তখন কক্ষণ সমান হবে না। সেইজন্য আমার ধর্ম কক্ষণ তোমার ধর্ম হতে পারে না, তোমার ধর্ম কোন দিন আমার ধর্ম হবে না। আর সেইজন্য এমন কোন দিন আসবে না যে, যেদিন সমস্থ ধর্ম মিটে গিয়ে একটি ধর্ম থাকবে।

কিন্তু স্বামীজী যে বলছেন, বেদান্তই বিশ্বের ভবিষ্যত ধর্ম বা বলছেন Universal Religion; সেখানে তিনি বলতে চাইছেন – সমাজ জিনিসটাকে ভুলে গিয়ে যদি শুধু আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে ফোকাস করা হয়। কোন সন্দেহ নেই যে, এটা একটা খুব সুন্দর ভাব; কিন্তু হয় না। বেদান্ত যখন ইতালিতে নামবে, তখন সেখানে অন্য ভাবে apply হবে। আবার আমাদের এখানে গরমের দেশে যখন নামবে, তখন আবার অন্য ভাবে apply হবে। সেইজন্য বিশ্বে কোন দিন one single religion সম্ভব না। হতে পারে, যদি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক সত্যটুকু রেখে বাকি সব কিছুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যেমন গীতা আদি, গীতাতেও application আছে, যেখানে বর্ণাশ্রমাদির কথা বলছেন। উপনিষদে তাও আছে, একেবারে পিওর আধ্যাত্মিক সত্যকে নিয়েই বলে গেছেন। কিন্তু পিওর আধ্যাত্মিক সত্য দিয়ে জীবন চালানো খুব মুশকিল হয়ে যায়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন সব ধর্মেই দোষ আছে। উদ্দেশ্য হল জো সো করে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত – সাধনা ও যোগতত্ত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে আছেন। বৃহস্পতিবার (৯ই ভাদ্র ১২৮৯), শ্রাবণ-শুক্লা দশমী তিনি, ২৪শে অগস্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। সাধারণ ভাবে মাস্টারমশাই রবিবার দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তিনি বৃহস্পতিবার এসেছেন।

আজকাল ঠাকুরের কাছে অনেকেই থাকছেন, হাজরা মহাশয়, রামলাল, রাখাল প্রভৃতি। মাস্টারমশায় এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। ঠাকুর সহাস্যবদন। কিছু দিন আগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, যার কথা আমরা আগে আগে বর্ণনা করে এসেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজের সত্যিকারের একজন উচ্চমানের মানুষ। ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে ভুলতে পারছেন না। আমরা যখন কোথাও কাউকে দেখি, রাস্থাঘাটে, ট্রেনে-বাসে যখন কারুর সাথে আলাপ আলোচনা হয়, তখন আমাদের মস্তিষ্কের নিওরোনসগুলো activated হয়ে যায়। এখন আমাদের মস্তিষ্কে যতগুলো নিওরোনস আছে, এইন নিওরোনসগুলি এক অপরের সাথে তাদের যে লিঙ্কগুলো রয়েছে, যত বেশী সেগুলো সচল হবে, সেটার উপর নির্ভর করবে তার ছাপ আপনার উপর কেমন হবে। কত দিন ধরে আছে, সেটার আরেকটা ছাপ হয়; আর এক সঙ্গে ধাক্কা কেমন হচ্ছে সেটার আরেকটা ছাপ হবে। যেমন একটা slow poison, ধীরে ধীরে অনেকদিন ধরে কাজ করবে, আরেকটা strong poison, একটুতেই শেষ। খুব নামকরা লোক যদি কেউ হন, খুব বড় একজন রাজনীতির নেতা বা ফিল্মস্টার, ক্রিকেট স্টার, এনাদের সঙ্গে এক মিনিটের জন্য আমনে-সামনে দেখা হয়ে গেল, এই ঘটনাটা চিরদিনের জন্য স্মৃতিতে বসে যাবে। আবার নিজের পরিবারের লোকেদের সাথে অনেকদিন আছেন, স্মৃতিতে বসে থাকবে। শেষের দিকে মানুষের দুটো স্মৃতিই থাকে, একটা হল জোরালো স্মৃতিগুলি। জোরালো স্মৃতি দু-ভাবেই আসে, একটা হল খুব নামকরা লোকের সাথে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হয়ে গেল, এটা মানুষ ভুলতে পারে না। অনেক সময় এমন কোন নামকরা লোকের সাথে দেখা হয়ে গেল, আপনি জানেন না লোকটি কে, কিন্তু কোথাও এমন একটা ছাপ ফেলবে, যেটা ভোলা যায় না। বিদ্যাসাগর মশাইও ঠিক সেইভাবে ছাপ ফেলেছেন।

ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, "**আর দু-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখবার প্রয়োজন**"। ঠাকুর চাইছেন কিভাবে জগতের মঙ্গল করা যায়। যেখানেই একটু ভাল আধার দেখছেন, সেখানেই তিনি তার মনটাকে উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতেন। মায়ের জীবনী, ঠাকুরের জীবনী, যীশুর

জীবনী যদি খুব কাছ থেকে দেখা হয়, এনাদের যে দিব্য স্বভাব, তাঁদের আশেপাশের লোকেরাই বুঝতে পারেনি। যীশুর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই তাঁকে ক্রুশিফাই করে দিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের ভাইয়েরা, ঠাকুরের বংশের লোকেরা, সব্বার একটাই চেষ্টা কিভাবে ঠকিয়ে হোক, চালাকি করে হোক সব টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি নিজের কব্জায় নেওয়া যায়। অবতাররা যখন আসে, বড় আচার্যরা যখন আসেন, এনারে খোঁজেন ভাল আধার কোথায়। একবার যদি কোথাও ভাল আঁধারের সন্ধান পেয়ে যান, তখন গুরুই তাঁর পিছনে দৌড়াতে থাকেন। গুরু পাওয়া কঠিন না, শিষ্য পাওয়াটাই মুশকিল। কারণ গুরু তো জো সো করে খেটেখুটে একটা উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছেন, বাকিরা এখন কিছুই না। ওর মধ্য থেকেই এবার গুরুকে বাছতে হবে, এ যেন সেই লোম বাছতে কম্বল শেষ। কম্বলে যদি লোম বাছতে শুরু করেন, কম্বল আর কম্বল থাকবে না। যদি কোন গুরু মনে করেন, সমাজে সাধারণগুলিকে বাদ দিয়ে ভাল কটাকে শিষ্য করতে হবে; সমাজে সবই তো সাধারণ, কাকে বাদ দেবেন? সেইজন্য দেখা যায়, কদাচিৎ একটি ভাল আধার যদি কোন গুরু পেয়ে যান, গুরু তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

অনেক আগে আমেরিকায় শিক্ষকতার নামে খুব সুন্দর কথা বলা হত, আগেকার দিনে যারা শিক্ষকতার জন্য আসত, তারা আগে পাঁচটা স্কুলে গিয়ে দরখাস্ত করে বলত, এখানে কি চাকরি হবে। সেখানে তখন তাদের বলা হত, দেখবে এমন দিন আসবে যখন একজন শিক্ষক পদপ্রার্থি বসে থাকবে আর স্কুলের হেডমাস্টাররা গিয়ে তাকে অনুরোধ করবে, আপনি কি আমার স্কুলে শিক্ষকতা করবেন? ঠিক তাই হয়েছে। আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন সবার মধ্যে ছটফটানি, কলেজ থেকে বেরিয়ে কোথায় চাকরি পাওয়া যাবে, চাকরি পাওয়া তখন সত্যিই খুব কঠিন ছিল। এখন যারা একটু ভাল ছেলে, বিভিন্ন কোম্পানি দৌড়ে এসে তাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় কোম্পানিগুলি আইআইটি কলেজগুলিতে ক্যাম্পাসিং করে বলছে, তুমি আমাদের কোম্পানিতে এসো। এই যে বলে দেশে বেকারত্ব বাড়ছে, দেশে কত চাকরি আছে জানে? আমরা যখন গ্রামে পড়াশোনা করেছি, তখন একজন গ্রামের শিক্ষক তাঁদের জ্ঞানের যে লেভেল ছিল, এখন শহরের শিক্ষকদের সেই জ্ঞান নেই। সবার চেষ্টা কি করে ফাঁকি দিয়ে একটা ডিগ্রি পাওয়া যাবে আর কাজ না করে মাইনে কি করে পাব। কেউ কাজ জানে না, শুধু সবাই চাইছে ফাঁকি মেরে কি করে মাইনে পেতে পারি। আর এদিকে বলছে সরকার কিছু করছে না। তুমি কি কিছু করছ? না আছে তোমার একটু পড়াশোনা, না আছে কোন কাজে দক্ষতা, কিছুই নেই। শুধু অপরের দোষ দিয়ে যাবে।

এবার যদি ধর্মে ঢুকতে যান, সেখানে অবস্থা আরও খারাপ, আধারই নেই। তখনকার দিনে হিন্দুদের একটা সমাজ ছিল, একটা উন্নত সংস্কৃতি ছিল। তখনই সেখানে ঠাকুর কলকাতায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভাল আধারের যদি কাউকে পাওয়া যায়, জাতি, লিঙ্গ, কুল, বংশ সব বাদে। কোথায় একটা আধার পাওয়া যায়, যাকে এই জ্ঞানটা দেওয়া যেতে পারে। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পেলেন, যাঁকে এই শিক্ষাটা, গীতার উপদেশটা দেওয়া যেতে পারে; কারণ ভাল শিষ্য হলে তবেই শিক্ষার প্রসার, প্রচার হয়। বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখে কোথাও একটা ঠাকুরের মনে আশা জেগেছে। কিন্তু বলছেন, দু-একবার দেখবার প্রয়োজন। যার জন্য দেখা যেত, নরেন অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে না এলে ঠাকুর দৌড়ে দৌড়ে কলকাতায় কারুর বাড়িতে গিয়েই বলতেন, নরেনকে খবর দাও। ভাল আধার কিনা, এবার এই শিক্ষাটা শিষ্যকে ধারণা করাতে হবে, কিন্তু তার আগে তাকে তৈরী করতে হবে।

মনে করুন আপনি বালির দেশ মরুভূমিতে আছেন। ওখানে আপনাকে জল রাখার একটা পাত্র দরকার। একটা ঘট বানাতে হবে। কিন্তু যেখানেই হাত দিচ্ছেন সেখানেই বালি। বালি দিয়ে তো আর ঘট তৈরী করা যাবে না, মাটি দরকার। হঠাৎ একটা জায়গায় একটু মাটির সন্ধান পেলেন। এবার আপনাকে ওই মাটি তুলে জলে মাখতে হবে, ভাল করে ঠাসতে হবে, এরপর চাকে বসিয়ে ঘট তৈরী হবে। সেটাকে শুকোতে হবে, শুকোবার পর আগুনে পোড়াতে হবে। এত কিছুর পর এবার ঘট তৈরী

হবে। কিন্তু আপনার আশেপাশে চারিদিকে শুধু বালি আর বালি। আমরা ওই বালির মত। ঠাকুর এখন বিদ্যাসাগর মশাইকে একটু মাটি পেয়েছেন, ভাবছেন ঘট তৈরী করা যায় কিনা। কিন্তু মাঝখান থেকে বিদ্যাসাগর মশাই কোন দিন আর ঠাকুরের সাথে দেখাই করলেন না।

ঠাকুর বলছেন, "**চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দোমেটে, তারপর খড়ি, তারপর রঙ—পরে পরে করতে হয়**"। দূর্গামণ্ডপে পূজার সময় আমরা যে প্রতিমা দেখি, দেখে কত ভাল লাগে, মনটা খুশীতে ভরে ওঠে, কিন্তু এই জায়গাতে প্রতিমাকে আনার জন্য কত খাটতে হয়েছে, খাটনির কথা কারুর মনে পড়ে না। একজন ফড়ড় ফড়ড় করে ইংরাজী বলছে বা ফড়ড় ফড়ড় করে সংস্কৃত বলে যাচ্ছে, আমরা অবাক হয়ে যাই। কিন্তু সে কি একদিনে বলতে পেরেছে? মা নিজের সন্তানের উপর অধিকার দেখায়, সেটাকি এমনি এমনি হয়েছে! কত দিনের সাধনা করে করে ওই জায়গাতে এসেছেন। যে কোন ধরণের সম্পর্ককে ধরে রাখার জন্য, টিকিয়ে রাখার জন্য কত খাটে।

অবতাররা জানেন বেশী দিন নেই। যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর আগমন, তিনি চাইছেন যত তাড়াতাড়ি শিক্ষাটা দিয়ে দেওয়া যায়। "**ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ করছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন – জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয় তাঁকে ডাকতে ইচ্ছে হয়**"।

এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, কর্ম কিভাবে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। যারা অশুভ কর্মের মধ্যে ডুবে আছে, তাদের এখন অনেক দেরী, এদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। শুভকর্ম যাঁরা করে যাচ্ছেন, তাঁরা ওই শুভকর্ম কমিয়ে দিয়ে শুধু ঈশ্বরের দিকে মনে দেবেন, তখন তাঁদের মনটা পুরো শান্ত হয়ে আসবে। কারণ কর্ম মানেই মনের চাঞ্চল্য। মনের চাঞ্চল্য শান্ত হওয়া মানেই কর্ম শান্ত হওয়া; মনের চাঞ্চল্য শান্ত হওয়া মানেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ, চিত্তবৃত্তি নিরোধ মানেই আত্মদর্শন। যাঁরা অপরের সেবা করে বেড়াচ্ছেন, বিদ্যাসাগর অর্থোপার্জন করছেন, স্কুলে শিক্ষকতা করে টাকা আয় করে সে টাকা দিয়ে অপরের মঙ্গল করছেন। তার মানেই, তিনি তমোগুণ ও রজোগুণ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর নামটাই বিদ্যাসাগর, সারাটা জীবন বিদ্যা নিয়েই ছিলেন, একদিকে বিদ্যাচর্চা আর অন্য দিকে মানুষের সেবা। সত্ত্বগুণে যা যা হতে পারে, সবটাই তাঁর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যে কোন ধর্মেরই সৎপুরুষ হওয়াটা একমাত্র লক্ষ্য না, হিন্দুদের তো কোন মতেই না। হিন্দুদের হল, ধর্মে যাঁরা সাধারণ তাঁরা সৎপুরুষ হয়ে যান। যাঁরা আরেকটু শ্রেষ্ঠ, তাঁরা আচার্য হয়ে যান। শেষে যাঁরা থাকেন, তাঁরাই আধ্যাত্মিক পুরুষ। সৎপুরুষ হওয়া মানে, তমোগুণ আর রজোগুণকে দাবিয়ে দিয়ে সত্ত্বগুণে চলে এসেছেন। আচার্য মানে তিনি সত্ত্বগুণে আছেন, কিন্তু এবার তাঁর কর্মগুলি তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করেন। আধ্যাত্মিক হওয়া মানে, সব কিছুর পারে চলে যাওয়া। ঠাকুর যেমন বলছেন – মাইরি বলছি, আমি ঈশ্বর বই কিছু জানি না। ঠাকুর বলছেন – একবার যদি জেনে যায়, হ্যাঁ ঈশ্বরই আছেন, তখন নিজেই সব কিছু ছেড়ে দেবে। সব কথা ঠাকুর মাস্টারের সঙ্গে কখন দাঁড়িয়ে বলছেন, কখন কখন বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে বলছেন।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কথা বলতে বলতে এরপর ঠাকুর বলছেন, "**অন্তরে কি আছে জানবার জন্য একটু সাধন চাই**"।

এই জায়গাতে এসেই গোলমালটা লাগে। স্বামীজী যেমন বলছেন, Each soul is potentially divine। ঠাকুর একটু আগে বলেছিলেন, সবারই ভিতর তিনি আছেন; এটা জানার জন্য, এই বিশ্বাসটা যে আসবে, এটার জন্য একটু খাটতে হয়। একটু জপধ্যান করা, একটু সাধুসঙ্গ করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, এগুলো করলে তখন বিশ্বাসটা আসে। অন্তরে সোনা আছে, তার মানে আমার আসল স্বরূপ হল শুদ্ধ আত্মা, আমার আসল স্বরূপ হল সেই ঈশ্বর, কিন্তু ঢাকা রয়েছে। বিশ্বাস ছাড়া

এগুলো কথার কথা। আগেকার দিনে লোকেরা বলত মরার পর স্বর্গে যাবে। কিন্তু স্বামীজী আসার পর থেকে সবাই এখন বলতে শুরু করেছে, কিসের স্বর্গ, আমি সেই আত্মা। এগুলো আমাদের কাছে কথার কথা, টিয়া পাখির মত আউড়ে যাচ্ছে। যদি না খেটে থাকে, কি করে অন্তরের খবর জানবে! মাস্টারমশাই বেশ কিছুদিন ধরে ঠাকুরের কাছে আসছেন, এখনও সব কথা ওনার কাছে পরিষ্কার হয়নি, না হওয়ারই কথা। মাস্টারমশাইয়েরও এখন চালচিত্র আঁকার মত চলছে, ধীরে ধীরে জিনিসগুলো গভীর হয়। মাস্টারমশাইয়ের মনেও তাই প্রশ্ন এসেছে।

মাস্টার – সাধন কি বরাবর করতে হয়?

ঠিকই, কেন বরাবর সাধন করতে হবে। তবে, একদিকে আমি যেমন বললাম, কেন করতে হবে, অন্য দিকে মনে রাখতে হবে যে – আচার্য যখন গীতার ভাষ্য লিখছেন ওই জায়গাতে তিনি এই পয়েন্টটাকে আনছেন। হিন্দুদের ঠিক ঠিক দর্শন হল মীমাংসা বা বেদের কর্মকাণ্ড; মীমাংসকরা এই জিনিসটাকে জোর দেবেন। তুমি সন্ন্যাসী হও আর যাই হও, নিত্যকর্ম তোমাকে সব সময় করতে হবে। আচার্য শঙ্কর এটাকে যুক্তি দিয়ে পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, যাঁর একত্ব দর্শন হয়ে গেছে তাঁর জন্য নিত্যকর্ম শেষ। কেন আর সে নিত্যকর্ম করতে যাবে! এবার ঠাকুরের দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক। ঠাকুরকে এক কথায় আমরা অবতার বলে দিচ্ছি ঠিক আছে, কিন্তু তাঁকেও ধাপে ধাপে এগোতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি একজন ভাল মানুষ, সেখান থেকে হয়ে গেলেন একজন আচারী বামুন, সেখান থেকে তিনি সাধনাতে নেমে গেলেন, সেখান থেকে সিদ্ধ হয়ে গেলেন।

তারপর দেখছি, কর্ম বলতে যেটা বোঝায়, এমনকি কর্মকাণ্ডে যে যে কর্ম করতে বলা হয়েছে, ঠাকুর চেষ্টা করেও আর ওসব কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারছেন না। তার মানে আচার্য শঙ্কর যুক্তি দিয়ে যে জিনিসগুলিকে দাঁড় করিয়েছেন, নিজের জীবন দিয়ে ঠাকুর সেই জিনিসগুলিকে আমাদের সাক্ষাৎ দেখিয়ে দিলেন। তার মানে এই নয় যে আমরা এতদিন এগুলো জানতাম না। আমরা জানতাম ঠিকই, কিন্তু যদি ভক্ত না হয় এখন ঠাকুরের কথাগুলোকে কে নেবে? যেমন বাইরের লোকেরা ঠাকুরের নামে কত কি নিন্দা করছে। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর কারুর জীবনদর্শনে, কারুর জীবনধারার দিকে গেলেন না, বদলে যুক্তি দিয়ে পুরো জিনিসটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেইজন্য হিন্দু ধর্মের যে ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে, সেটা আচার্যের কথার উপরে। আচার্যের ভাব, ভক্তি সবই ছিল, তিনি সবটাই জানতেন আর তার সাথে এটাও জানতেন যে বিভিন্ন সিদ্ধপুরুষদের জীবনে এটা সাক্ষাৎ দেখা যায়। কিন্তু কোথাও আচার্য শঙ্কর এটা লিখছেন না, কারণ ওটা যুক্তিতর্কে দাঁড়াবে না। হিন্দুদের যাকেই কিছু বলা হবে, সে নিজের বংশের একজন, হয় ঠাকুরদা বা ঠাকুরদার বাবার নামে বলবে, উনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কেউ হয়ত সকাল-বিকাল দু-বেলা জপ করত, তাতেই তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ হয়ে যেতেন, কারণ বাকিরা তো কেউ কিছু করে না। আবার বয়স হয়ে গেলে ভোগ করার ক্ষমতা থাকে না, বসে বসে হরিনাম করছে, তাতেই মনে করছে, আমার দাদু মহাপুরুষ। কিন্তু এভাবে তো হয় না। একজন বলবে আমার বংশ বড়, আরেকজন বলবে তার বংশ বড়। ধর্মগ্রন্থ এদের দিয়ে এভাবে তৈরী হয় না। আচার্য শঙ্কর তাই সেগুলোকে বাদ দিয়ে যুক্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন।

এই যে বরাবর কি কর্ম করত হয়, এটা যেমন মাস্টারমশাইয়ের একটা অনুসন্ধিৎসা, তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত গভীর একটা দার্শনিক প্রশ্ন। আর এই প্রশ্ন যে শুধু হিন্দুদের মধ্যে আসছে তা না, অন্যান্য ধর্মেও এই জিনিসগুলো আসে। একটা সময়, বিশেষ করে যখন খ্রীশ্চানিটি অন্ধকার যুগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে ইসলামের দর্শনগুলি খুব উচ্চমানের ছিল এবং ইসলামের বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, পরে পরে কিছু গোলমাল হয়ে যাওয়াতে ইসলাম ধর্মে প্রচুর গোঁড়ামী ঢুকে যায়। কিন্তু ওনাদের মধ্যে এই ধরণের অনেক থিয়োলজিক্যাল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। আর খ্রীশ্চানরা এই জিনিসটাই প্রথমের দিকে করতেন, কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর পর

থেকে ওরা অন্ধকার যুগে ঢুকে যাওয়ার পর বিচিত্র বিচিত্র জিনিসগুলিকে খ্রীশ্চান ধর্মের নামে করতে শুরু করে দিলেন। ঠাকুর শাস্ত্র দিয়ে কোন কিছু ব্যাখ্যা করছেন না, যুক্তি দিয়ে কিছু ব্যাখ্যা করছেন না; তিনি যেটা করেছেন, যেটা দেখেছেন, যেটা উপলব্ধি করেছেন, সেটাই তিনি বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –না, প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশি পরিশ্রম করতে হবে না।

একটা হয় ধর্মজীবন, আরেকটা হয় আধ্যাত্মিক জীবন। একটু আগে সৎপুরুষ হওয়া, আচারি হওয়া আর আধ্যাত্মিক হওয়া এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে বলা হল। সৎপুরুষ মানে যাঁরা বলেন, ধর্ম আছে ঠিক আছে, আমার লাগবে না, আমাকে একজন ভাল মানুষ হতে হবে। হিন্দু বংশে আমি জন্ম নিয়েছে তাই আমি এটা করব না, ওটা করব না, এটা করব, ওটা করব; এই করে আমি একজন ভাল মানুষ হয়ে থাকতে চাই। ঈশ্বর আছেন কি নেই আমি জানিও না, মানিও না, এই ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহও নেই। আচারি মানে ধার্মিক জীবন পালন করাটাই যাঁর জীবনের দর্শন। আচারি পুরুষ মানছেন যে আমি একজন হিন্দু, হিন্দুদের যে কর্তব্যকর্ম – যত প্রকার সংস্কারকর্মাদি আছে, সেগুলো আমি করব আমি ঈশ্বরকে মানব, আমি জপধ্যান করব, আমি পঞ্চ মহাযজ্ঞ করব। হিন্দুরা সাধারণভাবে আচারি ছিলেন, প্রত্যেক ধর্মেই সাধারণ ভাবে লোকেরা আচারি হয়। ঈশ্বর বই আর কিছু জানি না, এই ভাব কোন প্রকারেই জনগণের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে না। কোথাও জনগণ যদি আধ্যাত্মিক হয়ে যায়, বুঝবেন ওদের আধ্যাত্মিকতায় গোলমাল আছে। এখন ভারতে প্রচুর গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। যারা পাঁচশ হাজার লোকের ক্যাম্প করে আধ্যাত্মিকতা শেখাচ্ছে, বুঝতে হবে গুরু আর শিষ্য দুইই গোল্লায় আছে। আধ্যাত্মিকতা কখনই জনগণের জন্য হতে পারে না, কোন পরিস্থিতিতেই এটা সম্ভব হতে পারবে না। আচার জনগণের মধ্যে হয়, সৎপুরুষ হওয়া জনগণের মধ্যে হয়, অধ্যাত্ম কোন মতেই জনগণের মধ্যে হবে না। আধ্যাত্মিকতা মুষ্টিমাত্র কয়েকজনের জন্য। অবতার বা কোন বড় মহপুরুষরা যখন আসেন, তখন আধ্যাত্মিকতার দিকে একটু বেশি সংখ্যায় মানুষ আকৃষ্ট হয়। কিছু দিন পর আবার আগের জায়গায় ফিরে যায়।

ঠাকুর নিজেকে একজন সৎপুরুষ তৈরী করতে বা ধর্মাচারের জন্য আসেননি; ঠাকুর এসেছেন আধ্যাত্মিক বন্যা আনার জন্য। মুশকিল হল, বেশির ভাগ লোকই যাঁরা ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছেন, তাঁরা জানেনও না যে তাঁরা ঈশ্বরকে চাইছেন না, আসলে তাঁরা চাইছেন একজন ভাল হিন্দু হতে। বেশির ভাগ লোকই এই তফাৎটা বোঝেন না। যে কোন জিনিসের যখন গ্ল্যামার হয়, মানুষ সেই জিনিসের দিকে আকর্ষিত হয়। ক্রিকেটে গ্ল্যামার আছে, সবাই এখন ক্রিকেটার হতে চায়। সবাই গ্ল্যামারসের দিকে যেতে চায়। ঠাকুর কথামৃতে ঈশ্বর দর্শন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলেছেন; সেটা পড়ে এখন সবাই স্পিরিচুয়াল হতে চায়। কিন্তু এটা কেউ বুঝছেন না যে, স্পিরিচুয়াল হওয়ার আগে প্রথমে সৎপুরুষ হতে হয়, আচারি হতে হয়, তারপরে আধ্যাত্মিকতার দিকে আসার যোগ্যতা হয়।

মাস্টারমশাই খাটার ব্যাপারে যে প্রশ্নটা করছেন, এই খাটনিটা তিনি স্পিরিচুয়ালিতে খাটনিকে নিয়ে বলছেন। কারণ আচার জিনিসটা সারা জীবন চলে। তাহলে স্পিরিচুয়ালিটি কিভাবে চলে? ঠাকুর বলছেন, প্রথম একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। ছ-মাস, এক বছর, দু বছর সাধনা করছে, তখন সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে দিনে দশ ঘন্টা, বারো ঘন্টা জপধ্যান করে যাচ্ছে। আমাদের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে নূতন কোন ব্রহ্মচারী যখন জয়েন করেন, কোন একটা সেন্টারে থেকে একটু একটু এখানকার ভাব নিতে থাকেন। এরপর দু-বছরের জন্য বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেন্টারে রেখে দেওয়া হয়। ওই দুটি বছর ব্রহ্মচারীরা শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপধ্যান ছাড়া কিছু করবেন না, বাইরের জগতের সাথে কোন রকম সম্পর্ক থাকবে না। বেলুড় মঠের কোন অল্প একটু ডিউটি পড়লে ঐটুকু কাজের বাইরে আর কোন কাজ করতে হয় না। দু বছর এভাবে থাকার ফলে ওদের মনে একটা ছাপ তৈরী হয়। এরপরে যার যেমন হবে, ঠিক

সময় হলে সব ফেলে এর উপর পুরো জোর দিয়ে দেবেন। দিনে আট ঘন্টা, দশ ঘন্টা জপধ্যান, অধ্যয়ন নিয়ে ছ-মাস, এক বছর, দু বছর যখন লেগে থাকে, তখন গিয়ে মন একটু স্থির হতে শুরু করে। তারপরে সত্যি সত্যিই আর বেশি পরিশ্রম করতে হয় না।

এই জিনিসগুলো বোঝান মুশকিল, কারণ যাঁরা সংসারে আছেন তাঁরা মনে করেন সন্ন্যাসীরা খুব মজায় আছেন, বহাল তবিয়তে আছেন। ওনারা জানেন না, যে কোন সন্ন্যাসী, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী আর কিছু হোক না হোক, সে বেলুড় মঠে দু-বছর ট্রেনিং সেন্টারে কাটিয়েছে, যেটা একটা ঘোর তপস্যার জায়গায়, এবং যে পিরিয়ডটা একটা ঘোর তপস্যার মধ্য দিয়ে সবাইকে যেতে হয়। ঘোর তপস্যার জায়গাতে দু-বছর থাকা মানে, তার মনে একটা জোরাল ছাপ পড়েছে। সন্ন্যাসীরা যত যাই করুক ওই ছাপটা কোন দিন কোন ভাবেই চলে যাবে না। ঠাকুর যে তপস্যার কথা বলছেন, এই তপস্যা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রত্যেকটি সন্ন্যাসী করেছেন। কারণ প্রত্যেক সন্ন্যাসী যত যাই করুক, দু-বছর সবাইকে ওই রুটিনের মধ্যে থাকতেই হবে। ভোর সাড়ে তিনটের সময় তাঁকে ঘুম থেকে উঠতেই হবে, কোন উপায় নেই। এরপর মন্দিরে এক থেকে দেড় ঘন্টা জপের জন্য বসতেই হবে। এরপর দিনে পাঁচটা করে পিরিয়ড, এক-একটা পিরিয়ড পঞ্চাশ মিনিট করে। প্রত্যেকটা ক্লাশ করতেই হবে, পরীক্ষা দিতেই হবে। ঘষে মেজে কিভাবে যে তৈরী করা হয়, এটা বেশির ভাগ লোকেরা জানেন না। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দেখলে মনে হয় যেন সবাই প্রায় একই রকম। জ্ঞান, তপস্যা এগুলোতে একটু তফাৎ থাকবেই; কিন্তু এনাদের জেনারেল যে আউটলুক, সেটা ওনাদের এক হয়ে যায়, তার কারণ ওই সিস্টেমের মধ্যে তৈরী হয়েছেন বলে।

ঠাকুর তারপর বলছেন, **"যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়,—সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে,—তারপর পাল টাঙাবার বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে। কামিনী-কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে শান্তি"**।

যেমন, একটা গাড়ি চালাচ্ছেন, পাহাড়ী রাস্থা দিয়ে নীচে নামছেন, তখন কত রকম ভাবে স্টীয়ারিংকে সামলে নিয়ে চালাতে হয়। এবার মেইন রাস্থায় এসে পড়লেন, গাড়ির স্টীয়ারিংএ শুধু আঙুলটা ঠেকিয়ে রেখেছেন, গাড়ি যেন নিজের মত ছুটে চলেছে। আধ্যাত্মিক জীবনে ঠিক তাই হয়, প্রথমে অনেকটা খাটতে হয়, অনেক কিছু করে করে এগোতে হয়। আগেকার দিনে যেমন কয়লার উনুন জ্বালাবার জন্য অনেক কিছু করতে হত। কিন্তু একবার উনুন ধরে গেল, ব্যস্ এবার নিশ্চিন্ত, মাঝে মাঝে শুধু কয়লা দিতে থাকুন আর যত খুশি রান্না করতে থাকুন।

কামিনী-কাঞ্চনের যে কথা ঠাকুর এখানে বলছেন, তার মানে, মন আর ইন্দ্রিয়ের যে খেলা এটাকে কাম-কাঞ্চন দিয়ে সহজ করে দিলেন। শুধু কাম-কাঞ্চনই না, আরও অন্যান্য অনেক কিছু থাকতে পারে; নাম, যশ এগুলো সবই থাকতে পারে। সবটাকে মিলিয়ে ঠাকুর সহজ করে কামিনী-কাঞ্চন দিয়ে বলে দিচ্ছেন।

এই যে কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়; আমাকে এটা হতে হবে, আমার এটা চাই, আমাকে ওখানে পৌঁছাতে হবে, ওটা আয়ত্ত করতে হবে; এই ঝড়গুলো প্রথমে কাটাতে হবে। সাধনা, তপস্যার প্রথমের দিকে উদ্দেশ্য হল এই ঝড়গুলোকে কাটিয়ে দেওয়া। নচিকেতার বাবা গরু দান করছেন, কি রকম গরু? যে গরু আর বাচ্চা দেবে না, দুধ দেবে না, শেষবারের মত ঘাস আর জল খেয়ে নিয়েছে; এদের আর কোন ঝড় নেই। যারা বলে বুড়ো বয়সে ধর্ম করা যাবে, বুড়ো বয়স মানে নচিকেতার বাবার গরু; এদেরও কামিনী-কাঞ্চনের ঝড় চলে গেছে, এদের দ্বারা আর কিছু হবে না। কম বয়সে যখন কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়টা আছে, ওই বয়সে তপস্যা করে ঝড়কে প্রতিহত করতে পারলে তখন যদি গিয়ে কিছু হয়। এটাই আজকে আমাদের হিন্দু ধর্মের দুর্ভাগ্য। ঋষিরা কক্ষণ বলেননি যে, বয়স হলে ধর্ম করতে

হবে। ধর্ম হল কম বয়সের জন্য। বয়স কম থাকতে থাকতে ধর্ম শুরু করতে হয়। তাহলে বৃদ্ধ বয়সে কি করবে? সারা জীবন কিছুই করলেন না, বৃদ্ধ বয়সেই শুরু করুন। কিন্তু আপনি যে ভুলটা করেছেন, এই ভুল যেন আপনার সন্তান-সন্ততিরা না করে। আপনার সন্তানরা বুড়ো বয়সে গিয়ে যেন আফশোষ না করে যে, এই কথাগুলো আমাকে কেউ তো আগে বলেনি। ধর্মের ট্রেনিংটা অল্প বয়স থেকেই পাওয়া দরকার। গাড়ির যেমন ইঞ্জিন দরকার, তেমনি তার স্টিয়ারিং দরকার। ইঞ্জিন লড়ঝড়ে সেই গাড়ির স্টিয়ারিং দিয়ে কি হবে! আর ইঞ্জিন নূতন ঝকঝকে কিন্তু স্টিয়ারিং নেই, গাড়ি কি করে চলবে! আধ্যাত্মিক জীবন মানে তার ইঞ্জিনও চাই স্টিয়ারিংও চাই। এটাই ঠাকুর এই জায়গাতে বলছেন। এরপর ঠাকুর বলবেন, যাদের যোগীর লক্ষণ আছে, আগের আগের জন্মে সাধনা করেছে, তাদেরও খুব সাবধান থাকতে হয়।

ঠাকুর শব্দটা বলছেন, 'কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়-তুফান', এই ঝড়-তুফান কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি। এখান থেকে এবার ঠাকুর যোগীর লক্ষণের কথা নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন, "**কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়**"।

এখানে আবার মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে, অবতাররা যখনই আসেন, তিনি যে অবতারই হন না কেন, শ্রীরাম হন, শ্রীকৃষ্ণ হন; এনাদের সবার উদ্দেশ্য হল ধর্মকে লোকেদের মধ্যে পুনরায় স্থাপিত করা। খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্মে যদিও একবারই অবতার এসেছেন; কিন্তু এনাদের ধর্ম যদি খুব কাছ থেকে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, এনাদের ধর্মেও অনেক সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁদেরকে দেখে লোকেরা শিক্ষা পায়, এনাদের শিক্ষা পেয়ে, এনাদের আচার আচরণ দেখে লোকেদের বিশ্বাস ভরসা হয় যে এই ধর্ম ঠিক ঠিক ধর্ম। অবতাররা যে রূপেই আসুন না কেন, তাঁরা জ্ঞান, ভক্তিই শেখান।

কিন্তু অবতারদের আলম্বনটা আলাদা আলাদা হয়। বলা হয় যে, কখন সত্ত্বগুণ আলম্বন করে আসেন, কখন রজোগুণ আলম্বন করে আসেন, কখন আবার তমোগুণকে আলম্বন করে আসেন। যে গুণকেই আলম্বন করে আসুন কিন্তু ওনার যে আচার, ব্যবহার এর একটা বিশেষ রূপ থাকে। শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে এসেছেন; শ্রীকৃষ্ণ যেন একজন যোগীশ্বর হয়ে এসেছেন, যিনি সব কিছুতে নির্বিকার। অন্য দিকে ঠাকুর একজন আদর্শ ভক্ত রূপে এসেছেন। তবে আমরা যে অর্থে ভক্ত বলি, সেই অর্থে ঠাকুর ভক্ত নন। কারণ যখনই আমরা ভক্ত বলি, তখন আমরা ধরে নিই যে, তিনি সাধনা করছেন কোথাও একটা পৌঁছাবেন বলে। কিন্তু ঠাকুর তা নন, তিনি একটা লীলা করছেন, যেখানে তিনি ভক্তের রূপ অবলম্বন করে আছেন। যখনই অবলম্বন করা হয়, তখন তিনি যা কিছু করবেন একেবারে শতকরা একশ ভাগ একজন আদর্শ ভক্ত রূপেই করবেন।

অনেকগুলো কারণে ঠাকুরকে আমরা এই যুগের আদর্শ বলি। তার মধ্যে একটা কারণ হল, তিনি গৃহস্থ রূপেও দেখালেন কিভাবে সংসারে থেকেও সংসারের যে মূল ঝড়, কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশের ঝড়, এগুলো থেকে আলাদা থাকা যায়। আর সন্ন্যাসী রূপে তো বটেই। শ্রীশ্রীমা বলছেন তিনি ছিলেন ত্যাগের বাদশা। সন্ন্যাসকে যদি ত্যাগের অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে ঠাকুর ছিলেন ত্যাগের বাদশা। ভক্ত হয়ে ঠাকুর এসে জ্ঞান ভক্তি শেখাচ্ছেন কিভাবে জ্ঞান ভক্তি করতে হয়। আমরা যে জ্ঞান ভক্তি বলছি, এতে কর্ম ও যোগ এই দুটোকেও মিলিয়ে বলা হচ্ছে। যাঁরা ভক্তি করছেন, তাঁরাও যোগ সাধন করছেন। যোগী হওয়া মানে মন প্রাণ যিনি সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের অর্পণ করে দিয়েছেন। ঠাকুর দেখাবেন যোগীর জীবন কিভাবে চলবে।

এখন পর পর কথামৃতে যে আলোচনা হতে যাচ্ছে, এর মধ্যে প্রথম যে জিনিসটা আমরা দেখব, তা হল, যদি আমরা বেদান্তের সিদ্ধান্ত নিই, অর্থাৎ বেদান্ত জীবনকে কিভাবে দেখছে যেখানে বলছেন, আমাদের একটা বড় দুর্বলতা আছে; এই দুর্বলতাকে কোন মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে না, সেটা হল – একটা জিনিসকে আঁকড়ে ধরে রাখা। আঁকড়ে ধরাটা মানুষের এমন স্বভাব যে, যেমন বাচ্চা যখন কোন

খেলনা পায় তখন ওই খেলনাটাকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, আর ছাড়বে না। বাচ্চারা পড়াশোনা করতে চাইবে না, কারণ তা করলে সেটা ওকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে, বদলে খেলাধূলাকে আঁকড়ে রাখবে। আঁকড়ে ধরা মানে, জিনিসটা তাকে নীচের দিকে নিয়ে যাবে।

আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *বাল্যস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত তরুণোস্তাবৎ তরুণীরক্ত*। আমরা যে কাজই করি সেখানে কাজ করি না, আঁকড়ে ধরে রাখি কাজটা যেন হাত থেকে না বেরিয়ে যায়। পোড়ো বাড়ি, বাড়ির সব কিছু খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, ওই বাড়িতে যারা বাস করছে, তারা কিছুতেই বাড়িটা ছাড়তে চাইবে না। আমি এক সময় স্বামীজীর পৈতৃকভিটাতে ছিলাম। সেখানে দেখলাম পোড়ো বাড়ির মধ্যে ঝুপড়ি করে ভাড়াটিয়ারা বাস করছে। ওদের সবাইকে ভাল ফ্ল্যাট, সঙ্গে অনেক টাকা দেওয়ার কথা বলা হল তার সাথে সব রকমের সুবিধা। তা সত্ত্বেও ওরা স্বামীজীর বাড়ির ছোট্ট আস্তানাটুকু ছাড়তে চাইছে না। মানুষের স্বভাব, যেটা আছে, তা ভাঙাচোড়া হোক, জীর্ণ হোক, সেটাকেই আঁকড়ে থাকবে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, উট কাঁটা ঘাস খায়, মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত বেরোচ্ছে; উট যে কোন কারণেই কাঁটা ঘাস খাক, এখনে উপমাটা হল; যে জিনিসটাকে ধরে আছে, সেটার জন্য ওখানে সে যত কষ্ট পায় পাক, ওটাকে সে ছাড়বে না, কারণ আঁকড়ে ধরে রাখাটাই আমাদের স্বভাব। যে জিনিস আমাকে একটু সুখ আর হাজার গুণ দুঃখ দেয়, সেটাকেই আমরা ছাড়তে পারছি না, সেখানে আমার এই যে শরীর, যে শরীর নিয়ে আমি জন্মেছি, যেটাকে নিয়ে আমি সারাটা জীবন কাটাচ্ছি; এই মন, যেটা আমার অস্তিত্ব, সেটাকে কি করে ছাড়ব?

কথামৃতে ঠাকুর বারবার দেখাচ্ছেন, এই যে ধরে রাখা, আঁকড়ে রাখা, এটাকে কিভাবে একটু আলগা করা যায়। অন্যান্য ধর্মে, অন্যান্য মতে ধর্ম বলতে যাই বোঝাক, আমরা ধর্ম বলতে বুঝি আপনি কতটা এগিয়ে যাচ্ছেন; আমরাও বলি ভাই এগোচ্ছ তো? কিন্তু অর্থটা সব সময় হয়, কি ত্যাগ করছো তো? হিন্দুদের কাছে এগোন মানে কিছু করা না, হিন্দুদের কাছে এগোন মানে ত্যাগ করা। মন থেকে কতটা তুমি ত্যাগ করলে, জিনিসগুলো কতটা ফেলা হল। কারণ আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান মানে তুমি যা, তুমি সেটাই হলে। তুমি যেটা নও সেটাকে ধরে আছ। ধর্ম করা, যোগ করা, ভক্তি করা, জ্ঞানযোগ অনুশীলন করা, এর সবকটার অর্থ একটাই – তুমি যেটা নও সেটাকে তুমি ফেলতে পারছ কিনা।

এই সিদ্ধান্তকে আমরা বিভিন্ন ক্লাশে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছি; কিন্তু ধর্মের এই জিনিসটার ধারণা সহজে হয় না বলে একই কথা অনেকবার বলতে হয়। যাঁরা ধর্মজীবনে আছেন, জপধ্যান করছেন আর ধর্মের দু-চারটে কথা জানেন; আমাদের যে সাধারণ বোধ; তার মানে, আমরা যখন একটা কাজ করি, আমরা দেখি কাজে আমরা কতটা সফল হলাম। এই সাফল্য পাওয়া মানে এগোন। চাকরিতে কুড়ি হাজার টাকাতে ঢুকেছিলাম, প্রমোশন পেয়ে তিরিশ হাজার টাকা হয়েছে, সেখান থেকে চল্লিশ হাজার হল, আমরা এগোচ্ছি। দু কামরার ফ্ল্যাট ছিল, সেখান থেকে একটা চার কামরার বাড়ি কিনলাম; আমরা এগোচ্ছি। সাধনজীবনেও আমরা ওই ভাবে ভাবি, আমরা এগোচ্ছি। এগোচ্ছি মানেই সেখানে কিছু একটা করা হচ্ছে। ধর্মজীবনেও মানুষ এগোয় কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এগোন মানেই আসলে হয় ফেলা। এখন যে আলোচনা হবে, ঠাকুর এটার উপরেই করবেন – ধর্ম মানে জিনিসটাকে ফেলে দেওয়া।

জিনিসটাকে ফেলে দেওয়াটা ধর্ম কিভাবে হয়? সাধারণ ভাবে বলা হয়, বিচার। বিচার করে করে ত্যাগ করতে হয়। জ্ঞানযোগে বারবার নিত্য ও অনিত্যের বিচার করতে হয়। তার মানে বিচার করে করে যখন দেখা যায় এটা অনিত্য, সেটাকে তৎক্ষণাৎ ফেলে দিতে হয়। যেটা বিঘ্নকর, যেটা কষ্ট দেয় সেটাকে ফেলে দিতে হয়। কিন্তু জ্ঞানযোগ, সাংখ্যযোগের মূল বক্তব্য হল, আত্মা তোমার শুদ্ধ স্বভাব, আত্মা বাদে যা কিছু আছে সেটাকে ত্যাগ কর।

কিন্তু এগুলো খুব উঁচু কথা, প্রথমে অনেক নীচের থেকে শুরু করতে হয়। প্রথমে যে বিঘ্নগুলি আছে সেগুলোকে ত্যাগ করতে হয়। এটাকে তখন আমরা ঠিক বিবেক বলতে পারি না। প্রায়ই আমরা

এই শব্দ বলি – বিবেক-বিচার। বিবেক জিনিসটা আসে উচ্চতর অবস্থায় গিয়ে। পুরুষ-প্রকৃতির যে ব্যাপার, এটাকে যেখানে বিচার করে ছাড়া হয়, সেই জায়গাতে আসে বিবেক। কিন্তু সাধারণ ভাবে আমাদের জীবনে যে বিঘ্নগুলি আছে, এটাকে বিচার করে ছাড়তে হয়, এর ব্যাখ্যা ঠাকুর পরে করবেন।

কিন্তু তার থেকেও বেশি গুরুত্ব হল দ্বিতীয় যেটা বলছেন, পরে স্বামীজী দেশে এই আদর্শটাই দিলেন। এই conceptটার নাম হল Diluted Materialism। বাংলায় আমরা বলতে পারি নিয়ন্ত্রিত ভোগবাদ, ভোগ কর কিন্তু একটা নিয়ন্ত্রণ রেখে ভোগ কর, একটা বর্ডার লাইন টেনে ভোগ কর। নিয়ন্ত্রিত ভোগবাদে কি হয়, যাদের মনে যে সাধারণ ইচ্ছা, ভোগ-বাসনাগুলি রয়েছে, তাদের প্রথমেই একটা উচ্চ আদর্শ দিয়ে দিলে তারা ছটফট করতে থাকবে।

বিদেশে থাকাকালীন স্বামীজীর জীবনের অনেক ঘটনা মেরি লুইবার্কের নামকরা বই The New Discoveriesতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে দেখা যায় স্বামীজী খ্রীশ্চানিটির অনেক আদর্শকে ব্যঙ্গ করতেন। নিউ টেস্টামেন্ট, যেটা বাইবেল, সেখানে যীশু যে আদর্শগুলি দিয়েছেন, যেগুলিকে নিয়ে খ্রীশ্চানরা গর্ব করে বেড়ায়, এই আদর্শগুলি একমাত্র উচ্চতম সন্ন্যাসী যাঁরা তাঁরাই পালন করতে পারেন, সাধারণ মানুষ পারবে না। অন্যান্য ধর্মে যারা বড় বড় কথা বলে, ঠাকুরের অশেষ কৃপা যে তার নিজেদের ধর্মকে ভাল বোঝে না। ধর্ম যদি ওরা বোঝার চেষ্টা করে, ওদের মস্তিষ্কে গণ্ডগোল হতে শুরু হয়ে যাবে। একে মারা, তাকে মারা, অন্যদের নিন্দা করা ছাড়া এরা আর কিছু বোঝে না।

হিন্দুরা প্রথম থেকেই জানেন যে, সন্ন্যাসীর আদর্শ সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আজকে আমরা যেখানে আছি, এখান থেকেও যদি বোকার মত প্রশ্ন করতে থাকি, সৃষ্টি কবে হল, কিভাবে হল, কোথা থেকে হল; এই প্রশ্নগুলির উত্তর কারুর কাছে নেই। পুরাণাদিতে কাহিনীরূপে কিছু কিছু সৃষ্টির বর্ণনা আছে, কিন্তু এগুলো কাহিনী। মানুষের স্বভাব সৃষ্টির ব্যাপারে জানা, তাদের মনকে শান্ত করার জন্য কাহিনীর মাধ্যমে একটা আইডিয়া বলে দেওয়া হল, সৃষ্টি এভাবেই হয় আর এমনটাই হয়। সেইজন্য হিন্দুরা নিয়ে এলেন – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

অর্থ আর কাম সবার আগে। অর্থ হল, জাগতিক যা কিছু দরকার, সংসারে থাকতে গেলে যা কিছু দরকার; অর্থ দিয়ে মিটিয়ে নেওয়া হয়। এই যে বন্ধন, আমি কিছুতেই আর পেরে উঠছি না, কষ্ট পাচ্ছি; অর্থ এই বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়, স্বাধীন করে দেয়। মনে যে নানান রকমের অশান্তি, কাম এই অশান্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। অশুভ যোনিতে জন্ম নেওয়া থেকে ধর্ম মুক্তি দেয়। আর মোক্ষ সব কিছু থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়। অর্থ আর কাম, এই দুটো জিনিস যদি ঠিক ভাবে শাস্ত্র সম্মত ভাবে না করা হয়, এটাই তখন কামিনী-কাঞ্চন হয়ে যায়। অর্থ আর কাম কামিনী-কাঞ্চনে চলে গেলে পুরোটাই বন্ধন হয়ে যায়।

ঠাকুর অবতার, তিনি সবারই জন্য অবতার হয়ে এসেছেন। যাঁরা খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসী তাঁদের জন্যও এসেছেন। যাঁরা প্রথম ধর্মে পা রেখেছেন, তাঁদের জন্যও এসেছেন। সেইজন্য কথামৃতে যেমন পূর্ণত্যাগের কথা আছে, তার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রিত ভোগবাদের কথাও পাওয়া যাবে, যেখানে একটা শৃঙ্খল ভাবে ভোগের অনুমতি দিচ্ছেন। আমরা যেমন বলি, পুরো ভোগে নেমে যাওয়া, সে-রকম না, ভোগের উপর একটা নিয়ন্ত্রণ রাখার কথা বলা হচ্ছে। এখন যেমন টিভি, নিউজপেপারে চারিদিকের ঘটনার বর্ণনা দেখলে আমাদের আতঙ্কিত হয়ে যেতে হয়, কি হচ্ছে সমাজে! নার্ভাস হয়ে যেতে হয়। এমন কি পিতামাতার সন্তানের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেটাও খুব নোংরা হয়ে যাচ্ছে, দেখলে কেমন ঘেন্না লাগে।

একটা জিনিস আমাদের খুব ভাল করে মনে রাখতে হয়, একটু আগে আমরা যে বললাম – আঁকড়ে ধরে রাখা, এটা যেন না হয়। এই জায়গাতে এসে আমরা ভুল করে বসি। আমরা মনে করি আমাদের সব কিছু ত্যাগ করতে হবে, প্রস্তুতি নেই তাও ত্যাগ করতে যাচ্ছে; ফলে অনেক সমস্যা হয়ে

যায়। জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রতি কিভাবে ভক্তি লাভ হয়। এটা একটা জীবনের উদ্দেশ্য; ত্যাগ তার একটা পথ। কিন্তু ত্যাগ সব কিছু নয়, উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। অনেক সময় এটাকে বলে – পথ আর লক্ষ্য। লক্ষ্য যখন মাথায় থাকে, তখন অনেক সময় আমরা পথকে ফেলে দিই। আবার অনেক সময় পথকে যেন লক্ষ্যের থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলি; দুটোকে নিয়েই চলতে হয়। মহাভারত পথ ও লক্ষ্য দুটোকেই সম্মান দেন। পরীক্ষায় পাশ করাটাই যে উদ্দেশ্য, তা কখন নয়। আরও পড়ে যাও, পরীক্ষায় পাশ ফেলের দিকে তাকাতে হবে না; এটাও ভুল। পড়াশোন করার সময় দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে – বিষয়ের জ্ঞানলাভ যেন হয় আর তার সাথে পরীক্ষাতেও যেন ভাল নম্বর পাওয়া যায়। সৎ ভাবে হোক, অসৎ ভাবে হোক, পরীক্ষককে ঘুষ দিয়ে হোক, চুরি করে হোক; যে করেই হোক পরীক্ষায় ভাল নম্বর আনতে হবে – এটাকে আমরা কখনই সমর্থন করি না। তার সঙ্গে চোখ-কান বুজে দিনরাত পড়ে যাচ্ছ, তোমার বিষয়ের জ্ঞান হচ্ছে; কিন্তু পরীক্ষার খাতায় ঠিকঠাক ভাবে লিখতে পারছ না, নম্বর পাচ্ছ না; এটাও ঠিক না।

মূল কথা, পথ আর লক্ষ্য দুটোরই সমান গুরুত্ব। সব কিছুর উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রতি এগিয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের প্রতি যাওয়া মানে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান মানে যা কিছু অনাত্ম আছে সেটাকে ত্যাগ করা। প্রথমের দিকে চেষ্টা করে ত্যাগ করতে হয়, পরে ত্যাগ স্বাভাবিক হয়ে যায়। মাঝখান থেকে দেখা গেল ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে না, ত্যাগের গুরুত্বটাই বেশি হয়ে গেছে। ধ্যান করছে না, খালি নাক টেপাটেপি করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে যাচ্ছে। ধ্যানের থেকে প্রাণায়ামটাই বেশি গুরুত্ব পেয়ে গেল। প্রাণায়াম কিসের জন্য? প্রাণায়াম করা মনটাকে যাতে স্থির করা যায়। মন স্থির কেন করতে হবে? মনটা যাতে অন্য দিকে না গিয়ে শুধু ঈশ্বরের দিকে যায়। উদ্দেশ্যটা যদি কেউ ভুলে যায়, তখন তার কাছে পথের গুরুত্ব বেশি হয়ে যাবে, যেটা কোথাও নিয়ে যাবে না। কথামৃতে এই দুটো জিনিস ঘুরে ঘুরে আসবে।

এখানে ঠাকুর ত্যাগের কথা বলছেন ঠিকই, কিন্তু দুটোকে নিয়েই বলছেন – বিচার করে ত্যাগ, তার সঙ্গে একটু ভোগ করে নেওয়া। আগে আগে আমরা একটা কথা আলোচনা করেছিলাম, ধর্ম পথে যাঁরা আসেন, যাঁরা অতি সাধারণ তাঁদের কথা বলছি না; যাঁরা এই পথে আছেন। অনেক সময় আমাদের মনে অনেক রকম দুর্বলতা আসে। যাঁরাই জপধ্যান করেন, তাঁদের মনে দুটো জিনিস একসাথেই হয়। একটা হল, জগৎকে ত্যাগ করতে শুরু করেন বলে নিজেক কোথাও আলম্বনহীন বলে মনে হয়। বানরগুলো যখন এক ডাল থেকে ঝাঁপ মারে তখন তারা একটা ডালকে ছেড়ে আরেকটা ডালকে ধরে। বাচ্চা বানরগুলো তাদের মাকে দেখে ঝাঁপ মারতে যায়, কিন্তু একটা ডালকে ছেড়ে আরেকটা ডালকে ধরতে পারে না বলে নীচে পড়ে যায়। ওস্তাদ বানরগুলো যত বড়ই হোক, এমন ঝাঁপ মারবে যে, ঠিক একটা ডালকে ছেড়ে আরেকটা ডালকে ধরে নেবে। ধর্ম জীবনে আমরা হলাম বাচ্চা বানর। একটা জাম্প মেরে ওই যে কিছুক্ষণ, কয়েক সেকেণ্ড বা মাইক্রো সেকেণ্ড বাতাসে ভাসছে, ওই মুহূর্তে একটা ভীতির সঞ্চার হয়। এটা তো ছেড়ে দিলাম, ওটা তো ধরা হয়নি, এবার মাঝখানে কি হবে? এই একটা সমস্যা আসবে।

অন্য দিকে আরেকটা সমস্যা আসে। জপধ্যান করলে, ঈশ্বরের দিকে গেলে, মনের ভিতর শক্তি বৃদ্ধি হতে শুরু হয়ে যায়। যিনি দীক্ষা নিয়েছেন, জপধ্যান করছেন, ধর্ম পথে এগোচ্ছেন আর মনে করছেন আমি যেই কলু সেই কলু, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর কিছু গোলমাল আছে। যদি আপনি ঈশ্বরীয় কথা শুনে যাচ্ছেন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বাড়ছে, জপধ্যান করছেন; প্রথম আপনার যে অনুভব আসবে সেটা হল, আপনার ভিতরে শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে, এই অনুভব হতে বাধ্য। আর যদি মনে হয় যে, আপনার মধ্যে শক্তি বাড়েনি, তাহলে বুঝে নিন আপনার জপধ্যানে কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে। আপনি যেদিক থেকেই দেখুন, প্রাণায়ামের দিক থেকে দেখুন, কুণ্ডলীনির দিক থেকে দেখুন, এনারা সবাই বলেন যে, একটা অনন্ত পরিমাণ শক্তি আপনার রিলিজ হতে যাচ্ছে, একটা বিরাট বড় শক্তির ঝড় আসছে। শক্তির

ঝড় তো দুম করে এসে যাবে না। ঝড় আসার আগে প্রথমে একটু হাল্কা বাতাস, তারপর একটা ঝোড়ো বাতাস, তারপর আসে ঝড়। সেই রকম কুণ্ডলীনির জাগরণ হবে, অসম্ভব ক্ষমতা আসবে, একদিনে হয় না, একটু একটু করে ক্ষমতা আসতে শুরু করে।

ফলে কি হয়, ওই শক্তি যখন আসে, তখন গুরু যদি সঙ্গে না থাকেন, একজন হিতৈষী সব সময় সঙ্গে যদি না থাকে, তখন মন যেমনি একটু ডান দিক বাম দিক হতে শুরু করবে, এই শক্তিকে সামলাতে পারা যাবে না, কারণ শক্তি কিনা। গুরু সঙ্গে থাকলে বা একজন হিতৈষী কাছে থাকলে তিনি আপনাকে ঠিক রাস্থায় ধরে রাখতে সাহায্য করবেন। বাচ্চার হাতে একটা খেলনা বন্দুক দিয়ে দিলে সে যেখানে সেখানে গুলি চালাতে থাকবে। এগুলোকে আমরা বলি দুর্বলতা।

যখন একটাকে ছেড়ে আরেকটাতে জাম্প মারছে, তখন মাঝখানে একটা ভয় তৈরী হয়। সংসার ছেড়ে যখন ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে, মাঝখানে যে ঝুলছে তাতে যে ভয়, আর তার সাথে যে শক্তি আসছে, সেই শক্তিটা যেখানে সেখানে লাগিয়ে দিচ্ছে, এই সবকটাকে মিলিয়ে একটা কথাই বলা হয় – এগুলো হল দুর্বলতা। দুর্বলতা যখনই আসে, তখন বুঝতে হয় ভিতরে একটা কিছু জাগছে, তমোগুণ দমে গিয়ে রজোগুণ জাগছে। সেইজন্য এগুলোকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, ভয় পেতে নেই। যখন দুশ্চিন্তা আসছে, সংসারটা গেল, এবার কি হবে; দ্বিতীয়তঃ যে কোন দুর্বলতা এলে আপনি বুঝতে পারছেন এটা ঠিক না; সংসারীরা যখন এই ধরণের কিছু করে তখন এটা ঠিক না, এটা পাপ। কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে যাঁরা এসে গেছেন, তাঁরা যখন একটু ডান দিক বাম দিক করেন, তখন এটা ঠিক পাপ না, রাস্থাটা ছেড়ে একটু অন্য দিকে যাচ্ছে। এই সব কিছুকে নিয়ে এবার ঠাকুর এই জায়গাতে আলোচনা শুরু করছেন এই বলে –

"**কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়**"। এর আগে ঠাকুর সাধারণ লোকেদের জন্য কামিনী-কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। যাঁরা যোগ সাধনা করছেন, তাঁদের শরীরে কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। কপাল, চোখ দেখলে বোঝা যায় ইনি একজন যোগী। কারু কারু সাধনা করতে করতে শরীরের এই লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে। আবার অনেক সময় অনেকের জন্ম থেকেই লক্ষণগুলো দেখা যায়। কিন্তু তাঁদেরও সাবধান হতে হয়।

যেমন ধরুন একজন রাজার ব্যাটা, সে জন্ম থেকেই জানে আমি রাজার ব্যাটা, রাজার ব্যাটা হলেও তাকে পড়াশোনা করতে হয়, রাজার ব্যটাকেও অস্ত্রশিক্ষা নিতে হয়, রাজার ব্যাটাকেও শ্রদ্ধা সম্মান করার আদব-কায়দা শিখতে হয়। তুমি জন্ম থেকেই একজন যোগী ঠিকই, কিন্তু এই জগতে তুমি যখন এসেছ, তার মানে তোমার কিছু গোলমাল ছিল। তোমার যদি গোলমাল না থাকত তাহলে তো তোমাকে জন্মই নিতে হত না। গোলমাল আছে বলেই তোমাকে জন্ম নিতে হয়েছে। শুভ সংস্কার আছে বলে তুমি যোগী, সেইজন্য তোমার শরীরটা যোগীর মত।

সাধারণ ভাবে যোগীদের শরীর সুস্থ থাকে, হাঁটাচলার মধ্যে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে। জামা-কাপড় পরিষ্কার, সব কিছু ফিটফাট থাকে, এগুলো দেখে বোঝা যায় যে মনটা তাঁর নিয়ন্ত্রিত। মহিলারা যেমন অনেকক্ষণ ধরে সাজগোজ করেন, কিন্তু সেখানে উদ্দেশ্যটা হল নিজের শরীরের সৌন্দর্যটাকে লোকেদের সামনে প্রদর্শন করা। যোগীরা যে ফিটফাট থাকেন, সেখানে তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য, মনটাকে সজাগ রাখা। ঠাকুরের জীবন, স্বামীজীর জীবন দেখলে ঠিক এই জিনিসগুলো দেখা যাবে, প্রচণ্ড সজাগ আর সব কিছু ফিটফাট। শরীর থেকে শুরু করে জামা-কাপড় সব কিছুই যোগীদের ফিটফাট। আমার 'Carving Sky' বইতে আমি এই জিনিসটাকেই উল্লেখ করেছি, Externally disorganized persons are always internally disorganized। আপনার বাইরেটা যদি ফিটফাট না থাকে, তাহলে আপনার ভিতরটাও disorganized। যোগী বাইরেও organized ভিতরেও organized।

এই যোগীদের কথাই এখানে ঠাকুর বলছেন, **"কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত"**। যোগীদের এর বাইরে আর কিসের ব্যাঘাত হবে! কাঞ্চন থেকে তো ব্যাঘাত হয় না, ব্যাঘাত সব সময় একটাই হয়, কামিনী। কামিনী যদি না থাকে তাহলে কাঞ্চন লাগবে কেন। শরীর চালানোর জন্য একটা মানুষের কতটুকুই বা লাগে। কিন্তু যার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই তারপরেও সে যদি টাকার পিছনে দৌড়ায়, তাহলে বুঝতে হবে তার মানসিক অসুস্থতা আছে।

এই যে আমরা আজকাল দেখতে পাই কত নেতা, আমলা শত শত কোটি টাকা কামাচ্ছে, এরা প্রত্যেকেই আসলে মানসিক রোগী। মোবাইলে সব সময় সেলফি নিচ্ছে, নিজের মুখটা সর্বদা দেখতে চাইছে। নিজেকে দেখতে চাওয়া, এটাও মানসিক বিকার। এটা আমার কথা না, আজ সারা বিশ্বের মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, নিজেকে দেখতে চাওয়াটা পুরোপুরি মানসিক বিকার থেকে আসে। টাকা জমিয়েই যাচ্ছে, টাকার পাহাড় করে দিয়েছে – মানসিক বিকার; ভুল জায়গায় মনটা গিয়ে পড়ে গেছে। তাই কাঞ্চন থেকে যোগীদের ব্যাঘাত হয় না।

আসল যে ব্যাঘাত যোগীদের হয়, সেটা নামযশ থেকে; কিন্তু নামযশ ব্যাপারটাও এমন কিছু না। খবর কাগজে, টেলিভিশনে আমরা যেসব যোগীদের নাম দেখতে পাই, এনাদের প্রচুর নামযশ। আপনি হয়ত বলতে পারে, স্বামীজীরও তো নামযশ ছিল, এনাদের থাকলে কি সমস্যা? কোন সমস্যা নেই, কিন্তু নামযশের সাথে প্রথমেই এনাদের আসবে টাকা, আর তারপরেই মেয়ে। ফেমাস যোগী বা সেলিব্রেটি যোগী মানেই সব সময় টাকা-পয়সা আর মেয়ে-মানুষ তাঁকে ঘিরে রাখবে। নামযশ কোন সমস্যা করে না। স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখার আগে থেকেই তিনি কত ফেমাস। কিন্তু কোথায় ছিল তাঁর টাকা-পয়সা, অর্থাভাবে বেলুড় মঠটাও ঠিক ভাবে স্থাপন করে যেতে পারলেন না। বেলুড় মঠের মন্দিরে ভাল করে দেখলে বুঝতে পারবেন পাথরের বদলে সিমেন্টের কাজ করা; টাকা ছিল না তাই করা যায়নি। দেশে বিদেশের বাকি ধর্মগুরুরা রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দেখে হাসে। কোন বাবাজী হাজার কোটি, কারুর দশ হাজার কোটি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, ওদের টাকার অঙ্ক দেখে আমরা আঁৎকে উঠি।

নামযশটাই ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবিক ভাবে কামিনী-কাঞ্চনে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমরা খুব সহজ ভাবে একসাথে কামিনী-কাঞ্চন ও নামযশ বলি ঠিকই, কিন্তু নামযশের নিজের মধ্যে কোন সমস্যা নেই। নামযশ যখনই কামিনী-কাঞ্চনে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখনই নামযশ গোলমালের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আপনার অঙ্গে অনেক গয়না আছে, গয়নার মধ্যে অনেক হীরে বসানো আছে, ওটাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যেমনি হীরেটাকে বিক্রি করে টাকায় রূপান্তরিত করলেন, এরপর টাকা নিয়ে খেলা হবে। কারণ সাধারণ মানুষ তো হীরে নেবে না। টাকা-পয়সা যখন আসে তখন গোলমাল হতে শুরু হয়। সাধারণ মানুষ জীবনে, যোগী মানুষরা জীবনে কাঞ্চন নিয়ে কতটুকু আর কি করবেন, যদি না মানসিক বিকারের রোগী হয়। যোগীদের একমাত্র বিঘ্ন কামিনী।

তারপর ঠাকুর বলছেন, **"যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে,–হয়তো ভোগের বাসনা কিছু ছিল"**। কোন বাসনা থাকলে এগুলো অবশ্যই হবে। আমরা শাস্ত্রের কথা যদি খুব গভীর ভাবে চিন্তন করি, তাহলে দেখতে পাবো, কোথাও একটা খুব হাল্কা বাসনা, অপূর্ণ ইচ্ছা যদি থেকে যায়; সেই অপূর্ণ ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে গিয়ে অনেক সময় এত কিছু হয়ে যায় যে, যেটাকে আর সামলানো যায় না।

ঠাকুরের খুব নামকরা গল্পা আছে, কৌপিন কে ওয়াস্তে। একজন সাধুর ঘরে ইঁদুর ঢুকে তাঁর কৌপিন কেটে দেয়। সাধুর আরেকটা কৌপিন দরকার। যার কাছে কৌপিন কিনতে গেছে সে সব শুনেটুনে বলছে, 'ইঁদুর আপনার কৌপিন কেটে দিচ্ছে তো, আপনি একটা বিড়াল পুষুন, তাহলেই এই সমস্যা মিটে যাবে'। সাধুবাবা তার কথামত বিড়াল পুষেছেন, বিড়ালকে এবার দুধ খাওয়াতে হবে, তার জন্য একটা গরু দরকার। গরু রাখলে তো হবে না, গরুর দেখাশোনা করতে হবে, ঘাস আনতে হবে,

ঘাস খাওয়াতে হবে, দুধ দোহন করতে হবে। এত কিছু করে সাধুকে সাধন-ভজনও করতে হবে। তাই এগুলো দেখাশোনা করার জন্য একটা মেয়ে দরকার। একটা মেয়েকে আনা হল। এই করে করে দেখা গেল, সাধুবাবা এখন বিয়ে-থা করে জোর সংসার চালাচ্ছেন।

গুরু কিছু দিন পর ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসেছেন। সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, 'এখানে আমার এক শিষ্য ছিল, কিন্তু এই জায়গায় এত বড় বাড়ি দেখছি, এই বাড়ি কার'? যাকে জিজ্ঞেস করছেন, সে বললে, 'আমিই আপনার সেই চেলা গুরুদেব'। 'তোমার এ কি হয়ে গেল'? বলছে, 'কিছু দিন আগে একটা কৌপিন চেয়েছিলাম, তাতেই এই জায়গায় এসে পড়েছি'।

আমরা মনে করছি, একটা জিনিস আর-একটা দিকে নিয়ে গেছে। ঠিকই, নিউটনের গতির সিদ্ধান্তগুলি তাই বলে, একটা থেকে আরেকটা, আরেকটা থেকে আরেকটা হয়। আরও গভীরে যদি যাওয়া যায়, তখন দেখা যাবে বাসনা হল রুট। কিছু একটা বাসনা ছিল, ভিতরে এমন একটা সংস্কার ছিল, যেটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। পোড়ো বাড়িতে কবে একটা পাখির বিষ্ঠা থেকে অশ্বত্থ গাছের বীজ পড়েছিল। সেই বীজ সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছে। যাঁরা সংসারে আছেন, তাঁদের এই সমস্যাগুলো কম হয়। কিন্তু যাঁরা সন্ন্যাসী, আমাদের আশেপাশে সন্ন্যাসীদের দিনরাত দেখছি, সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই জিনিসগুলো প্রচুর দেখতে পাই। সন্ন্যাসীর যখন কলঙ্ক আসে, তখন সেও কিভাবে খোঁজ করে ঠিক বার করে নেবে আর যে জিনিসগুলো কারুর মধ্যে কল্পনা করা যায় না, সেই জিনিসগুলোই হঠাৎ তাঁর মধ্যে দেখা যেতে শুরু হবে। নামযশ যখন হওয়ার থাকে কোন সন্ন্যাসীর, সেটাও কিভাবে এসে যায় কল্পনাই করা যায় না। এগুলো ধর্মজগতের, মনের জগতের সূক্ষ্ম নিয়ম, নিয়ম কিন্তু সবটাই। মূলে বাসনা, বাসনা মানেই অপূর্ণতা। দৃষ্টিতে কিছু একটা এসে পড়ল, দেখার পর মনে হল, ইস্ আমারও যদি এই রকম একটা হত; কিছু ভাল লেকচার শুনলেন, ইস্ আমিও যদি এই রকম বলতে পারতাম। ব্যস্, এই জায়গা থেকেই শুরু করাবে।

ঠাকুর বলছেন, "**সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে–আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জানো**"? দু-রকমের হয়, একটা হল ত্যাগ করে দেওয়া। আবার অনেক সময় দুর্বলতা আছে, ঠিক আছে এটাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য একটু ভোগ না হয় করে নেওয়া গেল। আমরা প্রায়ই মনে করি ভোগ হয়, কিন্তু ভোগ তো কক্ষণ হয় না, ভোগ সব সময় জ্বালায়, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। বাজারে আনাজ কেনার সময় কত দরদাম করে যেটা মনে হয় ন্যায্য দাম সেই দামে কিনি। যদি হঠাৎ কোন কারণে, বন্যা হয়েছে বা পরিবহন ধর্মঘট হয়েছে, ফলে আনাজপাতির দাম অনেক বেড়ে গেছে। তখন আমরা বলি, অত দাম দিয়ে আর আনাজ কিনে দরকার নেই, ডাল-ভাত খেয়ে চালিয়ে দেওয়া যাবে, আমরা আনাজ খাওয়া ছেড়ে দিই। কিন্তু ভোগ ছাড়বে না। ভোগকে যতটুকু দেওয়ার অতটুকু দিলে ও শান্ত থাকবে না, অনেক বেশি মূল্য চোকাতে হয়।

আমি অনেক মহারাজের কাছে শিক্ষা পেয়েছি। কিন্তু একজন মহারাজের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। আমার তখন কুড়ি-একুশ বছর বয়স, উনি খুব মজা করে বলতেন – 'বুঝলি, সন্ন্যাসীরা ভাবে সন্ন্যাসীরা ত্যাগ করছে। কিন্তু গৃহস্থদের দেখ ওদের কি অবস্থা'! তখনকার দিনে শিক্ষকদের মাইনে বেশি ছিল না; এখন তো মাস্টাররা পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছেন। আজকের পরিপ্রেক্ষিতেই যদি দেখি, ষাট হাজার টাকা মাইনে, কিন্তু কতটুকু আর নিজের জন্য সে খরচ করে? শোওয়ার জন্য একটা বিছানা দরকার, খাওয়া তো ডাল-ভাত আর একটা তরকারী, মাসে মেরে কেটে তিন থেকে চার হাজার টাকা খরচ। বাকি যত টাকা আয় করছে ওই টাকা কোথায় যাচ্ছে? স্ত্রী আর সন্তানের উপর। আর এদিকে স্ত্রী তাকে পাত্তা দেয় না, সারাদিন গালাগাল দেয়, ঝগড়া করে; বাচ্চাগুলি অবাধ্য। কিন্তু তাদের সব চাহিদা মেটাতে হবে, সে ছাড়তেও পারবে না। স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। তার বাবা-মা বলেছে, চলো মা তোমাকে একটা ভাল জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিই, তুমি শান্তিতে থাকবে। তারপর দেখা

গেল, কোথাকার এক পাগল-ছাগল, মাতাল, গাঁজাখোড় একটা অপদার্থ বরের পাল্লায় গিয়ে পড়েছে। মেয়েটি আর কিছুই করতে পারবে না। ওর যে একটু পড়াশোনা করা ছিল, সেটাও গেল; self-expression হবে, সেটাও গেল। আর ভোগ যে করবে, সেটাও আর কদিন করবে। একটা-দুটো সন্তান হয়ে যাওয়ার পর একটা শাড়ি কিনতে গেলে চারবার ভাববে। এই যে শাড়ি কিনবে, এই শাড়ির টাকা দিয়ে আমার সন্তানের দুটো ভাল জামা-প্যান্ট হয়ে যাবে। একটা কোথাও বেড়াতে যাব, সেই সময় শুধু সন্তানের কথা মাথায় ঘুরতে থাকবে। সংসারীদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলি হয়ে যায়। একবার যখন এই বাসনাগুলি মিটে গেল, তখন ধীরে ধীরে আবার ঈশ্বরের দিকে যায়। তখন ঠাকুর বলছেন, 'সট্‌কা কল জানো'? ঠাকুর নিজেই ব্যাখ্যা করছেন।

গ্রাম দেশে দেখা যায়, গ্রামের লোকেরা পুকুরের পাড়ে একটা বাঁশকে জলের দিকে নুইয়ে রাখে আর তাতে ছিপের মত বানিয়ে টোপ দিয়ে রাখে, বাঁশের আরেক প্রান্তে একটা ওজন, ইট জাতীয় কিছু দিয়ে রাখে। যেমনি মাছ বড়শিতে টান দিল, ইটটাও সরে গেল, মাছটাও সোজা বড়শিতে গেঁথে উপরের দিকে উঠে গেল। বড়শি দিয়ে যেটা করা হয় তাতে আটা বা ময়দার টোপ থাকে, সট্‌কা কলে ছোট মাছকে বড়শিতে গেঁথে দেয়।

ঠাকুর আবার নিক্তির কথা বলছেন। দাঁড়িপাল্লাতে নিক্তি থাকে, যেদিকে ওজন বেশি সেদিকে নিক্তির কাঁটা চলে যাবে। কাঁটা সোজা থাকা মানে পুরো জিনিসটা ব্যালেন্সে আছে। ঠাকুর বলছেন, "**নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না**"। এখন ইলেক্ট্রনিক মেশিনে ওজন দেখিয়ে দেয়। ঠাকুর বলছেন, "**নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ**"। একটু যেমনি কিছু মনের মধ্যে এলো, সঙ্গে সঙ্গে মন সেটার দিকে চলে যায়। তার মানে নিক্তির যে কাঁটা আছে ওটা নড়ে যায়। এই নড়ে যাওয়ার জন্য উপরে কাঁটার সাথে নিচের কাঁটাকে সমান ভাবে রাখা, ওটা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এর অর্থ হল, "**মন স্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে। ওই দীপটা যদি আদপে না নড়ে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়**"। গীতায় ভগবান বলছেন, *যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা*। বলতে চাইছেন, সংসার-হাওয়া, শুধু যে কামিনী-কাঞ্চনের হাওয়া তা না, রাজনীতিতে কি হচ্ছে, খেলাতে কি হচ্ছে, নিজের পাড়াতে কি হচ্ছে, বাড়িতে কি হচ্ছে; এগুলো সব সংসার-হাওয়া, সংসার-হাওয়া সব সময় চলছে, মনকে স্থির থাকতে দেয় না। রাজযোগে যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলছেন, *যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*, চিত্তবৃত্তি নিরোধ মানেই নিক্তির নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সাথে এক থাকা, দীপের শিখা সোজা অচঞ্চল ভাবে স্থির হয়ে জ্বলা।

এই দুটি কথা যেটা আমরা আগে বললাম, সেটাই ঠাকুর বলছেন, "**কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত**"। এগুলোকে নিয়ে এখনও অনেকে নিন্দা করে, পরে পরে লোকেরা আরও নিন্দা করবে ঠিকই। কারণ মানুষ স্বভাবেই খুব ছ্যাবলা, বুঝতে চায় না, শুনতে চায় না। এখন ইলেকশানের টাইম এসেছে, এমন এমন কথা শোনা যায়, আর এমন এমন লোকের মুখে শোনা যায়, অবাক লাগে। এরাই আবার ধর্ম নিয়ে কত কথা বলে, এরাই আবার ঠাকুরের মত লোককে নিয়ে আলোচনা করে। কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত, তার মানে আমরা আগে যেটা বললাম, নামযশ এমনিতে সমস্যা না, কাঞ্চনও সমস্যার না, আসল সমস্যা কামিনী। যদি কামিনীতে মন না থাকে, তবে সহজে মনে ব্যাঘাত হয় না। এখানে মনটা হল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তখন ঠাকুর বলছেন – "**বস্তু বিচার করবে**"।

এই কথা বলার পর ঠাকুর খুব প্রচলিত কথাগুলো বলছেন, ভাগবত আদিতেও এই কথাগুলো আসে। যখন কোন নারী-শরীরের প্রতি আকর্ষণ হয়, তখন শুধু একবার ভাবতে হয়, নারীর শরীরের ভিতর কি আছে, তখন মনের মধ্যে একটা যেন বিকর্ষণ আসে। অন্য জায়গায় ঠাকুর আবার বলবেন,

কোন মেয়েকে দেখলে মেয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দ্বিগুণ করে ভাবতে হয়। আবার আরেক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, প্রত্যেক নারীই ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ, অর্থাৎ মায়ের স্বরূপ, এইভাবে বিচার করতে হয়। বিচার করার কোন একটা পথ নেই। এটা না যে, একটা ভাবেই বিচার করতে হবে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মত করে বিচার করবে। আবার অন্য জায়গায় বলছেন, নারীর মুখ দেখলেই মনে করতে হয় সাপ, সাপকে বলতে হয়, মা তোমার মুখ দেখিও না, ল্যাজ দেখাও।

ফ্রাঙ্ক আনাতোলে খুব নামকরা ফরাসী লেখক, 'থাইস্' নামে তাঁর একটা নামকরা বই আছে। একজন লোক একটি মেয়েকে খুব ভালবাসে। সেই মেয়েটি আবার নর্তকী, তার নাম থাইস্। লোকটি সাধারণ একজন মানুষ। সে খ্রীশ্চান সাধু হয়ে গিয়ে অনেক দিন সাধনা করেছে। সাধনা করার পর লোকটির প্রচুর নাম হয়ে গেছে। এবার সে সেই নর্তকীর কাছে এসেছে। এসে নর্তকীকে অনেক উপদেশ দিয়েছে, তার সাথে নর্তকী মেয়েটির মধ্যে একটা পাপবোধ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য বলতে লাগল – তুমি এক পাপিনী, তোমার নরকেও স্থান হবে না। মেয়েটিকে এইসব বলে বলে ওকে বাধ্য করে ওর যাবতীয় বিলাস সামগ্রী, যত যা কিছু ছিল সব বিক্রি করিয়ে দিল। শেষে মেয়েটাকে শিষ্যা করে দিয়ে লোকটি চলে গেল। এত বড় নামকরা নর্তকী সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসীর মত থাকতে শুরু করল, এই নিয়ে শহরে বিরাট ঝামেলা, বিতর্ক লেগে গেল। পরে দেখা গেল, এই যে মেয়েটি খ্রীশ্চান নান্ হয়ে গেছে, মেয়েটি এখন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে গেছে, পুরো মনটাই ঈশ্বরে সমর্পিত। এই ভাবে আস্তে আস্তে মেয়েটি মরে গেল।

অন্য দিকে এই লোকটি তপস্যা করে যোগশক্তি হয়ে গেছে, অনেক কিছু করছে, অনেক চমৎকারী দেখাচ্ছে, তাকে নিয়ে অনেক কিছু হচ্ছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মেয়েটির প্রতি যে তার আসক্তি, ওটাকে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অন্য দিকে তার বিরাট নাম, ওই সময়ে সেই দেশের সে একজন বিরাট সাধুবাবা। লোকটির কাছে খবর এসেছে যে, থাইস্ এখন মৃত্যুশয্যায়। সে সব ফেলে রেখে দৌড়ে দৌড়ে এসে গেছে। কনভেন্টে পুরুষদের যেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু ওর নাম শুনে ছেড়ে দিয়েছে। গিয়ে দেখে থাইস্ মারা গেছে। এত দিনের ভিতরের যে সুপ্ত বাসনা, ওই মৃত শরীরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, 'থাইস্ তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেল, থাইস্ তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারো না'। থাইসের মৃত শরীরকে জড়িয়ে ধরে ওই ভাবে কান্নাকাটি করতে দেখে সব নান্ ছুটে এসে বলছে, 'ও একটা ডেভিল, ডেভিলটাকে থাইসের কাছ থেকে সরিয়ে দাও'। শেষ দৃশ্য এটাই, লোকটাকে টেনে সরিয়ে আনছে।

কামিনীতে আসক্তি থাকলে এটাই হয়। কোন পুরুষের মনে যদি কোন মেয়ের প্রতি আসক্তি এসে থাকে, ওই মেয়েকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা তার পক্ষে খুব মুশকিল হবে। তখন বলছেন, মেয়েকে তুমি ছেড়ে দিতে পারবে, কিন্তু মেয়ের প্রতি আসক্তিটা ছাড়তে পারবে না। সেইজন্য বিচার কর, শুধু বিচার কর। শুভ বিচার করে, সে মায়ের রূপ; ছাড় তাকে। না পারো, নেগেটিভ বিচার কর, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে দ্বিগুণ করে দেখ। তার শরীরের ভিতর যে রক্ত, মাংস, চর্বি, নাড়ীভুঁড়ি, কৃমি, মুত, বিষ্ঠা আছে এগুলোকে চিন্তা কর। যে করেই হোক, তার শরীরের প্রতি যে আসক্তি, এটাকে ত্যাগ কর। এরপর ঠাকুর আবার অন্য ভাবে বলছেন।

"**আমি রাজসিক ভাবের আরোপ করতাম–ত্যাগ করবার জন্য**"। শুধু যে বিচার করে ত্যাগ হয় তা না, রাজসিক ভাবেও ত্যাগ হয়। কি রকম? "**সাধ হয়েছিল সাচ্চা জরির পোশাক পরব, আংটি আঙুলে দেব, নল দিয়ে গুড়গুড়িতে তামাক খাব**"। এর আগে আমরা যে diluted materialismএর আলোচনা করছিলাম, এটা হল সেটা। কামিনীর প্রতি যে আসক্তি, এটা মারাত্মক বিপজ্জনক, কিন্তু অন্যান্য আসক্তিগুলি যেটা আসে, এটাই materialism। যদি এটাকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ভোগ করা হয়, এগুলোকে ত্যাগ করে দেওয়া যায়। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, ভবনাথ পান মাছ ত্যাগ করেছে।

এখন পান মাছ আপনি যদি খান, ওগুলো diluted materialismএর মধ্যেই পড়ে। ঠাকুর বলছেন, আমি রজোগুণ আরোপ করলাম।

এই ভোগগুলো, যেখানে দামী কাপড় পরছেন, নল দিয়ে গুড়গুড়িতে তামাক খাবেন, এগুলো রজোগুণী লোকেরা, যাদের টাকা-পয়সা আছে, তারা করে। ঠিক আছে, শখ হল, একবার না হয় হয়ে গেল, মাথা থেকে নেমে গেল, যাঃ এবার বিদেয় হও। বীজরূপে ছিল, ভোগ এলো, ভোগ করলাম, উপড়ে ফেলে দিলাম। আর কোন দিন ঠাকুর এগুলোকে ছুঁয়েও দেখলেন না। দুটোর মধ্যে কোন একটা পথকে ধরতে হয়। যেমনি সচেতন হয়ে গেলেন, সচেতনতার থেকেও বড়, কেউ যদি আপনাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তোমার এই দুর্বলতা আছে; তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিতে হয়।

যোগপথে যাঁরা আসেন, ঈশ্বর পথে যাঁরা আসেন, প্রথমে তাঁদের open to criticism হতে হয়। যদি আপনাকে open to criticismএর মুখোমুখি না হতে হয়, আপনার দ্বারা ধর্মসাধন হবে না। কবীর দাসের খুব সুন্দর একটা দোঁহা আছে, যেখানে বলছেন, আপনার যারা নিন্দা করে, তাদের জন্য আপনার উঠানে একটা বাড়ি বানিয়ে রাখুন। কারণ সেই আপনাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক জীবনে, আপনার সাধু জীবনে যাঁরা আপনার প্রশংসা করছেন, তাঁদের মত শত্রু আপনার আর কেউ নেই; আপনার যে নিন্দা করে সেই আপনার সাচ্চা বন্ধু। কারণ সে দেখিয়ে দেবে এই এই জায়গায় আপনার দুর্বলতা আছে। যেমনি নিজের দুর্বলতাকে জেনে গেলেন, প্রথম হয় বিচার করে ত্যাগ করুন, না হলে একটু ভোগের মধ্যে গিয়ে বেরিয়ে আসুন। মহাবীর হনুমান যখন লঙ্কার উদ্দেশ্যে ঝাঁপ মেরেছেন, সুরসা এসে বলছে তাঁর মুখের মধ্যে ঢুকতে হবে। হনুমান তখন মাছি হয়ে সুরসার মুখে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে এলেন। ঠিক তেমনি, ভোগের মধ্যে একটু ঢুকে গিয়ে বেরিয়ে আসা। একেবারেই যদি ভোগকে উপেক্ষা করেন, আপনার ব্রেন ফেল হয়ে যেতে পারে আর ওর মধ্যে যদি পুরো নেমে যান, আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে। ঠাকুর সব বলে বলছেন, "**সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই**"। ত্যাগ জীবনে এভাবেই করতে হয়।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মাস্টারের জায়গায় এবার মণি নাম দিচ্ছেন। "**শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) – যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফ্যালে, দেখলেই বোঝা যায়**"। যাঁরা সাধনা করেন, স্বামীজী অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছেন, অনেক সময় তিনি দিনে কুড়ি ঘন্টা করে ধ্যান করতেন। আবার বলছেন, অনেক দিন এমন হয়েছে, মাত্র এক ঘন্টা করে ঘুমিয়েছি। এ-রকম সাধনা করলে কি হয়, চোখটা সব সময় ফ্যালফ্যালে হয়ে যায়। যার জন্য ঠাকুরের কাছে নরেন্দ্র যেদিন প্রথম ঢুকলেন, দেখেই ঠাকুর অবাক, আরে এর চোখটাই অন্য রকম। ঠাকুর বর্ণনা করছে, কেমন বোঝা যায়? "**যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে**"। পাখি যখন ডিমে উপর বসে থাকে, তার দৃষ্টিটাই অন্য রকম হয়ে যায়। কারণ মনটা তার ডিমের উপর রয়েছে, এখন চোখে যে জিনিসগুলো আসে সেগুলো আর ভিতরে ঢোকে না।

"**সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?**

মণি – যে আজ্ঞা! আমি চেষ্টা করব যদি কোথাও পাই"।

ঠিক ওই ছবি পাননি, কিন্তু পরে স্কেচ করে দেখানো হয়েছে, যেটা কথামৃতের প্রতি খণ্ডে দেওয়া হয়েছে, যোগীর চক্ষু কেমন। এই হল দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, মাস্টারমশাই দক্ষিণেশ্বরেই আছেন। এবার মাস্টারমশাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিয়ে যাচ্ছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
গুরুশিষ্য-সংবাদ– গুহ্যকথা

মাস্টারমশাই তৃতীয় পরিচ্ছেদ এই বলে শুরু করছেন – সন্ধ্যা হয়েছে। কালীমন্দিরে ও রাধাকান্তের মন্দিরে ও অন্যান্য ঘরে আলো জ্বালানো হয়েছে। একই দিন চলছে। মাস্টারমশাই প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু করেছিলেন **১৩ই** অগস্ট ১৮৮২ তারিখে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে তারিখ পালটে হয়ে যায় শ্রাবণ শুক্লা দশমী তিথি, ২৪শে অগস্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। গুরুশিষ্য-সংবাদ, অর্থাৎ মাস্টারমশাই ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন। আরতির পর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসে **"মণির সহিত একাকী নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন"**।

কথামৃতে মাস্টারমশাই অনেকগুলো নামের ব্যবহার করেছেন। কারণ তিনি চাইতেন না যে কেউ তাঁকে জানুক, এখানে মণি নাম বলছেন। ঠাকুর কোন একটা বিষয় নিয়ে বলছেন না, নানা বিষয়ের উপর কথা বলছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) – নিষ্কামকর্ম করবে। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে-কর্ম করে সে ভাল কাজ– নিষ্কামকর্ম করবার চেষ্টা করে"।

বিদ্যাসাগরের নামে আগে এক রকম কথা বলেছিলেন, এখন আরেক রকম বলছেন। নিষ্কামকর্মের ধারণা আমাদের হিন্দু ধর্মের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ধর্মে নিষ্কামকর্ম এত ভাবে ঠিক পরিষ্কার রূপে পাওয়া যাবে না। তাঁদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিরূপে কাজ করা হয়। তাঁরা আল্লার জন্য কাজ করছে, ঈশ্বরের জন্য করছে, যীশুর জন্য করছে। আমাদের এখানে বলা হয় নিষ্কামকর্ম; নিষ্কামকর্ম করাটা আরও যেন গভীরে নিয়ে যায়, একটু যেন অন্য ধরণের। ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করে যখন কাজ করা হয়, সেটা আরেকটু অন্য ধরণের। যাঁদের মন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে, যদিও মন সহজে নিজের নিয়ন্ত্রণে আসে না, তাঁরাই একমাত্র নিষ্কামকর্ম করতে পারেন। যাঁদের মন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি, তাঁদেরকে প্রথমে কর্মের ফল ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করতে হয়; ঠাকুর এই যা কর্ম করলাম, এই কর্মের ফল ভাল মন্দ যা হল, তোমার প্রতি অর্পণ করে দিলাম। কর্মফল সমর্পণের পর আসে কর্মটা ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করে দেওয়া আর শেষে ওই কর্মই নিষ্কাম হয়ে যায়।

অনেকে বলেন যে, যাঁরা জ্ঞানমার্গের পথিক তাঁরা নিষ্কামকর্ম করেন। নিষ্কামকর্মের অর্থ হল, যে ব্যক্তি প্রচণ্ড কামী পুরুষ, পুরোদমে সাংসারিক, যে জগৎকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে, নিষ্কামকর্মে সেই ব্যক্তির থেকে বেশি আপনি শ্রেষ্ঠ ভাবে কাজ করবেন। কাজের যে দক্ষতা, সেখানেও তাদের থেকে আপনার দক্ষতা ভাল হবে। আমরা খুব সহজ একটা উদাহরণ দিতে পারি, সিনেমাতে আমরা দেখি সেখানে একজন ক্রিমিনাল রয়েছে, খুব নামকরা একজন ক্রিমিনাল। আর সেখানে কোথা থেকে হঠাৎ একজন আর্মি বা একজন কমাণ্ডো এসেছে। ওই এক কমাণ্ডো সবাইকে মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। সুপারহিরো সিনেমাতে এগুলো দেখা যায়। এমনি অনেক সময় মনে হয় এগুলো ফ্যান্টাস্টিক একটা ক্রিয়েশান। কিন্তু আরও যদি গভীরে যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, এই গুণ্ডাগুলো যাদের দেখে সমাজ ভয় পায়, যারা সবাইকে সন্ত্রস্ত করে রাখছে, মানুষের থেকে টাকা আদায় করছে, নানা ভাবে মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। যে ক্ষমতা নিয়ে তার এই কাজগুলো করছে, হাতের লড়াই হোক, ছুরির লড়াই হোক, খুড়ের লড়াই হোক, রিভলবার বা পিস্তল দিয়ে লড়াই করুক, এমনকি এই টেররিস্টরা বোমা দিয়ে লড়াই করুক। কিন্তু যারা কমাণ্ডো হয়ে আসে, তারা সবটাই পারে আর সবটাই এদের থেকে বেশি ভাল পারে।

আমাদের যে ব্ল্যাকক্যাট কমাণ্ডো, যারা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করে; এরা খালি হাতে সেকেণ্ডের মধ্যে মানুষকে মেরে শেষ করে দিতে পারে, এমন ক্ষমতা। কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর

সাথে যখন যায়, তখন তাদের দেখে আমার আপনার মতই মনে হয়। যদি আপনি তাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানেন, আপনার বাড়ির লোকও যদি হয়, তাহলে ওকে দেখে আপনার ভয় করবে না। কিন্তু একটা ক্রিমিনালকে তার পাশের বাড়ির লোকও ভয় পাবে, তার ভাই হলেও ভয় পাবে। তার স্ত্রী সন্তানরা হয়ত ভয় পায় না, হয়ত বা ভয় পায়। তার মানে, যাদের জীবনে একটা অনুশাসন এসে গেছে, জীবনটা ডিসিপ্লিনড্; বদ লোক, বদমাইশ লোক, কামী পুরুষরা যা করে, এনারাও সেটা করতে পারেন, তাদের থেকে আরও শ্রেষ্ঠ ভাবে পারেন। কিন্তু এনাদের উদ্দেশ্য কারুর কাছ থেকে টাকা আদায় করা, এই যেমন মিলিটারিতে যারা হাই লেভেলের কমাণ্ডো আছে, তারা কখনই নিজের ট্রেনিং দেখিয়ে টাকা আদায় করবে না, কখনই তা করে না।

যাঁরা ঠিক ঠিক যোগী হন, এনারাও একেবারে ঠিক এই রকম হন। যে কোন কাজ তাঁকে করতে বলুন, একেবারে শ্রেষ্ঠতম ভাবে সেই কাজ করে দেবেন। কাজের মধ্যে কোন খুঁত থাকবে না। যদি কাজ না জানেন, তিনি নূতন করে সেটা শিখে নেবেন, শেখার জন্য প্রাণমন সেখানে ঢেলে দিয়ে জিনিসটাকে আয়ত্ত করে নেবেন। বিদ্যাটা আয়ত্ত করে নেওয়ার পর তিনি মুখে কখন বলবেন না, I am the best, কিন্তু নিজে জানেন I am the best। তিনি জানেন, আমি যদি তোমার ফিল্ডে নামি, তুমি আর দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু বলতে যাবেন না, কিন্তু জানেন। তার সাথে, ওই-রকম দক্ষতা অথচ কোন ফলাকাঙ্খা নেই।

আরেকটা বড় ব্যাপার লক্ষণীয় হল, কমাণ্ডোরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চায়, কিন্তু মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। অন্য দিকে যারা টেররিস্ট, যারা ক্রিমিনাল তারা মৃত্যুকে সব সময় ভয় পায়। কমাণ্ডো জানে আমি লড়তে এসেছি, লড়াই করাটাই আমার কাজ, তাতে মরলে মরব। ওরা যে মরতে চাইছে তা না। সুইসাইড বোম্বারস, ওরা মরতে চাইছে, ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। এমন ভাবে ওর মগজটা ধোলাই করে দিয়েছে যে, সে একটা বিকৃত মস্তিষ্কের লোক হয়ে গেছে। এখন সে নিজেকে মেরে আরেকজনকে উড়িয়ে দেবে। এগুলো সব মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের পরিচয়। কোন রকমে যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসা হয়, তখন বলতে থাকবে, আমাকে ছেড়ে দাও।

আর্মির ট্রেনিংটাই পুরো অন্য। ঠিক তেমনি কর্মযোগীদেরও ট্রেনিংটা পুরো অন্য। প্রথম ট্রেনিং হল, যে কোন জিনিস যদি সে হাতে নেয়, ওই জিনিসে সে the best। আমার 'Param' বইতে একটা মুচির কাহিনী আছে, তার নাম সুযশ, সে জুতো বানায়। পরম শহরের ছেলে, সে দেখছে লোকটা অত সুন্দর জুতো বানাচ্ছে। কথায় কথায় পরম বলছে, 'জুতো বানানোটাও একটা ভাল কাজ'। সুযশ তাকে বলছে, 'তুমি যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করছ, তোমার কি মনে হয়, তুমি কি আমার মত জুতো বানাতে পারবে'? পরম বলছে, 'হ্যাঁ, ট্রেনিং পেলে আর প্র্যাক্টিস করলে নিশ্চয় বানাতে পারব'। সুযশ তাকে বলছে, 'হ্যাঁ, আমার কাছে আগে অনেক এ্যাপ্রেন্টিস এসেছিল, তারাও তাই মনে করত। কিন্তু কেউই পারেনি। তোমার মনে শুধু এই ভাব যে পারব, কিন্তু পারবে না'। কারণ এই লোকটি অনাসক্ত হয়ে গেছে। আমার কাজ জুতো তৈরী করা, এর বাইরে আমি জানি না, করি না; তার থেকেও বেশি I don't care।

নিষ্কামকর্ম মানে, যেখানে ক্রিয়া আর ফল এক হয়ে যায়। সাধারণ ভাবে যখনই আমরা কোন কাজ করি, তখন প্রথমে কারকের বিভক্তিগুলি, প্রথমা, দ্বিতীয়া, এগুলো সব আলাদা হয়ে যায়। কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম সব আলাদা হয়ে যায় আর তার সাথে ফলটাও আলাদা হয়ে যায়। তার মানে, জগতে যখনই কোন কাজ হয়, কর্তা, ক্রিয়া, ফল পুরো আলাদা। আমি কর্তা, আমি এই কাজ করছি, এই কাজের ফলটা আমি পাব। যেমন আমি খাচ্ছি, খাওয়ার ফল পেট ভরবে, আমার ভাল হবে। ধর্ম পথে, যাঁরা ঠিক ঠিক ধর্মে আসেন, সেখানে ক্রিয়া আর ফল এক হয়ে যায়। আরও উচ্চ অবস্থায় কর্তা, ক্রিয়া,

ফল এক হয়ে যায়; ঠাকুর যেখানে বলছেন, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়ে যায়; ধ্যাতা, ধেয়, ধ্যান এক হয়ে যায়। কর্মযোগে এটাকেই অনুশীলন করা হয়।

অনুশীলন করতে করতে তাঁর এটা স্বভাবে এসে যায়, স্বভাবটা কি, ক্রিয়া আর ফল এক হয়ে যায়। কর্তা তখনও আলাদা থাকে। একমাত্র সমাধিবান পুরুষেরই কর্তা, ক্রিয়া আর ফল এক হয়ে যায়। ইনি কিন্তু সমাধিবান পুরুষ নন, তিনি সাধনা করছেন। যিনি সাধনা করছেন, তাঁর কাছে ক্রিয়া আর ফল সব সময় এক হতে হয়। মা নিজের ছোট সন্তানকে ভালবাসছে। কেন ভালবাসছে? ভালবাসে বলে ভালবাসছে, সেখানে কোন আশা নেই, কোন ফলাকাঙ্খা নেই। মা অত হিসাব করে ভালবাসে না – এই যে আমার এক মাসের শিশুকে এখন দুধ খাওয়াচ্ছি, এক বছর, দু বছর খাওয়াব; এরপর বড় হবে, তারপরে সারা জীবন আমি একে চুষে চুষে খাব; এত হিসাব করে মা সন্তানকে ভালবাসে না। ক্রিয়া আর ফল ছোট শিশুর প্রতি মায়ের যেমন সমান, ঠিক তেমনি কর্মযোগীর কাছে সমস্ত ক্রিয়া আর ফল সমান। ক্রিয়া আর ফল সমান হওয়া, এটাকেই বলে নিষ্কাম কর্ম, এটাকেই বলে অনাসক্ত কর্ম।

এখানে যখন ঠাকুর নিষ্কামকর্মের কথা বলছেন, যেটা ভগবান গীতায় *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন* বলছেন, সেটাই ঠাকুর বলছেন। মা যেমন শ্রেষ্ঠতম ভাবে নিজের সন্তানের দেখাশোনা করে; শিশু একটু কাঁদল, মা বুঝে যায় আমার সন্তানের কি সমস্যা। মা সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সেখানে কোন ফলাকাঙ্খা নেই। নিষ্কাম কর্ম মানে স্বার্থবিহীন কাজ। এখানে আমার কোন স্বার্থ নেই, আমি করছি, ব্যস্ এইটুকু। আমাদের সব সমস্যা আমাদের চিন্তা-ভাবনাতে। কি চিন্তা-ভাবনা? আমার যদি কোন স্বার্থ না থাকে আমি কেন কাজ করতে যাব? একটু তাকিয়ে দেখ স্বার্থ ছাড়া দিনরাত কত কাজই তো করছ। এক্ষুণি হয়ত করছ না, আগামীকাল যখন বাবা হবে, কিংবা মেয়েরা মা হবে, নিজের সন্তানের জন্য তো তোমাকে নিঃস্বার্থ কর্ম করতেই হবে। আরও বয়স হলে যখন ঠাকুমা, দিদিমা হবে, তখন আরও বেশি নিঃস্বার্থ কর্ম করবে। সন্তান মাকে সম্মান এজন্যই দেয়, কারণ সে জানে মা আমাকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসে। যে মা যত নিঃস্বার্থ তার সম্মান তত বেশি। কাজ করার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, যে কাজ যত বেশি নিঃস্বার্থ ভাবে করা হবে, নিঃস্বার্থ মানেই নিষ্কাম, নিষ্কাম মানে স্বার্থবিহীন কাজ, তার তত বেশি সম্মান হবে।

সকাম কর্মে দ্বিতীয় যে সমস্যা হয়, সেটা খুব মারাত্মক সমস্যা। কাজ করলে তার একটা ফল হবেই হবে, আমি চাই আর নাই চাই। আমি চাই আর নাই চাই, খেলে পেট ভরবে। আমি চাই আর নাই চাই, বিষ খেলে মরতে হবে। কিন্তু যখন আমরা কোন ক্রিয়া করি, তখন আমরা আগে থেকেই ভেবে নিচ্ছি যে, এই রকম ফল আমি পাব। ইদানিং নূতন প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা কোন কাজ পেলে প্রথমেই ভাবতে শুরু করে দেয়, এই কাজে আমি কত টাকা পাব, আমার কত নাম হবে? টাকার কথা, নাম হওয়ার কথা ভেবে মনে একটা সুখ আসে। আমি এত টাকা পাব, এই টাকা দিয়ে এই এই হবে। এর ফলে কি হয়? কর্ম করার পরে এই যে কর্মের বাহ্যিক ফল আসতে শুরু করে, তখন সেই ফলটা সব সময় মনের জগতে আমি যে ফলের আকাঙ্খা করছি, তার থেকে কম হয়। কারণ মনে আমরা যেটাই করি, সেটার জোর অনেক বেশি হয়। মনে মনে যে ভাবনাগুলি চলে, তাতে সুখের তোড়টাও বেশি, কষ্টের তোড়টাও বেশি। এটাকে নিয়ে আমরা আগে আগে অনেক আলোচনা করেছি। কর্মফলের ক্ষেত্রেও তাই হয়; আমি এই পাব, লোকেরা আমাকে মানবে।

কর্মের এমন একটা বিধান যে, যখন আমরা কর্মের একটা ফলের চিন্তা করে নিচ্ছি, তাতে কি হয়, যে ফল আসার কথা তার অনেকটাই ওই চিন্তা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। কর্মের এই বিধান, লোকেদের পক্ষে মানা মুশকিল হবে, তার থেকেও বেশি হল, কর্মফলের প্রত্যাশার চিন্তা করে যে কর্মফল বেরিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসটা বোঝা বা ধারণা করা, কিন্তু এটাই বাস্তব। যে ফলটা বাহ্য জগতে

এসে আমাদের দিত, আমরা যে মনে মনে ওই ফলের কথা ভাবছি, তাতে ফলটা আমি আগেই পেয়ে যাচ্ছি। ফলে কর্মের আসল ফলটা অনেকটাই কমে যায়।

আমাদের সময়ে কখন আমরা কল্পনাই করতে পারতাম না, কিন্তু এখন দেখুন, চাকরি করতে যাচ্ছে, সেখানে জিজ্ঞেস করা হয়, how much salary you expect। আমি কি করে বলব যে, আমি কত মাইনে আশা করব? এই কোম্পানীগুলো নিয়মিত ভাবে collapse করছে না ভেবে অবাক লাগে; একেবারেই যে করছে না তাও না, কিছু কিছু তো করছে। ছেলেটি কাজ করল না, কিছুই করল না, তার আগেই আপনি বলছেন, চাকরি করে তুমি কত পাবে আশা করছ? সমাজ যে কোথায় যাচ্ছে, ঠাকুর জানেন।

আমরা একটা আইডিয়া দিলাম নিষ্কামকর্ম কি। ঠাকুর বলছেন, নিষ্কামকর্ম করবে। তখন মণি বলছেন – **"আজ্ঞা হাঁ। আচ্ছা, যেখানে কর্ম সেখানে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়? রাম আর কাম কি এক সঙ্গে হয়? হিন্দীতে একটা কথা সেদিন পড়লাম"**।

হিন্দীর কাম আর বাংলার কর্ম এক। কিন্তু এখানে হিন্দীতে যে কাম বলছেন, এই কাম কামনা-বাসনার অর্থে বলছেন। মাস্টারমশাই প্রশ্ন করার সময় কোথাও এটাকে মিশিয়ে ফেলছেন। মানুষ যখন কর্ম করে, তখন কর্মের পিছনে তার একটা বাসনা জড়িয়ে থাকে। বেদান্তে নামকরা কথা আছে – অবিদ্যা, কাম, কর্ম। আমরা শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ চৈতন্য। কোন কারণে আমরা অজ্ঞানবশত নিজেকে অপূর্ণ মনে করি, অপূর্ণ মানেই এবার আমাকে পূর্ণ হতে হবে। আমি পূর্ণপ্রেমস্বরূপ সচ্চিদানন্দ, কিন্ত মনে করছি আমার ভালবাসা নেই। জগতে আমাকে ভালবাসা খুঁজতে হবে, তখন কখনো এর কাছে দৌড়ে যাচ্ছি, কখনো ওর কাছে ছুটে যাচ্ছি। আরে তুমি আত্মা, সচ্চিদানন্দ, তুমি আনন্দস্বরূপ, তুমি প্রেমস্বরূপ; আর তুমি প্রেম খুঁজে বেড়াচ্ছ? আজকে এর কাছে কাল আরেকজনের কাছে, আজকে এখানে মার খাচ্ছি, কাল ওখানে মার খাচ্ছি। নূতন একজনের কাছে গিয়ে ভাবছি এখানে প্রেম পাব। আরে ভাই তুমি জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরুপ আর ঘোর অজ্ঞানীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছ?

কারণ মানুষ যখন নিজেকে অপূর্ণ মনে করে, তখন তার মধ্যে কামনা জাগে যে আমি পূর্ণ হব, তখন ওইটাকে পূর্ণ করার জন্য তাকে কর্ম করতে হয়। যখন কর্ম করতে নামে, তখন তার অজ্ঞান বাড়ে। যত অজ্ঞান বাড়ে তত কাম বাড়ে, যত কাম বাড়ে তত বেশি বেশি কর্ম করতে হয়, বেশি বেশি কর্ম করতে গিয়ে অজ্ঞানও বেশি বেশি বাড়ে, এটাই চলতে থাকে। বলছেন, যেখানে কাম সেখানে রাম নেই। হিন্দীতে কাম এখানে কামনার অর্থে বলা হয়। ঠাকুর কিন্তু এখানে কর্মকে নিয়েই বলছেন। ঠাকুর বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ– কর্ম সকলেই করে– তাঁর নামগুণ করা এও কর্ম– সোহহংবাদীদের 'আমিই সেই' এই চিন্তাও কর্ম–নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার জো নাই। তাই কর্ম করবে, কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।

এটা খুব মূল্যবান কথা। আমরা অনেক সময় লোকেদের বোঝাই যে, ধ্যান যখন করছেন, তখন এটাও কর্ম, জপ করছেন, এটাও কর্ম। যেখানেই মনের একটু সামান্য ক্রিয়া চলে, সেটাই কর্ম। যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা মনে করছেন, আমি নেতি নেতি বিচার করছি; এই বিচার মন করে। মন বিচার করছে মানে মন সক্রিয়, মন সক্রিয় মানে কর্ম। তার মানে সবাইকে কর্ম করতেই হবে। জ্ঞানী হন, যোগী হন, ভক্ত হন, কর্ম সবাইকে করতে হয়। তাহলে যাঁরা অবতার পুরুষ? না, তাঁরা রামকে পেয়ে গেছেন, রামকে যখন পেয়ে গেছেন, তিনি তখন বুঝে নেন, যা কিছু আছে সবটাই রাম। ওনারা যেটা করেন, ওটা কর্ম না; কারণ অবিদ্যা, কাম, কর্ম যখন বলা হল তখন কর্মকে পরিভাষিত করার জন্য বলা হল যে,

প্রত্যেকে কর্মের পিছনে একটা বাসনা থাকে; এই বাসনাটা হল আমি অপূর্ণ আমাকে পূর্ণ হতে হব। কিন্তু যিনি জেনে গেছেন আমি পূর্ণ, তাঁর আর কিসের বাসনা হবে!

আগেকার দিনে মেলা-ফেলাতে লোকেরা কাঁধে করে জিনিসপত্র নিয়ে আসত মেলাতে বেঁচার জন্য। জিনিসপত্র বিক্রি হয়ে গেল, মুনাফা হয়ে গেল, ভাল টাকা-পয়সা পেয়ে গেল, এবার সে আনন্দে মেলাটা ঘুরে ঘুরে দেখবে। ওর তো আর কোন উদ্দেশ্য নেই, ওর কাজ হয়ে গেছে, এখন নিজের খুশিতে ঘুরছে। যিনি জ্ঞানী, তিনি তাঁর স্বরূপ জেনে গেছেন, তাঁর তো আর অপূর্ণ ভাব কখন আসবে না। অপূর্ণ ভাব যদি না আসে, তার মানে কোন বাসনাও তাঁর মনে আসছে না; এখন উনি যেটাই করুন ওটাকে আর কর্ম বলা চলবে না।

কর্ম একটা টেকনিক্যাল শব্দ, টেকনিক্যাল শব্দ মানে, ওই শব্দকে ভাল করে বুঝতে হয়। আমরা যখনই বলি কাজ করছে, তখন যে কর্ম করা হয় ওই কর্ম সব সময় একটা কোন কামনা দ্বারা প্রেরিত। কামনা দ্বারা প্রেরিত যদি না হয়, তাহলে ওটা আর কর্ম না। তাহলে ওটার শব্দ কি হবে? তা আপনি যেটা খুশি বলতে পারেন; লোক দেখানো বলতে পারেন, আপনি লীলা বলতে পারেন, লোকশিক্ষা বলতে পারেন, আপনি উপদেশ বলতে পারেন, শব্দ আপনি যাই নিয়ে নিন, আমাদের যে ট্রাডিশানাল কথাবার্তা, তাতে কর্মকে পরিভাষিত করা হয়, পিছনে যখন বাসনা থাকে। বাসনা যদি না থাকে, তাহলে ওটা কাজ নয়। তাহলে মা যখন শিশুকে দুগ্ধপান করান সেটাকে কি বলা হবে? সেখানে কোন বাসনা নেই, পুরো নিষ্কাম। সেইজন্য বলছেন, নিষ্কামকর্ম করতে হয়। বাসনা নেই, তাহলে কি ওটা কাজ না? নিশ্চয়, ওটাও কাজ, কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞান থেকে সামান্য একটু নীচে, কারণ নিষ্কামকর্ম বলে কোন বাসনা নেই। বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে ওই বোধটুকু আছে, এর বাইরে সবটাই বাসনামুক্ত। নিষ্কামকর্ম আর ঠাকুরের মত পুরুষরা যখন লোকশিক্ষার মত কাজ করেন, এই দুটোর মধ্যে যেন এক চুলের মত তফাৎ। তফাৎ থাকলে সমস্যা কি হয়, ওখান থেকে যখন নামবে, তখন আস্তে আস্তে অনেক বেশি নেমে যাবে; কিন্তু ওই কাজটুক, ওই অতটুকু ঈশ্বরের সঙ্গে প্রায় এক।

যখন কেউ জ্ঞানের মধ্যে ডুবে আছেন, আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা যেভাবে ডুবে থাকতেন; তাঁদের হয়ত ঈশ্বরদর্শন হয়নি, কিন্তু ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপী আয়নায় যে প্রতিবিম্ব হয়, এটাই ভগবানের প্রতিবিম্ব। নবদ্বীপে ছিলেন বুনো রামনাথ। তেঁতুল গাছের তলায় একটা জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে থাকতেন, কিন্তু তখনকার দিনে তিনি ব্যকরণের একজন মহাপণ্ডিত। তাঁর স্ত্রীর হাতে শাঁখাটুকুও নেই, সধবা রমণীর চিহ্ন স্বরূপ তাই হাতে লালসুতো বাঁধেন। একদিন ব্রাহ্মণী গঙ্গায় স্নান করছেন, জলে ছপাৎ ছপাৎ করে স্নান করছে। পাশেই নবদ্বীপের রানী স্নান করতে নেমেছেন, তিনি দেখে বলছেন, 'শাঁখা পরার পয়সা নেই তাতেই এত অহঙ্কার'! ব্রাহ্মণী তাঁর হাতের লালসুতো দেখিয়ে দেখিয়ে রানীকে বলছেন, 'আমার হাতে লালসুতো আছে বলেই নবদ্বীপের সম্মান, নাহলে নবদ্বীপকে কে জানত'।

রানী কিছু বুঝতে পারেনি। রাজাকে গিয়ে বলেছে। রাজা এবার খোঁজ খবর লাগিয়ে জানতে পারলেন, তেঁতুল তলায় এক ব্রাহ্মণ পড়ে আছে। রাজা ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের কাছে গেছেন। কথা বলে বুঝতে পারলেন, ব্রাহ্মণ একজন সত্যিকারের পণ্ডিত। তখন রাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বলছেন, 'আমি নবদ্বীপের রাজা, আমি যদি আপনার কোন সেবার কাজে লাগতে পারি তাহলে আমি নিজেকে খুব ধন্য মনে করব'। পণ্ডিত বলছেন, 'আমার কয়েকজন ন্যায়ের ছাত্র আছে, আমার ব্রাহ্মণী কিছু ভিক্ষা করে আনে আর এই তেঁতুল গাছ আছে, তেঁতুল পাতা দিয়ে ঝোল হয়ে যায়, এই ঝোল ভাত খেয়ে আমার দিব্যি চলছে, আমার কিছু লাগবে না'। 'না না, আমি রাজা, আপনাকে কিছু একটা সেবার সুযোগ দিতেই হবে'। পণ্ডিত তখন অনেক ভেবে চিন্তে বললেন, 'ন্যায়শাস্ত্রের একটা শব্দের অর্থ আমি উদ্ধার করতে পারছি না, আপনি যদি মিথিলায় কোন লোক পাঠিয়ে এর অর্থটা আনিয়ে দিতে পারেন আমার খুব উপকার হয়'।

তখন নব্য ন্যায়ের প্রাধান্য ছিল, আর মিথিলা ছিল নব্য ন্যায়ের জায়গা। রাজা শুনে স্তম্ভিত, পণ্ডিতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলছেন, 'আপনার স্ত্রী ঠিকই বলেছিলেন, আমার হাতে লালসুতো আছে বলেই আজ নবদ্বীপের সম্মান'। খাবার পয়সা নেই, বাসস্থানটা জীর্ণ, স্ত্রীর শাঁখা পরার পয়সা নেই, কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে কেমন ডুবে আছেন, সধবার চিহ্ন রাখতে হবে, তাই হাতে লালসুতো বেঁধে রেখেছেন। আমরা ভগবানকে তো দেখিনি, কিন্তু জ্ঞান যখন এই স্তরে চলে, জ্ঞানরূপী আয়নায় এটাই ভগবানের প্রতিবিম্ব, এর উপরে আর হয় না।

ভালবাসা যেখানে, এই যে গোপীরা ভগবানকে এত ভালবাসছে, সব কিছু ত্যাগ করে দিচ্ছেন, মান, সম্মান, কুল, লাজলজ্জা সব ছেড়ে ভগবানের জন্য বেরিয়ে আসছেন। কিসের জন্য? ভগবানকে ভালবাসেন। রাসলীলার শেষে ভগবান গোপীদের বলছেন, 'তোমাদের যে ভালবাসা, এই ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া যায় না, এই যে তোমাদের ভালবাসা, এটাই যেন তোমাদের ফল হয়'। অর্থাৎ তোমার ভালবাসার যে ক্রিয়া এটাই যেন ফল হয়। এর থেকে আর বড় ফল হয় না। তখন বুঝতে হয়, ভালবাসারূপী আয়নাতে এটাই ভগবানের প্রতিবিম্ব। মা যখন শিশুকে দুগ্ধপান করাচ্ছে, তখন কর্মের আয়নাতে এটাই ঈশ্বরের প্রতিরূপ। এর বেশি ঈশ্বরকে দেখা যায় না, এটাই দেখা যায়।

ঠাকুর শুরু করলেন নিষ্কাম কর্ম দিয়ে, সেখান থেকে এক এক করে নামছেন, যেখানে বলছেন, কিভাবে সবটাই কর্ম। কিন্তু সেখান থেকে যখন ঈশ্বর-দর্শন হয়ে যায়, ঈশ্বর-দর্শনের পরে যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, এনারা যখন কর্ম করবেন তখন এভাবেই করবেন। তাঁরা যখন ভালবাসবেন, এভাবেই ভালবাসবেন; তাঁরা যখন জ্ঞানের জন্য থাকবেন, এভাবেই তখন জ্ঞানের জন্য থাকবেন। আমরা এভাবে কল্পনা করতে পারি, মাস্টারমশাই ঠাকুরের কথাগুলো লিখছেন, ঠাকুর বেঁচে আছেন, এরপর কথামৃত ছাপা হয়ে এলো। এবার কি ঠাকুর মাস্টারমশাইকে নিয়মিত জিজ্ঞাসা করবেন, 'হ্যাঁগা রয়েলটিতে কত টাকা এলো'? এই জিনিস কখন কল্পনা করা যায়? কখনই না। এই জগতে কর্মের আয়নাতে এটাই ভগবানের প্রতিবিম্ব।

ঠিক তেমনি ভালবাসা, ঠাকুর নরেন আদি ছোকড়া ভক্তদের যে ভালবাসতেন, ভালবাসা একেবারে ঢেলে দিচ্ছেন। এই জগতে উচ্চতম ভালবাসা যেটা হতে পারে, সেটাই আমরা ঠাকুরের জীবনে দেখি। এটা যে কেবল ঠাকুরের জীবনে দেখছি, তা না, আমার আপনার জীবনেও সব সময়ই ঘটছে, কিন্তু আমরা কিছু গ্ল্যামারাস্ জিনিসকে নিয়ে এত obsessed যে, আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু ঈশ্বরের যে রূপ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, এই রূপগুলো সব সময় আমাদের চোখের সামনে খেলা করছে। একটু স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলেই বোঝা যায় যে, ভগবানকে যদি এই রূপী আয়নাতে দেখা হয় তাহলে এই রূপেই হবে। এরপর মণি জিজ্ঞেস করছে –

মণি– আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশি হয় এ-চেষ্টা কি করতে পারি?

শ্রীরামকৃষ্ণ- বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়। বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে। কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টকায় দোষ নেই।

হিন্দুদের যে চারটে পুরুষার্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – ঠাকুর এখানে অর্থের কথা বলছেন। মানুষের মন একটা বিচিত্র জিনিস। নিউটনের যে গতির সিদ্ধান্তগুলি আছে, তাতে একটা সিদ্ধান্ত হল, যে বস্তু যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থাতেই চলতে থাকে যতক্ষণ একটা বাহ্যিক শক্তি তাতে না দেওয়া হয়। পাথর যদি পড়ে থাকে, সেই পাথর কোন দিন নড়বে না, যতক্ষণ না ওকে ঠেলে দেওয়া হয়। একটা চাকা যদি চলতে থাকে, সেটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না একটা বাহ্যিক শক্তি এসে ওকে না আটকায়, ফ্রিকশান হচ্ছে, বাহ্যিক শক্তি আসছে বলে আটকে যাচ্ছে। আমাদের স্যাটেলাইট, রকেট যখন মহাকাশে

চলে যায়, মহাকাশে কোন ফ্রিকশান নেই, কোন গ্র্যাভিটি নেই, ওটা চলতেই থাকে, থামবে না। আমাদের মন একেবারে ঠিক তাই।

যদিও নিউটন মনকে নিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা বলেননি, কিন্তু দেখবেন মন যেটা করতে থাকে ওটাই সে করতে চায়, ওখান থেকে বেরোতে চায় না। মনের যে নানা রকমের চরিত্রের লক্ষণ আছে, তার মধ্যে এটা মনের একটা খুব মজার চরিত্র। টাকার পিছনে যখন দৌড়াতে শুরু করে, তখন মন টাকার পিছনে দৌড়াতে থাকবে, টাকার পিছনে দৌড়ান থেকে ওকে আর বার করা আনা যায় না। পতনোন্মুখি মন কিনা, যে জিনিসটাকে ধরে, ওখান থেকে আর বেরোতে চাইবে না।

যদি বলেন, তাহলে ঈশ্বরের দিকে যদি মন যায়? না, ঈশ্বরের দিকে মন যায় না। একটা গল্প আছে, দুই ভাই দুজনই ছোট বাচ্চা, কিছুতেই পড়াশোনা করতে চায় না। পণ্ডিতমশাই দুজনকে নিয়ে একটা আম বাগানে গেছেন। একটা আম এনে ছোটটার হাতে দিলেন, বললেন 'এখানে কটা আম'? 'একটা আম'। এরপর আরেকটা আম দিলেন, 'কটা আম'? 'একটা আম'। 'তাহলে মোট কটা আম হল'? সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাইটি বলছে, 'ওরে পণ্ডিতমশাই অঙ্ক পড়াচ্ছে, বলিস না'। মন ভাল জিনিসে যাবে না। কিন্তু যেখানে চেষ্টা করতে হয় না, সেখানে যেটা করছে, ওটাকেই নিয়ে থাকবে, ওর পিছনে পিছনে মন চলতে থাকবে।

ঠাকুর বলছেন, বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়, সেবার জন্য পারা যায়। সেবা করতে করতে কি হয়? স্বামী-স্ত্রী যখন ঝগড়া করে, তখন একজন আরেকজনকে বলবে, তোমার জন্য কতদিন আর কাজ করব? কিন্তু বুঝছে না যে, তুমি নিজের জন্য করছ না নাকি, শুধু কি অন্যের জন্যই করছ? কিন্তু সত্যিকারের যদি এই অবস্থা হয়, স্ত্রী নিজে খেতে পাচ্ছে না, পরতে পারছে না, আমার স্বামী যদি মাতাল, নেশাখোড় হয়; এখন এর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে শান্তি। কিছু দিন আগে খবরের কাগজে দেখলাম, একজন মহিলা দহেজ দিতে পারেনি বলে, শাশুড়ি আর স্বামী মিলে মেয়েটিকে দিনের পর দিন না খেতে দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলল। পুলিশ যখন উদ্ধার করল, মহিলাটির শরীরটা মাত্র কুড়ি কেজিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। এরা কি মানুষ? এখন যদি ওখান থেকে মহিলাটি কোন ভাবে মুক্তি পেয়ে যেত, তাহলে বেঁচে যেত।

আমরা যখন সৎকার্য করি, সৎকার্য করা মানে আপনি এখন বিপরীত দিকে যাচ্ছেন। হঠাৎ মনে হল, আমি এগুলো কেন করছি, কি দরকার আমার পাঁচজনকে ভাল করার; আমি আর বেশি চেষ্টা করব না, এই আছে, এতে যা হওয়ার হবে। সবাই জানে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা ত্রাণকার্য করেন। কিন্তু আপনারা শুনে অবাক হবেন, আমাদের বেশির ভাগই সেন্টার ঘাটতি নিয়ে চলে। আমাদের এত নামকরা ইউনিভার্সিটি, আমাদের চার কোটি টাকার ওভারড্রাফট থাকে ব্যাঙ্কে, কারণ টাকা নেই। লোকেরা দেখে, এত বড় বড় বাড়ি, সন্ন্যাসীরা খুব সুখে আছেন, ভাল খাচ্ছেন, ভাল খাটে শুচ্ছেন। কিন্তু লোকেরা আমাদের জানে না, তাই এই রকম ভাবে। কিন্তু অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা কোন চেষ্টা করি না; একজন বড়লোককে ধরব, তোয়াজ করব, আচ্ছা মশাই আপনার নাম বড় করে লাগিয়ে দেব, দশ লাখটা দান করুন; এসব জিনিস আমরা কক্ষণ করতে যাই না। টাকা আসার হলে আসবে, না আসার হলে আসবে না। সমাজের কাজ, আমরা নিজে থেকে দৌড়াদৌড়ি করব না।

মানুষ যখন টাকার পিছনে দৌড়ায় তখন দরকার হলে মোসায়েবি করবে। ঠাকুর বলছেন, টাকার জন্য সাহেবের বুটের গোঁজা খায়। কিন্তু আমার যদি বর্তমান অবস্থায় এসব না করে চলে যায়, আমি কেন করতে যাব। এখানে তমোগুণের কথা বলা হচ্ছে না, সাধুদের কথা বলা হচ্ছে। তোমার যদি বেশি আয় করার সুযোগ থাকে, অবশ্যই করবে। আগেকার দিনে সেইজন্য বৈশ্যদের বলা হত, তোমরা ধর্মশালা বানাবে, মন্দির নির্মাণ করবে। সেই নামে করে ওরা ব্যবসা করত। আগেকার দিনে এখনকার মত ভোগ ছিল না, সেইজন্য ধনীরা এই ধরণের সেবা কাজে টাকা খরচ করত যাতে পাঁচজনের ভাল

হয়। কিন্তু বর্তমানকালে যেটা হয়েছে, টাকার চোরাবালি, সবাই গিয়ে পা ফেলছে, হুশ্ করে ভিতরে ঢুকে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে, কারুর দৃষ্টিও নেই।

মণি – আজ্ঞা, পরিবারদের উপর কর্তব্য কতদিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ – তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই, পাখির ছানা খুঁটে খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোক্কর মারে। ঠাকুরের খুব নামকরা কথা, ঠাকুর বার বার এই কথা বলতেন। এখন তো খুবই বাজে অবস্থা। সরকার তার কর্মচারীদের প্রচুর মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে, আর তাদের সাথে তাল রেখে প্রাইভেট কোম্পানিগুলিও তাদের কর্মচারীদের টাকা পয়সা বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, চাকরি করা বাবাদের ছেলেগুলোর বয়স হয়ে গেছে, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হয়ে গেছে, এখনও বাবার পয়সার উপরেই খেয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর এর অনুমতি দিচ্ছেন না। শিক্ষা দিয়ে দিলেন, ট্রেনিং দিয়ে দিলেন, এবার তুমি নিজেরটা নিজে দেখে নাও। আমি খেটে টাকা আনব আর তুমি ওই টাকাকে ওড়াবে, আমি তা হতে দেব না। কিন্তু মানুষ মায়ার জন্য পারে না, সন্তান বলে কথা। মণি আবার বলছেন –

মণি – কর্ম কতদিন করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ – ফললাভ হলে আর ফুল থাকে না। ঈশ্বরলাভ হলে কর্ম আর করতে হয় না। মনও লাগে না। আমরা আগে এর একটা ব্যাখ্যা করলাম। একবার যখন জেনে গেলেন, ঈশ্বরই আছেন, তখন তাঁর মনে আর কোন বাসনা আসে না, কোন অপূর্ণ ভাব আসে না।

"মাতাল বেশি মদ খেয়ে হুঁশ রাখতে পারে না – দু-আনা খেলে কাজকর্ম চলতে পারে। ঈশ্বরের দিকে যতই এগুবে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দেবেন। ভয় নাই"। আমরা আগেও এটাকে নিয়ে আলোচনা করেছি। ঈশ্বরীয় সত্তা আছেন, আপনি যেমন যেমন তাঁর দিকে এগোবেন, তিনি তেমন তেমন কাজ কমিয়ে দেবেন। এখানে কাজ বলতে কর্তব্য, দায়ীত্ব এগুলোকে নিয়ে বলছেন। এখানে কাজ বলতে চাকরি করার কথা বলছেন না। দায়ীত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, এগুলো কমে যায়; আমার যা আছে তাতেই চলে যাবে, এই মানসিকতা এসে যায়।

"গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি ক্রমে ক্রমে কর্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না। ছেলেটি হলে ওইটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

"যে-কটা কর্ম আছে, সে-কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী বাড়ির রাঁধাবাড়া আর আর কাজকর্ম সের যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না– তখন ডাকাডাকি করলেও আর আসবে না"।

আগেকার দিনে সবাই গ্রামের পুকুরে বা নদী থাকলে নদীতে গিয়ে স্নান আদি করত। মেয়েরা সব কাজকর্ম সেরে একবার যখন স্নানের দিকে এগিয়ে গেল, এবার আর ডাকলেও ওকে পাওয়া যাবে না। বর্তমানকালে এই সমস্যা নেই, কারণ ঘরের ভিতরেই বাথরুম আছে। ঠাকুর এই উপমাগুলি দিচ্ছেন বোঝানর জন্য। এই কথাগুলো শুনে আপনারা নিশ্চয় বুঝতেই পারছেন, এই কথাগুলো সবার জন্য না। বিষয়ী মানুষ যারা, যারা সংসারী মানুষ তার যে কাজ করে, কাজ করে তার ফলটা টেনে টেনে নিজের কাছে জমাবে। যোগীরা যখন কাজ করেন, তিনি জানেন আমার এই দায়ীত্ব আছে, কাজ করে আমি এই দায়ীত্বটা শেষ করলাম। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাদের ভিতরে রজোগুণের রোষ ছিল, তখন সেন্টারে যদি কোন কাজের ব্যাপার আসে তখন ভাবতাম, আমাকে কেন দিচ্ছেন না, কাজটা আমি একাই করে দিতে পারতাম। এখন বয়স হয়ে গেছে, কোন কাজের দায়ীত্ব এলেই মনে হয়, কাজটা শেষ করতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কাজকে খারাপ হতে দেব না। কারণ এতদিনের একটা ট্রেনিং আছে,

মানসিকতাও সেই ভাবে তৈরী হয়ে গেছে, আর এটা সঙ্ঘের কাজ, সঙ্ঘের কাজ মানেই আমি প্রাণপাত করে করব। কিন্ত কাজ হয়ে যাওয়ার পর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

যে কাজই হোক, প্রথমের দিকে একটা জোর থাকতে হয়, করে করে মনটা যখন একটু পরিষ্কার হতে শুরু হয়, তখন রজোগুণ তো থাকে না, রজোগুণ সরে গিয়ে তখন সত্ত্বগুণের ভাব এসে যায়। সত্ত্বগুণের ভাব হল, কাজটাকে সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করা, পারফেক্টলি করা। কিন্তু কাজটা হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত, আর না। আমরা যখন পঁচিশ ছাব্বিশ বয়সের ছিলাম, তখন দেখতাম বয়স্ক মহারাজদের একটা কোন কাজ দিলে বলতেন, 'অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিন না'। এটা ওনারা কুঁড়েমির জন্য এড়িয়ে যেতে চাইছেন না। কিন্তু আমরা তখন ভাবতাম, কাজ ছাড়া এনারা থাকেন কি করে? আমার কাছে খুব অবাক লাগত, কারণ তখন কাজ পেলেই আমরা ইয়ং ব্রহ্মচারীরা ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন বয়স হয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারছি, যা করার হয়ে গেছে। কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড, কিন্তু আমার এখন হয়ে গেছে, আর না। এটাই ঠাকুর বলছেন, তিনি অর্থাৎ ঈশ্বর কাজ কমিয়ে দেন। কিন্তু ভোগী যারা, সংসারী যারা, তারা এটা পারে না; এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম। সংসারী লোকেরা বলে আমি কাজ ছাড়া বসে থাকতে পারি না। কিছু কাজ না থাকলে তাস খেলবে। কারণ ঈশ্বর-চিন্তনে মানুষ মন দিতে পারে না।

এখানে মূল কথা হল, কর্ম সবাইকেই করতে হয়। প্রথমে স্বার্থবিহীন কর্ম, এখান থেকে উঠতে উঠতে একটা নিষ্কামকর্মের অবস্থায় চলে যাবে। সেখান থেকে কর্মহীন। কর্মহীন তখনই হয়, যখন বস্তুলাভ হয়, মানে আত্মজ্ঞান হয়ে গেল বা মন পুরোপুরি আত্মজ্ঞানের দিকে চলে গেল, তখন আস্তে আস্তে কর্মও শেষ হয়ে যায়। এরপরে মণি জিজ্ঞেস করছেন, ঈশ্বরলাভ-এর মানে কি?

মণি– আজ্ঞা, ঈশ্বরলাভ-এর মানে কি? আর ঈশ্বরদর্শন কাকে বলে? আর কেমন করে হয়?

একটা জিনিস আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, এই জিনিসটাকে বারবার হয়ত আলোচনা করতে হবে। সেটা হল, যখনই আমরা ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভের কথা ভাবি, আমরা সব সময় মনে করি যে, ঈশ্বরকে আমরা ঠিক সে-ভাবেই দেখব, যে-ভাবে আমরা কোন মানুষকে দেখি; অর্থাৎ কোন একজন ব্যক্তি বা কোন আকারে বা কোন একটা রূপে। যতক্ষণ একটা অনুভূতি না হয় ততক্ষণ এই ভাবটা থেকেই যায়, যে-ভাবে আমি আপনাকে দেখছি, ঠিক সেই ভাবে আমি ঠাকুরকে বা যার যিনি ইষ্ট তাঁকে আমরা সেই ভাবেই দেখব। কিন্তু এ-ভাবে ঈশ্বরদর্শন হয় না। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি কখন মনের মাধ্যমে হয় না। যতক্ষণ মনের মাধ্যমে হচ্ছে ততক্ষণ ওই অনুভূতির উপর প্রশ্ন থেকে যায়, সন্দেহ থেকে যাবে ওটা ঠিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা দর্শন কিনা। আধ্যাত্মিক দর্শন যখন হয় আর যেখানে ঠিক ঠিক ঈশ্বর জ্ঞান আসে, মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। মনে প্রতিবিম্বিত হয় ঠিকই, কিন্তু মনের ক্রিয়া, মন বলতে যেটা বুঝি, অর্থাৎ মনের কোন চাঞ্চল্য, চিত্তবৃত্তি থাকবে না।

ঈশ্বরের কৃপায় মন যখন শান্ত হয়ে গেল তখন সেই শান্ত মনই একমাত্র ঈশ্বরের বোধ করে। রাজযোগে জলাশয়ের উপমা নেওয়া হয়। একটা জলাশয় আছে, তাতে অনেকগুলো প্রতিবিম্ব হচ্ছে, কিংবা অনেকগুলো ঢেউ উঠছে। এবার সব ঢেউএর বদলে একটি ঢেউ থেকে গেছে, সেটা হল ঈশ্বরের, অন্য কোন বোধ নেই। এটাকে আমরা যে অর্থে মন বলি, যে অর্থ মন বোঝা হয়, সেই অর্থে এটা মন নয়। কিন্তু তাহলেও একটা জিনিস থেকে যায় যে, হয় আপনার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, নয়তো ঈশ্বর দর্শন হয়নি; হয় আপনি দিল্লী গেছেন, নয় আপনি দিল্লী যাননি। যে দিল্লী গেছে সে দিল্লী জানে। যে যায়নি সে জানে না। বই পড়ে দিল্লীর ব্যাপারে জানা আর দিল্লী গিয়ে জানা, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে।

তাহলে কি ঈশ্বরদর্শনের ক্ষেত্রেও তফাৎ থাকে? আচ্ছা না হয় দিল্লী অনেক বড় শহর। আমরা আরও ছোটতে নামিয়ে আনছি। কলকাতায় শহিদ মিনার আছে, আপনি কি দেখেছেন? অনেকে দেখেনি।

তাহলে ঈশ্বর দর্শন যাদের হয়েছে, আত্মজ্ঞান যাদের হয়েছে; সবারই কি একই রকম হয়েছে? এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা। অন্যান্য ধর্মে এই বিষয়কে নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না। অন্যান্য ধর্মে যেখানে একজন মাত্র ঠিক ঠিক ঋষি, তাঁর কথার উপর সেই ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেখানেও সমস্যা থেকে যায়, খ্রীশ্চানিটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা কি যীশুখ্রীষ্ট হতে পারেন? ওরা এক কথায় বলে দেবে, কোন দিন হতে পারবে না। কারণ তোমরা সবাই মানবজাতি আর যীশু হলে ঈশ্বরের সন্তান। আচ্ছা আমরা যীশুকে না হয় ছেড়ে দিলাম। তাহলে প্রফেট মহম্মদ, তিনি আল্লার সন্তান নন, তিনি আল্লার দূত। সাধনা করে কেউ কি আল্লার দূত হতে পারবেন? বলবেন, না, কোন দিন পারবে না। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম বলে, তোমরা বুদ্ধ হয়ে যেতে পার। এই কথা ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরে যাঁরা বুদ্ধের অনুগামীরা এসেছেন, তাঁরা কক্ষণ এটা মানবেন না।

তার মানে দাঁড়ায়, যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেছেন, প্রবেশ করার পর যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁরা কিন্তু সবাই সমান নন। আপনার আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমান এই অর্থে যে, আপনি বুঝে গেছেন এই পার্থিব জগৎটা সত্য না, মনের জগৎটাও সত্য না; একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, আধ্যাত্মিক জগৎ সত্য। কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত, সেইজন্য তাঁর জ্ঞানও অনন্ত। যদি যুক্তির দিক থেকে দেখা যায়, তখন মনে হয় যে, যাঁদেরই ঈশ্বরজ্ঞান হয়েছে তাঁরা সবাই সমান, আর আমাদের সুবিধার জন্য অবতার পুরুষদের না হয় সরিয়ে রাখছি। তারপরে বাকিরা যাঁরা রয়েছেন, তাতেও মনে কোথাও একটা তফাৎ থেকে যায়। আচার্য শঙ্কর যখন গীতাভাষ্য লিখছেন, আগেও আমরা এর আলোচনা করেছিলাম, সেখানে তিনি বলছেন, যাঁরা ঈশ্বরের পথ নিয়ে নিয়েছেন এনারাও জ্ঞানী, সাধনা যাঁরা করছেন তাঁরাও জ্ঞানী। আর যাঁদের সব কিছু উপলব্ধি হয়ে গেছে, তাঁর আচার আচরণ সব জ্ঞানীর মত, মানে ঈশ্বরকে বস্তু করে বাকি সব কিছু অবস্তু দেখছেন, তিনিও জ্ঞানী। আর যিনি ঈশ্বরকে বিশেষভাবে সাক্ষাৎ করেছেন, তিনিও জ্ঞানী। তার মানে জ্ঞানের আলাদা আলাদা থাক হয়ে যাচ্ছে।

পরের দিকে আমরা দেখছি গীতাতে 'বিজ্ঞান' শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে। বিজ্ঞান, যিনি কিনা ঈশ্বরকে বিশেষ ভাবে জেনেছেন। কিন্তু যেটা সত্যিই সমস্যা করে তা হল - ঈশ্বরকে বিশেষ ভাবে যাঁরা জেনেছেন, তাঁদের মধ্যে গিয়েও আলাদা আলাদা জ্ঞানীর থাক হয়ে যায়; তবে এই বিষয়টাকে নিয়ে সব জায়গায় আলোচনা করা হয় না। কিন্তু বেদান্তসারে ওনারা *ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্ ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ* এ-রকম আলাদা আলাদা করে বলছেন। কিভাবে ওনারা তফাৎ নিয়ে আসেন, বোঝা মুশকিল। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, যাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভব হয়েছে, সেখানেও শ্রেনী আছে। শুধু কি রকম তফাৎ হয়, যেমন ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, সচ্চিদানন্দ সাগর আছে, সেই সমুদ্রকে কেউ কাছে গিয়ে দেখেছে, সমুদ্র দেখে নিয়েছে তাতেই হয়ে গেল; কেউ সমুদ্রকে স্পর্শ করেছেন, কেউ এক গণ্ডুষ জল পান করেছেন। এগুলো উপমা দিয়ে বোঝান হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারের যখন আপনি ঈশ্বর জ্ঞানের আলোচনা করছেন, তখন সেখানে কত শ্রেনী হতে পারে? আসলে এটা বলা খুব মুশকিল। যদিও বলা হয় ওই জায়গায় গিয়ে সবাই সমান, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। ঠাকুরও যেমন বলছেন, নিত্যমুক্ত, ঈশ্বরকোটি; এই ধরণের আলাদা আলাদ শ্রেনী নিয়ে আসছেন। এখানে ঠাকুর বলছেন, বেদান্ত মতে জ্ঞানী বিজ্ঞানী এগুলো আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু বৈষ্ণব মতে কি হয় বলতে গিয়ে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ– বৈষ্ণবরা বলে যে, ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক থাক আছে– প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি সবে পথে উঠছেন তাকে প্রবর্তক বলে। যে সাধন-ভজন করছে– পূজা, জপ, ধ্যান, নামগুণকীর্তন করছে– সে ব্যক্তি সাধক। গীতায় বলছেন, *জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা*; কাম-ক্রোধ জ্ঞানীদের নিত্য বৈরী। জ্ঞানীদের বলতে এখানে যাঁরা সাধনা শুরু করেছেন। "**যে-ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করেছে, তাকেই সিদ্ধ বলে**"। আমরা একটু আগে যে বলছিলাম, জ্ঞানের যে দ্বিতীয় থাক, তিনি বুঝে গেছেন হ্যাঁ ঈশ্বর আছেন, এই নিয়ে ওনার আর কোন সন্দেহ নেই। তাঁর যে আচার-আচরণ, জীবনধারা; যিনি ঈশ্বরকে ভাল ভাবে জেনে গেছেন তাঁর

মতই, শাস্ত্রের মতই হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও একটা ছোট গ্যাপ থেকে যায়। যার জন্য ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। গীতায় বলছেন, *জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা*, কাম-ক্রোধ জ্ঞানীর নিত্য বৈরি। এখন ঠাকুর উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন।

"যেমন বেদান্তের উপমা আছে– অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে, এ নয়। নেতি, নেতি, নেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে 'ইহ' এই বাবু– অর্থাৎ 'অস্তি' বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে, কিন্তু বিশেষরূপে জানা হয় নাই"।

ঠাকুর এখানে বাবুর উপমা দিচ্ছেন। বাবু একজন বস্তু, বস্ত বলে মনে গিয়ে বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের যেটা বোধ হয়, কিভাবে হয়, বলছেন শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন। একটা শাস্ত্রীয় কথা শুনলেন, সেই কথা নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছেন, চিন্তা করতে করতে নিদিধ্যাসন, একেবারে তার সঙ্গে পুরো এক হয়ে গেছেন, কিন্তু জ্ঞানে একটু কম থাকে। এনাদেরকে ঠাকুর বলছেন সিদ্ধ। বাইরের দৃষ্টিতে আমরা যদি একজন সিদ্ধকে দেখি আর পরে যে সিদ্ধের সিদ্ধ বলবেন, আমরা দুজনকে তফাৎ করতে পারব না। কারণ তাঁদের আচার, আচরণ, ব্যবহার, কথাবার্তা সবটাই সমান হয়ে যায়। যার জন্য যখন অবতার আসেন, তখন অবতারকে একজন সাধু, একজন সন্ত রূপেই সবাই জানে। সেইজন্য যারা ঠাকুরের ভাবধারার না, তারা এখনও ঠাকুরকে একজন মহাত্মা, একজন বড় সন্ত রূপে দেখেন, কারণ তফাৎ করা যায় না। ভগবান বুদ্ধকে অনেকেই যোগী রূপে দেখেন। তার কারণ হল, যিনি একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন আর যাঁর একটু কম আছে, ঈশ্বর দর্শনে ওই তফাৎটা বোঝা যায় না।

"আর-এক থাক আছে, তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তাহলে আর একরকম অবস্থা– যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে, যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন"।

একজন বাবু আছেন, সিদ্ধ বুঝে গেলেন বাবু বলে একজন আছেন। কিন্তু এবার বাবুর সাথে বিশেষ পরিচিতি হয়ে গেছে। ঠাকুরের জীবনী পড়ে আমরা দেখি, তিনি কত ভাবে মায়ের সাথে কথা বলতেন। ধর্মের দর্শনে এটা একটা পুরনো সমস্যা হল, ঈশ্বর কি কথা কন? ঠাকুর কিন্তু বারবার বলছে, হ্যাঁ তিনি কথা কন। পুরো ইসলাম ধর্মটা দাঁড়িয়েই আছে, ঈশ্বর কথা বলেন বলে। আল্লা মহম্মদকে আদেশ করছেন। যীশুও ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতেন। আমরা তো যাঁরা বড় বড় তাঁদের কথা বলছি, কিন্তু যাঁরা সাধারণ সাধক তাঁদের ক্ষেত্রে কি হয়? তাঁরাও কথা বলেন।

ভারতের ধর্ম, নীতি, সমাজ নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য আলবিরুনী ভারতে এসেছিলেন। উনি ব্রাহ্মণদের সাথে দেখা করতে চাইলেন। তখন কাশ্মীর ছিল হিন্দুদের গড়, ওখানকার ব্রাহ্মণরা বলে দিলেন, আমরা ওর সাথে দেখাই করব না। তেমনি কাশী পণ্ডিতরাও না করে দিলেন, মুসলমানের সাথে কথা বলবেন না। দিল্লীর আশেপাশে যে ব্রাহ্মণরা ছিলেন, তাঁদের সাথেই আলবিরুনী শেষ পর্যন্ত কথা বলতে পেরেছিলেন। সেই কথাবার্তাকে আধার করে তিনি বই লিখলেন। সেখানে তিনি জিজ্ঞেস করছেন, ঈশ্বর কি কথা কন? তাঁরা পরিষ্কার বললেন, হ্যাঁ কথা কন। এটা একেবারে স্থির মত যে, ঈশ্বর কথা কন। লীলাপ্রসঙ্গ, কথামৃতে আমরা দেখছি, ঠাকুর কিভাবে মুহুর্মুহু মা কালীর সাথে কথা বলছেন। এখন আমাদের পক্ষে এই জিনিসটা বোঝা মুশকিল। যখন একটু ভক্তি ভাবে আছেন, মনটা যখন একটু ইমোশানাল হয়ে যায়, তখন মনে হয়ে এগুলো সবই সত্যি। আবার যখন যুক্তি, তর্ক, বিচার আসে, তখন অন্য রকম মনে হয়।

ঠাকুর পার্থক্য করছেন সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ দিয়ে। যাঁর ঈশ্বর বোধ হয়েছে, সে তো জেনেই গেল। কিন্তু অন্তরঙ্গ ভাবে যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মিশেছেন, কথা বলেছেন, এগুলোর উপর লীলাপ্রসঙ্গে প্রচুর

বর্ণনা আছে, কথামৃতে কম আছে। ঠাকুর কত ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে ফচকিমি করছেন, মজা করছেন, অনেক কিছু করছেন। এটা বলছেন, ঈশ্বরলাভের মানে কি? ঈশ্বরলাভের মানে হল, সিদ্ধের সিদ্ধ হওয়া। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ঈশ্বরলাভের মানে কি, তার কাছে এটাই উত্তর, ঈশ্বরলাভের মানে সিদ্ধের সিদ্ধ হওয়া। সিদ্ধের সিদ্ধ হওয়া মানে, ঈশ্বরকে বিশেষ রূপে জেনে তাঁর শুধু সাক্ষাৎ হয় না, কথাবার্তাও হয়। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর এসে আমার আঙুলগুলো কেমন মটকে দিচ্ছেন। এটাই হল ঠিক ঠিক ঈশ্বর লাভ। লোকেদের যে বিভিন্ন রকম দর্শন হয়, জ্যোতি দর্শন ইত্যাদি, দর্শনের থেকে সেখানে কল্পনাটা বেশি। ঠিক ঠিক ঈশ্বরদর্শনে জগতের যে সত্য সেটাই পাল্টে যায়। আর তার সাথে বলছেন, বিশেষ রূপে বার্তালাপ। শুধু বার্তালাপ না, অন্যান্য সব ক্রিয়াও চলে তখন, একটু পরেই ঠাকুর বলবেন। আর বলছেন, কিভাবে লাভ হয়। তখন বলছেন –

"কিন্তু তাঁকে লাভ করতে হলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর"।

ঠাকুর পাঁচটি ভাবের কথা বলছেন, কথামৃতের পাঠকরা এগুলো অনেকবার পড়ে থাকবেন। গীতাতে যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলা হয়েছে, ওখানে শুধু শান্ত ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য আর কোন ভাবের বর্ণনা নেই। গীতার একাদশ অধ্যায়ে একটু যেন সখ্য ভাব নিয়ে আসা হয়েছে। অর্জুন সেখানে তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাইছেন – বন্ধু বা সখা ভাবে খাওয়ার সময়, ওঠা-বসার সময়, চলা-ফেরার সময় আমরা আপনাকে মানুষ ভাবে বোধ করেছি, এর জন্য আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। ওই জায়গাতে একটু হাল্কা সখ্য ভাবের বোধ আসে, কিন্তু এর বাইরে পুরো গীতা ও উপনিষদ পুরোপুরি একমাত্র শান্ত ভাবকে নিয়ে চলে।

বেদে যে আমরা প্রচুর মন্ত্র পাই যেখানে সব রকমের ভাব নিয়ে আসা হয়েছে। কোন মন্ত্রে ঈশ্বরকে বন্ধুর মত দেখানো হয়েছে, কোথাও প্রিয়তম রূপে দেখছে, কোথাও পিতা রূপে দেখছে আবার কোথাও সন্তান রূপে দেখছে। যার জন্য পরে পরে ভাগবতাদি গ্রন্থে ঈশ্বরের সঙ্গে যত রকমের সম্পর্ক নিয়ে আসা হয়েছে, এগুলো সব বেদ থেকে এসেছে। আমরা মনে করি গীতা আর উপনিষদই সব আর ভাগবতাদি পুরাণ নিজের মত করেছে। তা না, একটা আধ্যাত্মিক সত্য যদি বেদে না থাকে, হিন্দুরা ওটাকে কক্ষণ গ্রহণ করবে না।

"শান্ত – ঋষিদের ছিল"। ব্যাসদেব ঋষি, উপনিষদের রচয়িতারা সবাই ঋষি, ফলে শান্ত ভাবই সেখানে বেশি পাই, তাঁরা তাঁদের ভাব অনুযায়ী লিখেছেন। **"তাঁদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা,–সে জানে আমার পতি কন্দর্প"**। খুব মজার, এখানে ঠাকুর শান্ত ভাবের কথা বলছেন, কিন্তু তুলনা করছেন সতী নারীর স্বামীর প্রতি যে সম্পর্ক, যেখানে একটা খুব উচ্চমানের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন কোন দেশের রাষ্ট্রপতি, তাঁর স্ত্রী সেই দেশের First Lady। ওনারা দুজনে একসাথে যখন কোন সভায় আসেন, সেখানে ওনারা যে ডিগনিটি বজায় রেখে চলেন, শান্ত ভাবে সেই ডিগনিটিটা বজায় রাখা হয়। সাধারণ মানুষ স্বামী-স্ত্রী রূপে কোন বিয়ে বাড়িতে গেল, সেখানেও একটা ডিগনিটি থাকে, ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে, মজা করছে, এগুলো হতে পারে।

একটা খুব সুন্দর লেখা পড়েছিলাম, বর্তমান ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথ উনিই আসল। বিদেশের কোন বড় নেতা এসেছিলেন, একটা ফরমাল সভা হয়ে যাওয়ার পর বিদেশের নেতা চলে গেছেন, এবার রানী এবং তাঁর স্বামী নিজের ঘরের দিকে ফিরে আসছেন। দরজা বন্ধ করতে দুই-এক সেকেণ্ড দেরী হয়েছে। রানী খেয়াল করেননি যে, দরজাটা তখনও বন্ধ হয়নি। সবাই দেখছে তিনি স্বামীর হাত ধরে কেমন লাফাতে লাফাতে নামছেন। ফরমালিটি শেষ হয়ে গেছে, ভেবেছেন দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে, এবার দুজন নিজেদের মত। যেমন একজন স্বামী-স্ত্রী মজা করে হাত ধরাধরি করবে, ওই মুডে এসে গেছেন। ওটা কেউ একজন দেখে নিয়েছিলেন, পরে ওটাকে নিয়ে তিনি তাঁর একটা স্মৃতিকথাতে

লিখেছিলেন – তখন তার মনে হল, এরাও সত্যি মানুষই। কারণ এনারা যেভাবে একটা বজ্র কঠোর ফরমালিটিতে চলেন, সেখানে যদি হাসতে হয় সেটাও মাপা, ঘাড় ব্যাঁকালে সেটাও মেপে। হঠাৎ অন্য রকম দেখে মনে হল, এরাও যে মানুষ বোঝা যাচ্ছে। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যেন পুরোটাই একটা ছবি। বলছেন, এই যে স্ত্রী, তিনি জানেন, স্বামীই আমার সব কিছু, সমস্ত ভালবাসা স্বামীর প্রতি, কিন্তু কোথাও কোন দেখনদারী নেই।

"**দাস্য – যেমন হনুমানের ছিল**"। ইসলাম ধর্ম পুরোপুরি এই দাস্য ভাব নিয়ে চলে। এমনকি প্রফেটও ঠিক ওই ভাবে ব্যবহার করছেন। ঠাকুর বলছেন, "**রামের কাজ করবারসময় সিংহতুল্য। স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে – স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে – যশোদারও ছিল**"।

শান্ত, দাস্য যে ভাবগুলির কথা বলছেন, এগুলো exclusive কিছু না, এভাবে বলা যাবে না যে, শান্তভাব মানে এটাই, দাস্যভাব মানে এটাই। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কে সব রকম ভাবই আছে। এই কথা যদি বর্তমান যুগের কোন মেয়েকে বলেন বা সোস্যাল মিডিয়াতে ছেড়ে দেন – স্ত্রীর মধ্যে দাস্যভাব আছে; সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যাবে। এখানে সেটাকে নিয়ে বলছেন না, দাস্যভাব মানে তার মধ্যে সেবা করার ভাবটা বেশি থাকে।

বাল্মীকি রামায়ণে যে বর্ণনা বাল্মীকি করেছেন, সেখানে মহাবীর হনুমান সব কিছু করছেন এই ভাব নিয়ে যে এটা রামের কাজ। কিন্তু তার বাইরে হনুমানের নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব আছে। পরবর্তিকালে তুলসীদাস যে হনুমানের চরিত্র চিত্রণ করেছেন, সেখানে তিনি হনুমানের মধ্যে আরও বেশি ভক্তির ভাব এনেছেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে সে-রকম কিছু নেই; কিন্তু কাজ যেটা করছেন, সেখানে পুরোপুরি নিষ্ঠা শ্রীরামের প্রতি। ঠাকুর বলছেন, স্ত্রীর মধ্যে এই ভাবটা থাকে। এমন কি মায়ের মধ্যে যে দাসীভাব পরিলক্ষিত হয়, সেটা এই অর্থে যে, সব সময় মায়ের নজর কিভাবে আমার সন্তানকে খুশি রাখব।

"**সখ্য–বন্ধুর ভাব; এস, এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখন এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়ছে**"। ভাগবতে আমরা দেখছি, প্রথমে গোকুল পরে বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণ সেখানকার গোপবালকদের নিয়ে নানা রকমের দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের বন্ধুদের সঙ্গে, তাঁদেরকে নিয়ে কি কি করছেন, এটাকে নিয়েই পরে পরে একটা বিশেষ সাহিত্য দঁড়িয়ে যায়। ভাগবতে পর পর আমরা এই বর্ণনাগুলি দেখতে পাই। গোপবালকরা কৃষ্ণকে আপন মনে করছেন, একেবারে আপন মনে কৃষ্ণের সাথে তাঁরা সব রকম ব্যবহার করছেন। সখ্যভাব খুব উচ্চভাব। অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে একই ভাব ছিল। সুদামার কথা তো ঠাকুর বলছেন। তবে কি হয়, কোনটাই একেবারে কাঁটায় কাঁটায় বাঁধা থাকে না; একটু এদিকে একটু সেদিকে যায়। সখ্যভাব খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

"**বাৎসল্য – যেমন যশোদার**"। বাৎসল্য ভাবটা আরও যেন একতরফা হয়ে যাচ্ছে, মা যেমন সন্তানকে ভালবাসে, একেবারে প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে। "**স্ত্রীরও কতকটা থাকে – স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়**"।

পতি পরমেশ্বর বলা নিয়ে আমাদের মনে বিরাট একটা ভুল ধারণা হয়ে আছে। আমাদের মনে হতে পারে, এই কথাতে স্ত্রীকে এক কঠোর বন্ধনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, এই তোমার স্বামী, এই স্বামীকে ঈশ্বর জ্ঞান করে তার দাসী হয়ে থাক। কিন্তু এই কথাতে একেবারেই এ-রকম কিছু বলা হচ্ছে না। সাধনা সব সময় মনকে নিয়ে হয়। মন্দিরের বিগ্রহের পূজা যদি আমি করতে পারি, তাহলে আমি যাকে ভালবাসি, তার মধ্যে আমি কেন ঈশ্বরকে দেখতে পারব না? দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির, সেখানে মা ভবতারিণীর বিগ্রহ আছে; বিধর্মীরা এগুলো বিশ্বাস করবে না, তারা বলবে মন্দিরে একটা পাথরের পূজা হচ্ছে। যারা ভক্ত তার বলবে বিগ্রহ। আর যাদের একটু চেতনা জেগেছে, যেমন ঠাকুর, তিনি দেখছেন সাক্ষাৎ চিন্ময়ী। এই যে পাথরের প্রতিমাতে আপনি সাক্ষাৎ চিন্ময়ী দেখছেন, কোথাও

আপনার ভালবাসা জন্মেছে, তবেই আপনি দেখছেন। ভালবাসা না জন্মালে তো আপনি দেখতে পারবেন না। তাহলে যাকে আমি ভালবাসছি, তাকে কেন আমি ঈশ্বর রূপে দেখব না? নিজের সন্তানকে সব বাবা-মা ভালবাসে, তাহলে নিজের সন্তানের মধ্যে কেন ঈশ্বরকে দেখা যাবে না? আর যাকে প্রেম করি, তাকে কেন আমি ঈশ্বর জ্ঞানে দেখব না?

সখ্যভাবের উপর স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, A man can attain God by true friendship। সত্যিকারের যদি বন্ধুত্ব হয়, এই বন্ধুত্ব দিয়ে তার ঈশ্বর দর্শনও হয়ে যেতে পারে। ঠাকুরের ছবির পূজা হতে পারে, ঠাকুরের ছবিকে বলছি, হে ঈশ্বর। ছবি তো আর ঈশ্বর হতে পারে না, সেই ছবিতে আমার ভাব গিয়ে ঈশ্বর বানাচ্ছে। তাহলে একটা জীবন্ত মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ঈশ্বর রূপে দেখবে না? এনারা সেটাই বলছেন, তোমার কাছে যিনি আছেন, যিনি তোমার অত্যন্ত প্রিয়, খুব কাছের মানুষ, তাকে ঈশ্বর রূপে দেখ, কিন্তু পুরো ঈশ্বর রূপেই দেখতে হবে, তাতেই তোমার ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে যাবে। একজন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে পতি পরমেশ্বর রূপে দেখে, আর সে-ভাবে সেবা করে, তাতেই তার জ্ঞান হয়ে যাবে।

এরপর প্রশ্ন হবে, তাহলে উল্টোটাও কেন করা যায় না? স্বামী কেন স্ত্রীকে পরমেশ্বরী রূপে দেখবে না? ঠাকুর তো ফলহারিণী কালীপূজায় এটাই করে দেখালেন। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনেককে জানি, যাঁরা স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে, জগদম্বা রূপে দেখতেন। ঠাকুর যে একটা অদ্ভুত কিছু শুরু করে দেখালেন তাতো না। ভারতবর্ষে এই ধারা আগে থেকেই আছে। যাঁরা সত্যিকারের সাধক তাঁরা নিজের স্ত্রীকে জগদম্বা রূপে দেখেন। কোন স্ত্রী বলতে পারে, আমি তো আমার স্বামীকে ঈশ্বর রূপে দেখব, কিন্তু সে তো আমাকে দাসী রূপে দেখছে। ঠিকই বলছেন, ঠিক এই জায়গাতে এসেই সমস্যাটা হয়। এখানে আপনার আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য, নাকি স্বামীকে আত্মজ্ঞান করান উদ্দেশ্য? এটা থেকে কিছুতেই আমরা বেরোতে পারি না। ঠাকুর বলছেন, যদিও আমার গুরু শুড়ি বাড়ি যায় তবুও আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। কেন বলছেন? গুরু তো গোল্লায় গেল, শুড়ি বাড়ি যায়, গোল্লায় যাবেই। কিন্তু আমি এখানে আছি, আমার তো উদ্দেশ্য মুক্তি পাওয়া।

এক সময় আমি উত্তরকাশী ছিলাম, সেখানে এক ইয়ং বাবাজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, খুব মিশুকে, সবার সাথে হাসিঠাট্টা করত। একদিন এসে সেই ইয়ং বাবাজী আমাকে বলছে, 'কি বলব মহারাজ, আমার গুরু বিয়ে করে নিয়েছেন'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে আপনার এখন কি মনে হচ্ছে'? 'কি আর মনে হবে, আমার গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসী ছিলেন, বিয়ে করে নিয়েছেন, থাকুন, উনিই আমার গুরু'। খুব ভাল লাগল শুনে, কি রকম নিষ্ঠা। গুরু তো মেয়ের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গেল, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য গুরুকে উদ্ধার করা না। আমরা প্রায়ই শুনি, অনেক সময় শিষ্যের দৌলতে গুরুর উদ্ধার হয়ে যায়, অনেক সময় বাস্তবিক তাই হয়।

নারী মানেই, তার মধ্য একটা ভালবাসা থাকবে, নারীর মধ্যে ভালবাসা যদি না থাকে সৃষ্টিই চলবে না। পশু, পাখি, জীবজন্তু সব জায়গায় মা সন্তানকে যতটুকু দেখা দরকার ততটুকু দেখে বলেই পরের প্রজন্ম আসে, তা নাহলে সৃষ্টি থমকে যেত। বলছেন, তোমার এত কিছু করার দরকার নেই, তোমার জীবনে তো দুজন নিজেই এসে গেল – স্বামী আর সন্তান। কোন একজনকে ধরে নাও, মনে কর ইনিই পরমেশ্বর, আর সেভাবে জীবনকে চালিয়ে যাও, তোমার জ্ঞান আসবেই আসবে। আমাদের সমস্যা এগুলো না, আমাদের সমস্যা হল, যখন এই জিনিসগুলো আলোচনা হয় তখন ভাবি এতে আমার লাভটা কি হবে। প্রথমেই ভাবি এসব করে আমি কি পাব। আর দ্বিতীয়, আমি তো করছি, সে তো মানছে না। অবশ্য বর্তমান কালে আমি আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি চাই, এই ভাবটা উঠে গেছে, সেইজন্যই এই সমস্যাগুলি হয়।

নিজের বাড়ির লোকেদের ভালবাসতে পারে না, নিজের পাশের বাড়ির লোকেদের ভালবাসতে পারে না, কিন্তু মনে করে ঠাকুরকে ভালবাসব। প্রচলিত একটা কথায় যেমন বলে, যার সাথে ঘর করলুম না, সেই হল ভাল গিন্নি; ঠাকুরের সাথে ঘর করা হয়নি সেইজন্য ঠাকুর ভাল মানুষ। কিন্তু নিজের লোক যারা আছে, তাদের আমি দেখব না; এ-ভাবে ধর্ম জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন কোনটাই হয় না। একজনের সাথে খোটাখুটি হতে পারে, দুজনের সাথেই হতে পারে; কিন্তু কেউ তো আপনার জীবনে আছে যাকে আপনি ভালবাসেন। এবার সেখানে প্রাণ ঢেলে দিন। এটা বলা হচ্ছে না যে, পতি পরমেশ্বর হলে আপনি পতিকে কিছু বলবেন না, তা না। সীতা কত জায়গায় রামকে আটকে দিচ্ছেন, কত কিছু করতে নিষেধ করছেন। দ্রৌপদীও কত জায়গায় অর্জুনকে আটকে দিচ্ছেন। পরমেশ্বর মানে এই নয় যে, আমি সব সময় তোমার অধীনে থাকব। যশোদা কৃষ্ণকে এত ভালবাসছেন; কিন্তু যখন দুষ্টুমি করছে, উখলের সাথে বেঁধে দণ্ড দিচ্ছেন। স্বামী ভুল পথে গেলে তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসবে, তাতে তো আপত্তি করছে না।

যা কিছুই হয়ে থাকুক, আমার দৃষ্টিভঙ্গী হল, আমার মনের ভাব হল, আপনি আমার পরমেশ্বর। কি রকম পরমেশ্বর? ঈশ্বরের অনেক রূপ থাকে, স্বামী যদি লুচ্চা হয়, প্রণাম করে বলবে, লুচ্চারূপী নারায়ণকে প্রণাম; আপনি নারায়ণ কিন্তু অপদার্থরূপী নারায়ণ। মাতাল হলে বলবে, আপনি মাতালরূপী নারায়ণ। ছল প্রকৃতির হলে বলবে, ছলরূপী নারায়ণ। যেটাই হোক, সবটাতেই নারায়ণ বোধটা থাকতে হবে। ভগবানই সব হয়েছেন, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*। লুচ্চাটাও ভগবান, দুষ্টটাও ভগবান, মাতাল যে সেও ভগবান, যে অপদার্থ সেও ভগবান। এখন সব গুণ যদি কারুর স্বামীর মধ্যে থাকে, তখন সে-ভাবেই দেখতে হবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে আপনি এগোচ্ছেন কিনা সেটা আপনাকে নিজে দেখতে হবে।

বাৎসল্যভাবের কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর আরও বলছেন, "**ছেলেটি পেট ভরে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন**"। ভাগবতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, যশোদা মাখন তৈরী করছেন আর সব সময় ভাবছেন আমার কৃষ্ণকে খাওয়াব।

আধ্যাত্মিক উত্থানের প্রথম শর্তই হল আমিত্বের নাশ। আমিত্ব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনি কোন মতে ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারবেন না; আমি ভাব থাকলে, কোন পথে, কোন ধর্মে কোথাও কোন ভাবে এগোন যাবে না। এই আমিত্বের নাশ আমরা কিভাবে করব? আমিত্ব থাকলে চিত্তবৃত্তি থাকবে, সেইজন্য যোগে বলছেন, চিত্তবৃত্তিকে যদি দাবিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমিত্ব কমে যাবে। কর্মযোগে যখন আমরা অপরের জন্য সেবা করছি, তখন সেখানে আমিত্ব চলে যায়। দাসভাবে ঈশ্বরজ্ঞানে যখন অপরের জন্য কাজ করা হচ্ছে, আমিত্ব চলে যায়। আর সখ্যভাব আদিতে বন্ধুর জন্যই আমি সব করছি, সেখানেও আমিত্বের নাশ হচ্ছে।

কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরা বলে, আমি আমার বন্ধুর জন্য কত কিছু করলাম, সে আমার দিকে তাকাল না। তার মানে তুমি ওখানে বিজনেস করছিলে, কারণ তুমি চাইছিলে আমিও করছিলাম, তুমিও আমার জন্য করবে। উদ্দেশ্যটা হল ঈশ্বরের দিকে এগোন, সেইজন্য আমার আমিত্বটাকে নাশ করা। উদ্দেশ্য আমার আধ্যাত্মিক উত্থান, তুমি যদি গোল্লায় যেতে চাও যাও, তাতে আমার কি করার আছে! কিন্তু তোমাকে অবলম্বন করে আমি এগিয়ে যাব। আগেকার দিনে বাচ্চারা যে খেলাধূলা করত, তাতে ওদের একটা খেলা ছিল, একজনের পিঠে আরেকজন পা রেখে জাম্প দিয়ে বেরিয়ে যেত। যখন আপনি কাউকে নারায়ণ রূপে দেখছেন, তখন এটা হল তাঁর পিঠে পা রেখে আপনি জাম্প মেরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্বামী তাই, সন্তান তাই, গুরুও তাই। তাকে অবলম্বন করে, যেমন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়, ঠিক সেইভাবে আপনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। সেখানে আপনার গুরু কি করছে, আপনার স্বামী বা স্ত্রী কি

করছে, আপনার সন্তান কি করছে, তাতে আপনার কি? যতটুকু দায়ীত্ব ততটুকু করলেন, বাকিটা ঈশ্বররূপে করে বেরিয়ে যান।

"মধুর – যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুরভাব। এ-ভাবের মধ্যে সকল ভাবই আছে – শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য"। এই যে বলা হল, exclusive বলে কিছু নেই। যে কটা ভাবের কথা বলা হল, সব কটাতেই আমিত্বের নাশ হয়। কিন্তু মধুরভাব যে জায়গাতে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা এক হয়ে যায়, ওই জায়গাতে গিয়ে যে আমিত্বের নাশ, ওর মত আমিত্বের নাশ আর কোথাও হয় না। যার জন্য রাসলীলাতে খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন – শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে নৃত্য করছেন, যে কজন গোপীরা ছিলেন, সবাই দেখছেন তাঁর সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করছেন। মাঝখান থেকে হঠাৎ গোপীদের থেকে কৃষ্ণ উধাও হয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন? খোঁজ করতে করতে এক জায়গায় দেখছেন দু জোড়া পায়ের ছাপ। বুঝতে পারলেন কোন গোপীর সাথে চলে গেছেন। এক জায়গায় দেখছেন পায়ের চাপ বেশি, বুঝে নিলেন কৃষ্ণ তাকে কাঁধে নিয়ে এই জায়গায় ওই গোপীকে দিয়ে ফুল পাড়িয়েছেন। তারপর দেখছেন আর কোন পায়ের ছাপ নেই। ওই মেয়েটির অহঙ্কার হয়ে গেছে, আমিত্ব এসে গেছে – কৃষ্ণ এখন শুধু আমার, ব্যস্ কৃষ্ণ তাঁকেও ফেলে রেখে উধাও।

এটা কিছুতেই বোঝান যায় না যে, ব্যাসদেব যে রাসলীলা রচনা করছেন, সেখানে তিনি এই জিনিসটাই বোঝাচ্ছেন, মধুর ভাব যেখানে সেখানে পুরো এক হয়ে গেছে। সেখানেও যদি সামান্যতম একটু, ঘুণাক্ষর আমিত্ব বোধ যদি এসে যায়, ঈশ্বর আর থাকবেন না। যে ভাব নিয়েই থাকুক, একটু যদি আমিত্ব ঢুকেছে, ঈশ্বর আর থাকবেন না। কৃষ্ণ ওখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। সেই মেয়েটিও এখন কাঁদতে কাঁদতে বাকি গোপীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করছেন, কোথায় গেলেন কৃষ্ণ। বলছেন, মধুরভাবে সব ভাবই আছে। মধুরভাবে অনেক ঝুঁকিও আছে, পরে ঠাকুর আবার বলবেন। যার জন্য তন্ত্র সাধনায় যে মৈথুনের কথা বলা হয়, সেখনে খুব কঠোর ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সম্পর্কটা সব সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই রাখতে হয়। তবে যদি কাউকে বুঝতে হয়, ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন হয়, সেখানে এই ভাব না আনলে বোঝা যায় না। এরপর অন্য প্রসঙ্গ আসছে।

"মণি – ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ – তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না"। এই জিনিসটাকে আমাদের খুব ভাল করে বুঝতে হবে। প্রায়ই লোকেরা এই জিনিসটাকে ভুল বোঝে, আমরা বার বার বলছি এই চর্মচক্ষু দ্বারা ঈশ্বর দর্শন হয় না, ঈশ্বর দর্শন সব সময় ভাব চক্ষে হয়। ভাব চক্ষু কিভাবে হবে? **"সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়– তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ"**। এত বিশদ বর্ণনা অন্যান্য শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু কিছু সাধকরা এই জিনিসগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছেন, একেবারেই যে লেখেননি তা না। গীতাতে একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে ভগবান বলছেন, তুমি তো আমাকে এই চোখ দিয়ে দেখতে পারবে না, তাই আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিলাম। দিব্য চক্ষু সাধনা করতে করতে হয়। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ যদি চান, আপনাকে ইচ্ছামাত্রই, কিংবা কথা দিয়ে, কিংবা স্পর্শ দিয়ে আপনাকে দিব্য চক্ষু দিয়ে দিতে পারেন।

এই জায়গাতে এসে সাধক আর অবতারে তফাৎ হয়ে যায়। একটু আগে যে বলা হল, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ এই দুজনের মধ্যে কি তফাৎ? সিদ্ধ যিনি তিনি ইচ্ছামাত্র আপনাকে দিব্য চক্ষু দিতে পারবেন না, সম্ভবই না। সিদ্ধের সিদ্ধ যিনি, অবতার যিনি, তিনি দিয়ে দিতে পারবেন। যীশু খ্রীষ্টের জীবন যদি আমরা ভাল করে দেখি; তাঁর যে বারো জন শিষ্য সবাই নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে, নিজের জীবনযাত্রা ছেড়ে যীশুর পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন? প্রাণ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, সেটা কি এমনি? কিছু একটা অনুভূতি আছে, যেটা না হলে কখন হবে না। ঠাকুরের যে কজন শিষ্যরা ছিলেন, গৃহস্থ শিষ্যরাও আছেন, তাঁরা যে সব কিছু ছেড়ে ঠাকুরকে ধরে আছেন, তাঁর বাড়ির যে

কুলদেবতা, কুলদেবী আছেন, সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন; একটা কিছু বোধ যদি না হয়ে থাকে এভাবে থাকতে পারতেন না। কি করে বোধ হল? বলতে পারেন কিছুটা সাধনা দিয়ে, কিছুটা ঠাকুরের কৃপায়। বেশির ভাগই ঠাকুরের কৃপায়, তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, হ্যাঁ এটাই আমি। কিন্তু যখন তাঁদের বোধ হচ্ছে, তখন দিব্য চক্ষু, এটা চর্মচক্ষু দিয়ে হবে না।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন, যে কল্পতরু উৎসব আমরা প্রত্যেক বছর পালন করি, সেখানে ঠাকুর যে কল্পতরু হয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছামাত্রই তাঁদের দিব্যচক্ষু দিয়ে দিলেন। আমরা এটাকে দিব্যচক্ষু বলতে পারি, সূক্ষ্ম শরীর বলতে পারি, যেভাবেই বলি না কেন, কোন ক্ষতি নেই। কারণ আমাদের যে শরীর ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় সবটাই পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী। তাই আমরা পঞ্চভূতের জগৎকেই দেখতে পাই। এই চোখ দিয়ে আমরা ঠাকুরের ছবি দেখতে পারব, ঠাকুরের বিগ্রহ দেখতে পারব কিন্তু ঠাকুরকে দেখতে পারব না। ঠাকুরকে যদি এই চোখ দিয়ে দেখতে চাই, তাহলে ঠাকুর যখন আবার অবতার হয়ে আসবেন ওই সময় গিয়ে আপনাকে দেখে আসতে হবে। ঠাকুর এখন পঞ্চভূতের শরীরে নেই, ঠাকুরকে আর দেখা যাবে না। ঠাকুরকে দেখতে হলে আপনাকে দিব্যচক্ষু অর্জন করতে হবে। যতক্ষণ দিব্যচক্ষু অর্জন না করতে পারছেন, ততক্ষণ আপনি দেখতে পারবেন না। ঠাকুর তাই বলছেন, "**সেই চক্ষে তাঁকে দেখে – সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়**"। সেইজন্য অনেকেই যে এসে বলেন ঠাকুরের কথা শুনতে পান, এগুলো মনের ভুল। চোখ দিয়ে যাঁরা ঠাকুরকে দেখতে পান বলছেন, এটাও মনের ভুল।

ঠাকুর বলছেন, "**আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়**"। **এই কথা শুনিয়া মণি হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিরক্ত না হইয়া আবার বলিতেছেন।**

"**এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়**"। এই কথাগুলো যাঁরা বলেছিলেন তাঁরাই এর মর্মার্থ জানেন, আমরা আর কতটুকু বুঝি। ঠাকুর বলে যাচ্ছেন, আমরাও শুনে যাচ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ – ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারিদিক হলদে দেখা যায়"। এগুলো আমাদের প্রচলিত কথা। জণ্ডিস হলে নাকি সব হলুদ দেখে। এক-দুজনকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সবাই কিন্তু বলছে কোন কিছুই হলুদ দেখছি না। একটা প্রচলিত কথাকে উদাহরণ রূপে বলা হচ্ছে। উদাহরণটা ভুল হলে সত্যটা কখন ভুল হয়ে যাবে না।

"**তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশি হলে বলে, 'আমিই কালী**"। ঈশ্বরের প্রতি তার এত ভালবাসা হয়ে যে, সে মনে করে; যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি খুব ভালবাসা থাকে, তাহলে দেখা যাবে ওদের হাঁটাচলা একই রকম হয়ে যায়। দেখা যায়, তাদের কথা বলার ধরণ একই রকম হয়ে যায়, শব্দের ব্যবহারও একই রকম হয়ে যায়, খাওয়ার অভ্যাসটাও একই রকম হয়ে যায়। বন্ধুদের মধ্যেও একই জিনিস দেখা যায়। ইংরাজীতে একটা কথাই আছে, A man is known by his company he keeps, যাদের সাথে মেলামেশা ওঠাবসা করে, তাদেরও হাঁটাচলা, কথাবলা একই রকম হয়ে যায়। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ প্রেম হয়ে যায়, তখন তিনিই আমি বোধ হয়। কৃষ্ণকে ভালবাসছে, মনে করছে আমি কৃষ্ণ হয়েছি। ঠাকুর মাতালের কথা বলছেন, মাতালরা নেশা হয়ে গেলে যেমন নানা রকম কথা বলে, ঠিক সেই রকম বিশেষ প্রেম হয়ে গেলে ঈশ্বরকে নিয়ে বলে 'আমিই কৃষ্ণ'।

"**গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল, 'আমিই কৃষ্ণ'**"। এই দৃশ্যটা রাসলীলাতেই আসে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মাঝখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। কৃষ্ণকে কাছে না পেয়ে গোপীরা তখন কৃষ্ণ ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত যে-সব লীলা করেছেন, সেগুলো সব নিজেরা অভিনয় করতে শুরু করলেন।

তার মধ্যে কেউ নিজেকে কৃষ্ণ মনে করছে, কেউ অন্য কিছু মনে করছে; কৃষ্ণের ভাবে গোপীরা সবাই এক হয়ে গেছেন। ভালবাসা খুব গভীর না হলে এ-জিনিস হবে না।

"তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়, যেমন – প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়"। এই কথা শুনে মণি ভাবছেন, সে শিখা তো সত্যকারের শিখা নয়।

ঠাকুর অন্তর্যামী, তিনি বুঝেছেন মাস্টারের মনে এই সংশয় উৎপন্ন হয়েছে। তিনি বলছেন, **"চৈতন্যকে চিন্তা করলে অচৈতন্য হয় না। শিবনাথ বলেছিল, ঈশ্বরকে একশোবার ভাবলে বেহেড হয়ে যায়। আমি তাকে বললাম, চৈতন্যকে চিন্তা করলে কি অচৈতন্য হয়"**? ট্রেনে একদিন একরাত কাটাবার পর ট্রেন থেকে নামার পরেও মনে হবে গা দুলছে। বাড়িতে বিছানায় শুয়ে থাকলে মনে হবে এখনও ট্রেনের বাঙ্কে দুলছে, যদিও দুলছে না। ঠাকুর বলছে, ওটা অচৈতন্য কিন্তু এটা চৈতন্য। আমরা যেটাকে নিয়ে চিন্তা করি, ওটা অচৈতন্য। ফলে যে হ্যালুসিনেশানগুলি হয়, সেটাও অচৈতন্য। কিন্তু যিনি চৈতন্যের চিন্তা করছেন, ওই চিন্তা করে করে সে চৈতন্যের সাথেই এক হয়ে যায়। ভূতের কথা বেশি ভাবলে মরার পর ভূত যোনিতে যাবে; ঈশ্বরের কথা বেশি ভাবলে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হবে।

মণি– আজ্ঞা, বুঝেছি। এ-তো অনিত্য কোন বিষয় চিন্তা করা নয়?– যিনি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ তাঁতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন অচৈতন্য হবে? শুনে ঠাকুর খুব প্রসন্ন হয়ে বলছেন – **"এইটি তাঁর কৃপা – তাঁর কৃপা না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না"**। যদি কখন মনে হয় আপনি শাস্ত্রের একটা কথা বুঝতে পেরেছেন, বুঝতে হবে সেখানে ঈশ্বরীয় কৃপা আছে। ঈশ্বরীয় কৃপা না হলে শাস্ত্রের কথা বোঝা যায় না। আপনি যত শাস্ত্রের কথা শুনুন, যত শাস্ত্র পাঠ করুন, যত শাস্ত্রের ক্লাশ করুন, শাস্ত্রের কথা বোঝা যায় না। কোন একটা জায়গায় যদি সন্দেহ কেটে যায়, গীতায় যার জন্য বলছেন, *সংশয়াত্মা বিনশ্যতি*, সংশয় থাকবেই। কিন্তু সন্দেহ যদি মিটে যায়, বুঝতে হবে ঠাকুরের কৃপা আছে।

"আত্মার সক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

"তাঁর কৃপা না হলে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধরে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে। কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে, আর ভয় নাই। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন, আর দেখা দেন আর কষ্ট নাই"।

ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এটাই তফাৎ। ধর্ম হল, মানুষ যেখানে ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করে; আধ্যাত্মিকতা হল, যেখানে ঈশ্বর আপনার হাত ধরেন। যতক্ষণ আপনি জপধ্যান করছেন, ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করছেন, ততক্ষণ এটা ধর্ম। কিন্তু যখন আপনি ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালবাসায় ডুবে গেছেন, তখন ঈশ্বর এসে যে আপনাকে ধরে নিচ্ছেন, তখন শুরু হয় আধ্যাত্মিক যাত্রা। আধ্যাত্মিক যাত্রা ততক্ষণ শুরু হবে না, যতক্ষণ না ঈশ্বর এসে আপনার হাত ধরছেন। ঠাকুর এখানে ছেলে বাবার হাত ধরেছে আর বাবা ছেলের হাত ধরেছে এই উপমা দিয়ে জিনিসটাকে বোঝাচ্ছেন, যার শেষ অর্থ এটাই – ধর্ম মানেই আমি ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করছেন; আধ্যাত্মিকতা মানে ঠাকুর এবার আমাকে ধরে নিয়েছেন। আমি আর কোন দিকে যেতে পারব না। আমি যদি একটু ডান দিক বাম দিক করতে যাই, হয়ত একটু চড় মারবেন, হয়ত একটু এই কষ্ট, সেই কষ্ট দেবেন, সংসারে অশান্তি লাগিয়ে হয়ত একটু কষ্ট দেবেন কিন্তু হাত ছাড়বেন না।

"তবে তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে– সাধনা করতে করতে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচ্ছে, দেখে মার দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিল এসে দেখা দেয়"। মা আড়ালে চলে গেলে বাচ্চা অনেক কান্নাকাটি করে, এতে মা খুব মজা পায়, আনন্দ পায়, ছেলে আমাকে

চায়। মানুষের এটা স্বভাব যে, সবাই চায় অপরে যাতে আমার অভাব অনুভব করে। আপনজন যারা, তাদের উপরেও এই স্বভাব লাগিয়ে দেয় – কি! আমারও যে দরকার আছে এতদিনে টের পেলে তো। এই স্বভাব থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক, আমার গুরুত্ব সবাই বুঝুক, এটা মানুষ প্রত্যেক ক্ষেত্রে চায়। আর এটা নিজের সন্তানের উপরেও লাগায়। ছোট্ট শিশু মা মা করে চেঁচাচ্ছে, মার খুব ভাল লাগে। কিন্তু একটু বেশি হয়ে গেলে মা ঘাবড়ে যায়, তখন দৌড়ে আসে।

মণি ভাবিতেছেন, তিনি দৌড়াদৌড়ি কেন করান।–ঠাকুর অমনি বলিতেছেন, "তাঁর ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়; তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম মহামায়া। তাই সেই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হতে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন করতে পারলে তবেই ঈশ্বরদর্শন হতে পারে"।

সৃষ্টি কেন হয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তর কারু কাছে নেই। যার যেমন মনের ভাব, সেই ভাব অনুযায়ীই তিনি এর ব্যাখ্যা করেন। মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলছেন, যে কালে জগৎ নেই, তার মানে সৃষ্টিই হয়নি; যার আগে নেই শেষে নেই মাঝখানে কোথা থেকে এসে যাবে! আবার যাঁরা পঞ্চভূত নিয়ে চলেন, তাঁরা বলবেন, এমনিই চলছে। ঠাকুর এখানে ভক্ত, সব কিছু তিনি ভক্তের দৃষ্টিতে দেখছেন। সেখানে সব কিছুতে ঠাকুর দেখছেন – মায়ের ইচ্ছা। সৃষ্টিকেও দেখছেন মায়ের ইচ্ছা, মায়ের লীলা। যদি মায়ের ইচ্ছা, মায়ের লীলা হয়, তাহলে এই জগৎ কেন? কারণ তিনি চাইছেন, আমরা মাকে চাইব।

তাহলে একজন লোক যে দুঃখ করে বলবে, আমি যে লম্পট হয়েছি, আমি যে একটা খুনী হয়ে গেলাম, আমি যে আজ জেল খাটছি, এটা কি মায়ের ইচ্ছাতে? হ্যাঁ, কারণ তুমি মাকে চাইছিলে না। মাকে ছেড়ে তুমি বাকি পাঁচটা জিনিস চাইছিলে, সেই চাওয়ার কি ফল হতে পারে মা তোমাকে দেখিয়ে দিলেন। এতে তো তোমার আত্যন্তিক নাশ হয়ে যাচ্ছে না। হিন্দু ধর্ম সেমেটিক ধর্মগুলি, খ্রীশ্চান, ইসলামের মত নয়। তুমি একবার পাপ করেছ, চিরদিনের মত তুমি নরকে চলে গেলে, এটা হিন্দু ধর্মে নেই। কিছু জন্ম এদিক সেদিক ঘুরবে, ঘুরে আবার মায়ের কাছে চলে আসবে। অনন্ত কালের মধ্যে কটা জন্মের কি দাম! যে একশ বছর বা আশি বছর বেঁচে আছে, তার জীবনে তিন ঘন্টার কি দাম! যেখানে অনন্ত সময় সেখানে কয়েকটা জন্ম এদিকে সেদিকে চলে গেলে, তাতে কি আর এসে যাবে। এটাকেই স্বামীজী ঘুরিয়ে এনে বলছেন, এত জন্ম তো ভোগ করলে, এই জন্মটা আমার জন্য দিয়ে দাও, এই জন্মে মানুষের সেবা কর।

মা যখন ছেলেকে দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করান, মা সব দেখছেন, তিনি জানেন ছেলে কত দূর আর যাবে। যখন দেখছেন বেশি ভোগের দিলে চলে যাচ্ছে, তখন একটা চড় মেরে দিলেন। কিভাবে চড় মারবেন? যা গোলমাল করছে, একটা কোন গোলমালে ফেঁসে গিয়ে হয়ত কয়েক দিনের জেল হয়ে গেল। তখন বলল, না, আর এগুলো করব না। যখনই মানুষ কোন কষ্ট পায়, যখনই জগৎ থেকে কোন কষ্ট পাচ্ছেন; দেখবেন কোথাও কোন ভাবে আপনি একটা ভুল পথে চলে গিয়েছিলেন। ভুল পথে এমন ভাবে চলে গিয়েছিলেন যে, আপনাকে সেখান থেকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা মুশকিল হচ্ছিল। সেইজন্য একটা চড় মারা হয়েছে। কিংবা একটা হাল্কা প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিচ্ছিল, যেটা পরে একটা বিভৎস রূপ নিতে পারে, একটা চড় মেরে আপনাকে ঠিক করার চেষ্টা করা হয়। যদি তাতে ঠিক না হয়, আপনাকে আরও বড় একটা চড় মারবেন। কিছু রোগ আছে হোমিওপ্যাথি খেলে সেরে যায়, কিছু রোগ আছে এ্যলোপ্যাথি খেতে হয়। তাতেও যদি কিছু না হয়, তখন অপারেশান করতে হয়। কিন্তু অপারেশান করলাম না, রোগী মারা গেল, এটা কোন দিন হবে না, এখানে হিন্দু ধর্মে মহামায়ার রাজ্যে কোন রোগী কক্ষণ মারা যায় না। হয় হোমিওপ্যাথির এক পুরিয়া ডোজ খেয়ে সোজা হয়ে রাস্থায় এসে যাবে, তাতে না হলে এ্যলোপ্যাথি ডোজ খেয়ে আসবে, আর তাও না হলে তাকে অপারেশান টেবিলে নিয়ে গিয়ে

ছুড়ি-কাঁচি চালাবে। পথে সবাইকেই নিয়ে আসা হবে। অর্থাৎ শেষমেশ মায়ের কাছে সবাইকেই আসতে হবে। এই প্রসঙ্গটা এখানে এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

(*বিঃ দ্রঃ – কথামৃতের এর পরের অংশের যে ব্যাখ্যা পূজনীয় মহারাজ করেছিলেন তার রেকর্ডিংটা অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। পাঠকদের সুবিধার্থে এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন কথামৃতের এই অংশের পুরোটা আমরা এখানে তুলে দিলাম*।) (*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত ৩৭তম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, মাঘ ১৪১৯ – পৃষ্ঠা ৬৫, ৬৬ ও ৬৭*)।

[*আদ্যাশক্তি মহামায়া ও শক্তিসাধনা*]

শ্রীরামকৃষ্ণ–তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়–সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। তাই পুরাণে কথা আছে– চণ্ডীতে–মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব করছেন।

"শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতর বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে,–অবিদ্যা–মুগ্ধ করে। অবিদ্যা–যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন–মুগ্ধ করে। বিদ্যা–যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম– ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।

"সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তির পুজা পদ্ধতি।

"তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য নানাভাবে পূজা– দাসীভাব, বীরভাব, সন্তানভাব। বীরভাব– অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা।

"শক্তিসাধনা–সব ভারী উৎকট সাধনা ছিল, চালাকি নয়।

"আমি মার দাসীভাবে, সখীভাবে দুই বৎসর ছিলাম। আমার কিন্তু সন্তানভাব, স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃস্তন মনে করি।

"মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলা দেশে জাঁতি থাকে;– অর্থাৎ ওই শক্তিরূপ কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন করবে। এটি বীরভাব। আমি বীরভাবে পূজা করি নাই। আমার সন্তানভাব।

"কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই– বর-বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক"।

[*দর্শনের পর ঐশ্বর্য ভুল হয়-নানা জ্ঞান, অপরা-বিদ্যা–'Religion and science'–সাত্ত্বিক ও রাজসিক জ্ঞান*]

শ্রীরামকৃষ্ণ– ঈশ্বরলাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য ভুল হয়ে যায়; তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হলে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। নরেন্দ্রকে দেখলে "তোর নাম কি; তোর বাড়ি কোথা"– এ-সব জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। জিজ্ঞাসা করবার অবসর কই? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বললে, "ভাই, আমি বার তিথি নক্ষত্র– এ-সব কিছুই জানি না, আমি এক 'রাম' চিন্তা করি"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা – শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদের কথা – ১৮৫৮

[*কৃষ্ণকিশোর, এঁড়েদার সাধু, হলধারী, যতীন্দ্র, জয় মুখুজ্জে, রাসমণি*]

আজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহানন্দে আছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নরেন্দ্র আসিয়াছেন। আরও কয়েকটি অন্তরঙ্গ আছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া স্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন

আজ (৩১শে) আশ্বিন, শুক্লা চতুর্থী তিথি; ১৬ই অক্টোবর ১৮৮২, সোমবার। আগামী বৃহস্পতিবার সপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখাল, রামলাল ও হাজরা আছেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে আর দু-একটি ব্রহ্মজ্ঞানী ছোকরা আসিয়াছেন। আজ মাস্টারও আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করিলেন। আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন, নরেন্দ্রাদি ভক্তের বিশেষতঃ নরেন্দ্র বিশ্রাম করিবেন। মাদুরের উপর লেপ ও বালিশ পাতা হইয়াছে। ঠাকুরও বালকের ন্যায় নরেন্দ্রের কাছে বিছানায় বসিলেন। ভক্তদের সহিত, বিশেষতঃ নরেন্দ্রের সহিত, নরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া হাসিমুখে মহা আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র, গল্পচ্ছলে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)–আমার এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুলতা হত। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতাম।

"কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, 'আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ; কেমন করে আপনার জল তুলে দেব'? কৃষ্ণকিশোর বললে, 'তুই বল শিব। শিব শিব বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি'। সে 'শিব' 'শিব' বলে জল তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে। কি বিশ্বাস!

"এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখতে যাব ভাবলুম। আমি কালীবাড়িতে হলধারীকে বললাম, কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাব। তুমি যাবে? হলধারী বললে, 'একটা মাটির খাঁচা'! কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ওই-কথা বললাম। সে মহা রেগে গেল। আর বললে, 'কি! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, যে রাম চিন্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা। সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়'। এত রাগ – কালীবাড়িতে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত! কথা কইবে না!

"আমায় বলেছিল, 'পৈতেটা ফেললে কেন'? যখন আমার এই অবস্থা হল, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কজি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল। আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললাম, 'তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝ'!

"তাই হল! তার নিজেরই উন্মাদ হল। তখন সে কেবল 'ওঁ ওঁ' বলত আর একঘরে চুপ করে বসে থাকত। সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বললে, 'ওগো, আমার রোগ আরমা কর, কিন্তু দেখো, যেন আমার ওঁকারটি আরমা করো না'। (সকলের হাস্য)

"একদিন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। জিজ্ঞাস করলাম, 'কি হয়েছে'? বললে 'টেক্সওয়ালা এসেছিল – তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে'। আমি বললাম, হি হবে ভেবে? না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায় তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো! (নরেন্দ্রাদির হাস্য) কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়ত কিনা। মাঝে মাঝে 'তুমি খ' বলে, ঠাট্টা করতাম। হেসে বললাম, 'তুমি খ'; টেক্স তোমাকে তো টানতে পারবে না'।

এরপর থেকে আবার পূজনীয় মহারাজের ব্যাখ্যা শুরু হচ্ছে –

এতক্ষণ ঠাকুরের প্রথম প্রেমোন্মাদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছিল, ১৮৫৮ সালের ঘটনা। ১৬ই অক্টোবর ১৮৮২, সোমবার দক্ষিণেশ্বরে মাস্টারমশাই, নরেন ও রাখালাদি ভক্তদের সামনে সেই ঘটনার বর্ণনা করা হচ্ছে।

দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন হওয়ার পর ঠাকুর ধীরে ধীরে মন্দিরের পূজারীর পদে নিযুক্ত হলেন। পূজারী হয়ে পূজাদি করতে করতে ঠাকুরের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু হল, ঈশ্বর, মা কালী এগুলো আদৌ সত্য কিনা। সেখান থেকে তিনি সাধনা করতে শুরু করলেন। ঠাকুরের সাধনা রানী রাসমণী ও মথুরবাবুর নজরে পড়ল, দেখছেন ঠাকুরের সাধনার সব কিছু একেবারে অন্য রকম। এনারা দুজনেই ঠাকুরকে সম্মান করতে শুরু করলেন। কিন্তু ঠাকুরের মনে যেন ঝড় বইছে। মনের এই ঝড়কে বোঝান খুব মুশকিল। বাচ্চা স্কুলে একটা নূতন কোন কথা শিখল, কিংবা একটা কবিতা শিখল, একটা গান শিখে এলো, সে অবাক হয়ে এসে বাড়িতে মাকে শোনাবে। সেখান থেকে আপনি যদি আরও এগোতে শুরু করেন। আপনি হয়ত হঠাৎ একটা লটারি পেয়ে গেলেন। সব বন্ধুদের ফোন করে নানান রকম কথা বলতে শুরু করলেন, একটা উচ্ছাসের অভিব্যক্তি হচ্ছে। ঠাকুরের যে জিনিসটা হচ্ছে এটা অন্য রকম, এটাকে বলছেন প্রেমোন্মাদ।

ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম হয়েছে, এখানে সেই উচ্ছাসটা নেই, মন শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে ভরে গেছে। মন শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে ভরে যাওয়ার দরুণ একটা ব্যক্তিত্বে কি ছাপ পড়ে, এই জিনিসটার বর্ণনা করা হচ্ছে। গীতাতে থেকে থেকে দেখা যাবে, বলছেন, এ-রকম হলে কি রকম হয়; যেমন বলছেন, *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*। একবার যদি কারুর এই বস্তু লাভ হয়ে, তখন তার কাছে যে কোন লাভই অতি সাধারণ বলে মনে হবে। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, মিছরির শরবৎ খেলে সে আর চিটে গুড়ের পানা খেতে চাইবে না। তার মানে মিছরির শরবৎ আর চিটে গুড়ের পানাতে যে তফাৎ, ঈশ্বরকে নিয়ে মন ভরে থাকা আর অন্য কোন কিছু দিয়ে মন ভরে থাকাতে ঠিক সেই তফাৎ। ঠাকুর ঈশ্বর প্রেমে এমন ডুবে গেছেন যে, তাঁর কাছে বড় ছোট বলে কোন বোধ নেই।

মাটিতে হাঁটার সময় ঘাস এক রকম দেখায়, তালগাছ আরেক রকম দেখায়। কিন্তু উড়োজাহাজে যাওয়ার সময় উঁচু থেকে তাকালে সব কিছু সমান দেখায়। আর মহাকাশযানে করে যদি মহাকাশে চলে যাওয়া যায়, তখন দূর থেকে পৃথিবীটাকে শুধু একটা blue planet দেখায়, তাছাড়া আর কিছু দেখায় না। আমরা হলাম মানুষের স্বভাবে তৈরী, যে পরিস্থিতিতে আছি শুধু তার খবর নিয়ে আমরা তার মধ্যে ছোট বড় করতে থাকি। স্কুলে পড়ার সময় আমরা এই ছেলে কি করল, সেই ছেলে কি করল, এই ধরণের নানান রকমের জিনিস নিয়ে মাতামাতি করতাম। বাড়িতে এসে সেগুলো বাবাকে যদি বলতাম, বিশেষ করে মাকে যদি বলা হত মা শুনতেনও না, হুঁ হাঁ করে পাশ কাটিয়ে দিতেন, মায়ের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই না। ঠিক তেমনি আজকে আমরা যে জিনিসটাকে মনে করছি বিরাট কিছু, সেই বিরাট কিছুটাই যার মন ঈশ্বরে ডুবে আছে তার মন ওটাতে যাবেই না, তার কাছে ওই বিরাট কিছুটা এতই সাধারণ।

এখানে মাঝে মাঝে আমার মনে একটা খুব interesting ঘটনা নাড়া দেয়। মাস্টারমশাই এখানে লিখছেন ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ কথা – ১৮৫৮, লীলাপ্রসঙ্গ থেকে আমরা জানতে পারছি, ১৮৫৫ থেকে রানী রাসমণী যেদিন মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। ঠাকুরও ওখানে কাজে নিযুক্ত হলেন। সেখান থেকে ঠাকুর ধীরে ধীরে ঈশ্বরে ডুবছেন। তখন হৃদয়রামও এসে গেছে, হৃদয়রাম আসার পরেই ঠাকুর ঠিক ঠিক সাধনা করতে পেরেছিলেন।

১৮৫৭ সালে চানকে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়, যেটাকে আমরা বলি, First war of independence, ইংরেজরা বলে সিপাহী বিদ্রোহ। দক্ষিণেশ্বর আর ব্যারাকপুরের মধ্যে কতটা আর দূরত্ব, অত বড় ঘটনা, যেটাকে আমরা বলছি ভারতের একটা defining moment। যাই হোক সেখানে মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ করলেন, তাঁকে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হল। এই পুরো ঘটনার খবরটা কি সেইভাবে ঠাকুরের কাছে এসেছিল? কতটা আর দূরত্ব, ব্যারাকপুরে ছিল মিলিটারিদের ক্যান্টনমেন্ট, সেখান থেকে শিখ সিপাহীরা নিয়মিত দক্ষিণেশ্বর আসতেন। যে সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা, আর আজকে যখন ভারতের ইতিহাসের কথা আসে, আমরা যাকে বর্তমান ভারত বলছি, তার শুরুই হয় ১৮৫৭ সাল থেকে। ঠাকুর যে আধ্যাত্মিক ক্রান্তি আনছেন, তারও ওই একই সময়, ১৮৫৭ কি ১৮৫৮। ১৮৫৫ সালে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা, আর তার দু-বছর পরেই ঠাকুরের আধ্যাত্মিক বিপ্লবের সাধনা, অন্য দিকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ – সব একই সঙ্গে চলছে। ঠাকুরের জন্ম ১৮৩৬, আর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে ভারতের জন্য নূতন শিক্ষা নীতি নিয়ে এলেন।

এগুলো গুরুত্বপূর্ণ না, গুরুত্বটা হল, হৃদয়রাম যদি বলে থাকে, মামা জানো চানকে কি হয়েছে? ঠাকুর শুনে কি বলবেন। আমরা কোথাও দেখতে পাই না, ঠাকুর এই ঘটনা শুনেছিলেন কিনা, ঠাকুর কোথাও বলছেন না যে, তিনি শুনেছিলেন যে চানকে এই রকম হয়েছিল। এই ভাবটাকেই এগিয়ে নিয়ে ঠাকুর এবার বলছেন –

"উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা বলতুম! কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হত না"। গীতাতে একটা কথা কয়েকবার আসে, সেটা হল '*আর্জবম্*', '*আর্জবম্*' শব্দের অর্থ সোজা বা সরল, মনের মধ্যে যার কোন প্যাঁচ নেই; মনটা একেবারে সরল হয়ে যায়। ঘুরিয়ে একটা যে কথা বলবে, তার জন্য যে শক্তি দরকার, 'আর্জবম্' – মনের সেই শক্তি থাকে না। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে মিষ্টি করে যারা কথা বলতে পারে, তার মানে ওটাতে তাদের মনের অনেক শক্তি লাগাতে হচ্ছে, সেইজন্য এরা আর কোন বড় কাজ করতে পারে না। যাদের আমরা বড় বলে মনে করি, তিনি যে কেউ হতে পারেন, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, এনারা কিন্তু কখন politically correct কথা বলতেন না। যার জন্য আমি প্রায়ই বলি, যদি সাধুকে দেখেন খুব ভদ্র ভাবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে, সাধুকে সন্দেহ করতে হবে। তার মানে, জপধ্যানে ওনার মনের যে শক্তি তৈরী হচ্ছে, সেটা লোকেদের মিষ্টি কথা বলতে গিয়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তাই বলে যে তিনি কাউকে ছোট করবেন, কাউকে অপমানিত করবেন, কক্ষণ না। কারণ spirituality আর inclusiveness এক জিনিস। মা যেমন সন্তানকে ভালবাসে, ঠিক তেমনি, যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনি সবাইকে ভালবাসেন, সমান ভালবাসেন। তাঁদের মধ্যে যিনি তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন, তিনি তাঁকে একটু বিশেষ ভাবে ভালবাসেন। কিন্তু তার মানে এই না যে, অপরকে ছোট করে, কাউকে হেয় করে ভালবাসবেন। ঈশ্বরে মন ওনার এত বেশি একাগ্র হয়ে ডুবে আছে, এতই বেশি ডুবে আছে যে, উনি এর বাইরে অন্য কিছু ভাবতেই পারবেন না।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডের একজন লেখক ছিলেন, উনি একা থাকতেন। রোজ হোটেলে গিয়ে একই টেবিলে, একই মেনু মিটবলসের অর্ডার দিয়ে দিনের পর দিন একই জিনিস খেতেন। একদিন ওনার এক বন্ধু সেখানে এসে গেছেন, লেখককে বলছেন, 'আরে তুমি এই মিটবলস খাচ্ছ? কি বাজে টেস্ট, একেবারেই ফালতু খেতে, কি করে তুমি খাচ্ছ'? লেখকও একটু

মুখে দিয়ে বলছেন, 'তাই তো, সত্যিই খুব বাজে খেতে'। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটারকে ডেকে তার কলার চেপে বলছে, 'তুমি কি আমাকে দিয়েছ, এক্ষুণি সরাও এখান থেকে'। ওয়েটার প্লেটটা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তখন তাঁর বন্ধুটি বলছেন, 'দেখ মিটবলসে কোন দোষ ছিল না, ওটা ঠিকই আছে, তুমি আরেকবার খেয়ে দেখ কোন গোলমাল নেই'। উনিও খেয়ে বলছেন, 'ঠিকই তো কোন গোলমাল নেই; দেখ ভাই তুমি আমাকে এভাবে বোকা বানিয়েছ, তোমার কথাকে আমি পুরো বিশ্বাস করতাম; আজ থেকে আমি তোমার কোন কথাকে বিশ্বাস করব না'। একেবারে বাচ্চার মন।

এই যে ঠাকুর বলছেন, মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, বাচ্চার ষোল আনা বিশ্বাস সে তার দাদা। সাহিত্যিক ভদ্রলোক রোজ এখানে খেয়ে যাচ্ছেন, ওয়েটার বলে দিয়েছে এটা খুব ভাল মিটবল, ওনার কাছে ভাল মিটবল। বন্ধু এসে বলল এই মিটবলের বাজে টেস্ট; বন্ধুই আবার বলছে ভাল টেস্ট, উনিও মানলেন ভাল টেস্ট; মন একটুও সংসারে নেই। আইনস্টাইনকে দেখুন, বড় বড় দার্শনিকদের কথা বলুন, নামকরা সাহিত্যিকদের কথা বলুন, ওনারা নিজের শরীরেই মন দিতে পারেন না, সংসারে কি মন দেবেন। বেশির ভাগ সাধুদের তাই দেখবেন তাঁদের চুল-দাড়ি সব বড় বড়, কেয়ার নিতে পারেন না, তা নাহলে পুরোটাই কামিয়ে ফেলেন, ঝামেলা চুকে গেল। কেশবিন্যাস, চর্মবিন্যাস, স্নো পাউডার মেখে চকচক করবেন, পারবেনই না এসব করতে। সেখানে তাকে মিষ্টি কথা বলা, ওকে দুটো ভাল কথা বলা, তাঁর পক্ষে সম্ভবই না। চাইলেও পারবেন না, কারণ ঈশ্বরকে নিয়ে বা যে কাজে তিনি একাগ্র হয়ে করছেন, সংসারে এনারা একটুও তাকাতে পারবেন না। রাজা মহারাজ বলছেন, সংসারে এক আনা মন রাখলে আর বাকি পনের আনা ঈশ্বরে দিলে কাজের বন্যা হয়ে যায়।

সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, 'কারুকে মানতুম না। বড়লোক দেখলে ভয় হত না'। এটা আরও interesting, আমরা যে সমাজে বাস করি, আমরা জানি এখানে বড়লোক মানে ছোবল মারবে। বড়লোক মানে যেভাবেই বড়লোক হয়ে থাকুক, রাজনৈতিক ভাবে বড়লোক, টাকা-পয়সা দিয়ে বড়লোক। কোথাও এদের সাথে দেখা হলে ভদ্রতার খাতিরে একটা নমস্কার করি। কিন্তু নমস্কার করার সময় মনে মনে একটা প্রত্যাশা থাকে, হে প্রভু ছোবলটা মারবেন না। বড়লোক দেখলে আমরা কুণ্ঠিত হয়ে যাই। এটাকে অন্য ভাবে যদি দেখা হয়, বলেন, সভায় শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন, মনে হচ্ছে যেন সূর্যোদয় হল। বক্তব্য হল, অন্যরা যাঁরা সভায় ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রবেশে সবাই ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। আমাদের একটা স্বভাব হল, বড়লোক, যে অর্থেই হোক, তার কাছে গিয়ে মাথা নত হয়। এখানে বড়লোক বলতে ঠাকুর বলছেন, বাঙালীদের মধ্যে যাদের টাকা-পয়সা আছে বা বড় সরকারী পদে আছে।

তখন ১৮৫৭ বা ১৮৫৮ সাল, সময়টা এখন ঠিক জানা নেই, যাঁদের কথা ঠাকুর বলছেন এনারা তখন সব নামকরা লোক। ঠাকুর বলছেন, **"যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, কর্তব্য কি"**? যার সঙ্গেই দেখা হত, অনেককেই ঠাকুর এই প্রশ্নটা করতেন। আমরা যেমন দেখা হলে বলি, কেমন আছেন, ইংরাজীতে বলি, How do you do। আমেরিকাতে বলে, How is weather। How is weather বলা মানে আমি এখন আপনার সাথে দুটো কথা বলতে চাইছি। তার যদি কথা বলার ইচ্ছা না থাকে তখন ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু একটা বলে দেবে। যদি কথা বলতে চায়, তাহলে আরও দুটো বাক্য বলবে, এগুলো হল একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হলে ভদ্র ভাবে সম্ভাষণ করা। ঠাকুরও সেইভাবে দেখা হলে বলতেন, মানব জীবনের কর্তব্য কি।

"যতীন্দ্র বললে, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন'!

মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী আমরা যা পাই তাতে দেখি, যুধিষ্ঠির সৎ ভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। মানুষ নিজের শরীরকে ভুলতে পারে না, এই শরীরের মাধ্যমে যে ভোগ হয় ভুলতে পারে না। মরার পরেও চায় সে যেন ভোগ করতে পারে, স্বর্গাদিতে যাবে, সেখানে যেন এই শরীর দিয়ে ভোগ করতে পারে। আর মরার পরে যে সূক্ষ্ম শরীর হবে, দেবলোকের যে শরীর হবে, সেটা কিন্তু সে চায় না; এই শরীরেই সে ভোগ করতে চায়। আমাদের শাস্ত্রে এর অনুমতি নেই। বিশ্বামিত্র তাঁর তপস্যার জোরে নহুষকে যখন স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন, তখন ইন্দ্র তাকে স্বর্গ থেকে ফেলে দেন। মহাভারতে দেখানো হচ্ছে, যুধিষ্ঠিরের কি অদ্ভুত চরিত্র, যার জন্য তিনি সশরীরে স্বর্গে চলে যাবেন।

যুধিষ্ঠির সারা জীবন ভাল ভাবে থেকেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু সৎ ভাবে অনেকেই তো জীবনযাপন করেন, তাই বলে সবাইকে তো সশরীরে স্বর্গে যেতে দেওয়া যায় না, এরজন্য অনেক ক্রাইটেরিয়া দরকার। তাই যুধিষ্ঠিরের এখন পরীক্ষা নেওয়া হবে। ধর্মরাজ কুকুর হয়ে প্রথম থেকে হিমালয়ে পাণ্ডবদের পিছন পিছন হাঁটছেন। স্বর্গ থেকে বিমান এসেছে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যুধিষ্ঠির বলছেন, 'কুকুরটাও আমার সঙ্গে যাবে'। তাঁকে বলা হল, 'কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না'। যুধিষ্ঠির বলে দিলেন, 'তাহলে আমিও স্বর্গে যাচ্ছি না, এই পথে যে আমার এতদিনের সঙ্গী তাকে ফেলে আমি একা যাব না'। ধর্মরাজ তখন খুশি হয়ে গেলেন, 'আমি ধর্মরাজ'। সেখান থেকে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বলছেন প্রথমেই তাঁর নরক দর্শন হল।

তিনি দেখছেন তাঁরা ভাইরা সবাই নরকে পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন 'দুর্যোধনরা কোথায়'? 'ওরা ধর্মযুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তাই স্বর্গে চলে গেছে'। যুধিষ্ঠির শুনে হতবাক। তাঁর ভাইরা নরকের ওই পচা দুর্গন্ধ, অসহ্য গরমের মধ্যে পড়ে আছে দেখে তিনি খুব মর্মাহত। ততক্ষণে ভাইরা আর্তনাদ করে বলছেন, 'দাদা তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না, তোমার গায়ের বাতাস আমাদের শীতল করে দিচ্ছে'। যুধিষ্ঠির বলে দিলেন, 'আমি আর স্বর্গে যাব না, এরা আমার ভাই, ভাইদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, এখানেই থাকব। এই ভাইদের সাহায্যেই আমি সব পেয়েছি, আমার উপস্থিতিতে যদি আমার ভাইদের একটু শান্তি হয়, আমি এখানেই থাকব; আমার স্বর্গ লাগবে না'। তখন ধর্মরাজ বলছেন, 'দেখুন আমরা আপনার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম'। যুধিষ্ঠিরের এই যে কার্যকলাপ, এগুলো হল sign of inlusiveness। আপনি কি শুধু নিজের জন্য চান? নাকি যারা আপনার সঙ্গে আছে আপনি তাদের জন্যও চান? তখন যুধিষ্ঠিরকে সত্য ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া হল, 'আপনার সব ভাইরা আগেই স্বর্গে চলে গেছে, এখানে আপনার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল, এবার চলুন'। এই বলে সশরীরে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে অনেক কাহিনী শুরু হয়ে গেল, যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হয়েছিল। এরপর ঠাকুর বলছেন –

"তখন আমার বড় রাগ হল। বললাম, 'তুমি কিরকম লোক গা। যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি– এ-সব কিছু মনে হয় না'। আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধরলে। যতীন্দ্র একটু পরেই 'আমার একটু কাজ আছে' বলে চলে গেল"।

বলা হয় যে, আমাদের মন মাছির মত। মাছির মত কেন? মাছি কখন সন্দেশেও বসে আবার কখন বিষ্টাতেও বসে। মৌমাছি সব সময় ফুলেই বসবে। মনকে ধীরে ধীরে এমন প্রশিক্ষণ দিয়ে যেতে হয় যে, যাতে মন মাছির স্বভাব থেকে মৌমাছির স্বভাবে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আমরা দুর্বল মানুষ; দুর্বল মানুষ মানে, মনের দ্বারা চালিত হওয়া। সবল মানুষ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়। বুদ্ধি মানে, শাস্ত্রে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, গুরু যে কথাগুলো বলে দিয়েছেন বা বেদান্তের মতে বেদান্তের যে কথাগুলো গুরু বলে দিয়েছেন, তার মানে এই নয় যে গুরু উল্টোপাল্টা উপদেশ দেবেন; উল্টোপাল্টা উপদেশ দিলে

হবে না, শাস্ত্রসম্মত যে কথাগুলো গুরু বলে দিয়েছেন, সেই কথাগুলোকে আশ্রয় করে নিজের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ফেলা – এটাকে বলে বুদ্ধি।

মন হল সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক, এই একটা ঝড় এলো, সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে গেল; ঠাকুর ঝড়ের এঁটোপাতার কথা বলছেন, আমাদের মন সব সময় ঝড়ের এঁটো পাতার মত ভাসছে। যখন যে ভাব এলো তখন সেই ভাব নিয়েই আমরা লাফালাফি করতে শুরু করে দিই। এই বাই উঠল এটা করলাম, ওই বাই উঠল ওটা করলাম –এই জিনিসটাকে বন্ধ করতে হবে। যারা শুধু মনের দ্বারা চালিত হয়, এরাই হল দুর্বল মানুষ। মন সব সময় ইমোশানস্‌কে নিয়ে চলে – রেগে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাগের মুখে একটা বাজে কথা বলে দিল। এই আপনি ভালবাসার কথা বললেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাসি ফুটে উঠল। এগুলোই দুর্বল মন, বাচ্চাদের মন এই রকমই হয়। বড় হয়েও যারা বাচ্চা থেকে যায়, এরা হল পাতলা কাচের মত ঠুনকো, ইমোশানালি এরা ঠুনকো, একটু কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভেঙে গেল। এগুলোই দুর্বল মনের লক্ষণ, তার মানে, যারা পুরোপুরি মন দিয়ে চলে, এরা হল দুর্বল মানুষ। যারা বুদ্ধি নিয়ে চলে, এরা হল সবল।

দুর্বল মানুষরা কি করে? যাঁরা মনীষী, সত্যিকারের ভাল মানুষ, ওনাদের কি কি খুঁত আছে সেগুলোকে আগে বার করবে। মানুষ নিজেকে অপরাধী বলে মানতে চায় না, মানুষ যদি মনে করে আমি দোষ করেছি, এবং দোষ মেনে নেয়, ওর মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। পাপ বোধ যদি কারুর মধ্যে এসে যায়, তার মাথাটা নত হয়ে যায়। বাচ্চাদের দেখবেন, বাড়িতে যদি কিছু ভেঙে ফেলে, ও জানে যে মা ঠিক ধরে নেবে। মার কাছে যখন আসবে তখন এমন অপরাধ বোধ করে যে, মাথাটা নীচু করে আসবে। আমরাও যখন নিজের কাছে সত্যিকারের অপরাধ বোধ হয়, মাথা নত হয়ে যায়। মন থেকে আমি আপনি যদি ঠিক ঠিক বুঝে নেন ঠাকুর শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অপরাধ বোধ এসে যাবে। আমরা এটাকে কিভাবে নিই? ঠাকুর অবতার ছিলেন, তাঁর মত কি হওয়া যায়, কখন কি সম্ভব! আচ্ছা ঠাকুরের মত হওয়া যাবে না, মানলাম। তাহলে বেলুড় মঠের যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁদের মত তো হওয়া যায়? ওরে বাবা, ওনারা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, ওনাদের মত কি কখন হওয়া যায়! আমরা ফট্ ফট্ করে compromise করে নিচ্ছি, আপনি এটা ভালর দিক থেকে বলুন, দোষের দিক থেকে বলুন, কিন্তু একটা compromise বার করে নিলাম।

এবার ভগবান বুদ্ধের কথা এলো, যারা আরও নিন্দুক, তারা কিভাবে বলবে? 'রাখুন ভগবান বুদ্ধ, নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল'। রাজনীতি থেকে শুরু করে বর্তমান কালের বিভিন্ন ক্ষেত্রের লোকেদের যখনই নিন্দা করে, প্রথমেই বলবে – ও তো এই রকমই। আরে ভাই ওর যে আরও ভাল হাজারটা কাজ আছে, তোমার কি কিছু আছে? বড়দের যখন নীচে নামিয়ে নেওয়া হয় তখন মনে হয় – ওরা উঁচু সিড়িতে উঠেছিল কিনা, নীচে নামিয়ে দিয়েছেন, এবার আপনার সমান সমান হয়ে গেল। কারণ আপনি কক্ষণ কাউকে বড় দেখতে পারবেন না। হয় বড়কে নীচে নামিয়ে দিতে হবে, তা নাহলে বলতে হবে তাঁর মত হওয়া যাবে না।

আর এর কি ফল? I am the best। মানুষ যেমনি মনে করবে I am second best, ও পাগল হয়ে যাবে। Second best বলে কক্ষণ নিজেকে নিতে পারবে না, বলবে I am the best। ঠাকুরের কথা আনুন, ভগবান বুদ্ধের কথা আনুন, তখন বলবে, ওনারা ভগবান ওনাদের মত কি কখন হওয়া যায়! ঠিক আছে তাহলে নেতাজীর মত হও। সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর নামে একটা দোষ বার করে দেবে। কোন বাঙালীর কাছে গান্ধীজীর নাম বলুন, একশ খানা গান্ধীজীর নামে গালাগাল বার করে দেবে। কারণ বাঙালী মানেই চলছে চলবে, সব সময় হিংসাত্মক আন্দোলন। গান্ধীজীর মধ্যে ওটা একেবারেই ছিল না, বাঙালীর আবার এটা চলবে না।

যতীন্দ্র ঠিক এই জিনিসটাই করছেন। অস্বাভাবিক যে কিছু করছেন তা না, আমরা সবাই দিনরাত এটাই করছি। ঠাকুরকে আমরা অবতার মানি, দেখবেন কথামৃতে আসবে – একজনের কথা হচ্ছিল, ঠাকুর বলছেন, শোনার পর আমি ভয় পেলুম, ভাবলুম সে বুঝি অনেক এগিয়ে গেছে। ঠাকুরের যে ব্যক্তিত্ব সেটা একজন ভক্তের ব্যক্তিত্ব, সেখানে তার মন একটু অন্য রকম, মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা আমার মত কাউকে দেখেছ? এই জগতে যিনিই থাকবেন, এই স্বভাব তাঁর থাকতে বাধ্য। একটু সাধন-ভজন করে করে যখন অন্য রকম হয়ে যায়, একটা কিছু যখন উপলব্ধি হয়ে গেল, ওটাই তখন তাঁকে বিনয়ী বানিয়ে দেয়। ঠাকুর অবশ্য মাস্টারমশাইকে যে বলছেন, আমার মত কাউকে দেখেছ কিনা, ওটা বোঝানর জন্য বলছেন যে, তুমি এখানেই ধরে থাক; নিজের অন্তরঙ্গ তৈরী করবেন বলে।

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লিতে অনেক ধরণের গোলমাল চলছিল। ওর মধ্যে অনেক সুফি ছিলেন। অনেক সময় সুলতান সুফিদের ডেকে পাঠাত, ওনার যেতেন না, পাত্তাই দিতেন না। তুমি শুধু দিল্লির বাদশা, আমি একমাত্র আল্লার কথা শুনি, যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাদশা। একবার সুলতান কোন এক সুফির সাথে দেখা করতে গেছে। সুলতান আসছে শুনে সেই সুফি দেওয়াল টপকে সেখান থেকে পালিয়ে গেছেন, দেখাই করতে চাইছেন না। এটা অন্য একটা ভাব। এই দুই ধরণের মানুষ এভাবেই ব্যবহার করেন। কিন্তু ঠাকুর কাউকে আঘাত দিতে চাইছেন তা না, তিনি চাইলেও স্বাভাবিক আচরণ করতে পারছেন না। তুমি ধর্ম জিনিসটাকে নিয়ে এসে যুধিষ্ঠিরকে ছোট করে দিতে চাইছ, সাথে সাথে তাঁর সব কিছুকে ছোট করে দেওয়া?

"অনেকদিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিছলাম। তাকে দেখে বললাম, 'তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না, কেননা, সেটা মিথ্যাকথা হবে'।

কারণ এই যে সুফিদের কথা বলা হল, ওনারা সুলতানের সাথে দেখা করতে চাইছেন না, কেন না, রাজা একমাত্র ঈশ্বর। আমাদের মনের ভিতর যে অপূর্ণ কামনা-বাসনাগুলো রয়েছে, টাকা-পয়সা, সৌন্দর্য, এই জিনিসগুলির প্রতি যে আকর্ষণ থেকে গেছে, ফলে কি হয় যাদের কাছে এগুলো থাকে তাদের দেখে একটু হিংসা হয় ঠিকই, আবার অন্য দিকে মাথাটাও নত হয়ে যায়, আমি যেটা পারলাম না, উনি পারলেন; এই ভেবে মাথাটা নত হয়ে যায়। কিন্তু একজন আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই না।

স্বামীজীও যখন দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সব জায়গায় মাথা উঁচু করে ঘুরতেন, কিন্তু কাউকে ছোট করছেন না। একটা সেলুনে চুল কাটতে গেছেন, সেখান থেকে তাঁকে বলে দিল, Negros are not allowed। স্বামীজী সেখান থেকে চলে এলেন, উনি বলছেন না যে, আমি নিগ্রো নই। পরে যখন স্বামীজীকে বলা হল, 'আপনি তো বলে দিতে পারতেন, আমি নিগ্রো নই'। স্বামীজী তাঁকে বলছেন, 'আমি কাউকে ছোট করে বড় হতে আসিনি'। যেমন তিনি বড়কে বড় মানছেন না, তেমনি ছোটকেও ছোট মনে করছেন না। আমরা এই জায়গাতেই ভুল করে থাকি। এই যে আমরা একটা উদাহরণ দিলাম – আরে ওকে আমি জানি, ও কিছু না। অন্য দিকে যে ছোট আছে, তাকে বলবে না যে একজন সাধারণ, বলবে ওকে তো জানি অনেক দিন আগেই গোল্লায় গেছে, ওর জন্য এটাই ঠিক। কিন্তু ঠাকুর স্বামীজীর মত পুরুষদের হল সমদৃষ্টি, বড়কে বড় দেখেন না, যাকে আমরা ছোট বলে গণ্য করি, তাকে ওনারা ছোট বলে কখনই মনে করবেন না।

শঙ্করাচার্য্য আর চণ্ডালের গল্প, চণ্ডাল মাংসের ভাড় নিয়ে যাচ্ছে, কাছে আসতেই আচার্য বলছেন, *দূরম্ অপসর রে চণ্ডাল*, চণ্ডাল তুমি দূরে সরে যাও। শিব চণ্ডাল হয়ে আচার্যকে একটা শিক্ষা দিতে এসেছেন, এটাই আচার্যের জন্য একটা শেষ শিক্ষা, খুব নামকরা গল্প। স্বামীজীর সাথে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের মহাসমাধির পর ভারত পরিক্রমায় পায়ে হেঁটে স্বামীজী মথুরা বৃন্দাবনের

রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন। যেতে যেতে রাস্থার ধারে একটা জায়গায় দেখছেন একজন লোক তামাক খাচ্ছে। লোকটির তামাক খাওয়া দেখে স্বামীজীরও তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। লোকটির চালায় ঢুকেছেন, তামাক খেতে চাইলেন। লোকটি বলছে, আমি ভাঙ্গি। শুনে স্বামীজী ওখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। অনেক দূর যাওয়ার পর ওনার মনে পড়ল – আমি এটা কি করলাম, আমি তো সন্ন্যাসী, আমার কাছে ব্রাহ্মণই বা কি আর ভাঙ্গিই বা কি, আমার কাছে কিসের জাতধর্ম! আবার উনি পুরোটা পথ ফিরে এলেন। লোকটি আবারও বলল, 'আমি তো বললাম, আমি ভাঙ্গি'। 'না তুমি দাও'। স্বামীজী ওই হুঁকোতেই তামাক খেলেন। সবাই সমান – এই জিনিসটাকে থিয়োরেটিক্যালি মনে করা আর অনুশীলনে আনা, একটু তফাৎ থেকে যায়। এটাই ঠাকুর বলছেন, তোমাকে রাজা বললে মিথ্যাকথা বলা হবে। তারপর ঠাকুর বলছেন –

"আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলাম, সাহেব-টাহেব আনাগোনা করতে লাগল। রজোগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠানো হল। সে বলে পাঠালে, 'আমার গলায় বেদনা হয়েছে'।

এই সেই যতীন্দ্র, যাকে আগে ঠাকুর যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন নিয়ে বলাতে অনেকগুলো কথা বলেছিলেন। যতীন্দ্র বিরক্ত হয়ে গেছেন। ঠাকুর যেমন হক্ কথা বলছেন, অন্য দিকে সেও বড়লোক, সেও কাউকে গ্রাহ্য করতে পারবে না। আপনি যদি কাউকে এ-রকম ছেড়ে দেন, সেও আপনাকে আর পাত্তা দেবে না। ঠাকুরের যে যতীন্দ্রের প্রতি কোন আক্রোশ আছে তা না। একটা কথা বলল, ঠাকুর তার জবাবে কিছু কথা শুনিয়ে দিলেন, এর বেশি কিছু না।

"সেই উন্মাদ অবস্থায় আর একদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম, জয় মুখুজ্জে জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম"।

অন্যমনস্ক যে জপের জন্য তা না। ঠাকুরের মত লোক যদি যে কোন লোককে দেখেন অন্যমনস্ক, ওটাতে আপত্তি করবেন। মনুস্মৃতিতে খুব পরিষ্কার করে বলছেন, আমাদের যে বিভিন্ন অঙ্গগুলি আছে, সেগুলোকে নিয়ে বলছেন, হস্তচপল, পদচপল, নেত্রচপল ইত্যাদি। যাদের সব সময় হাত কচলানো, কখন পকেটে হাত দিচ্ছে, কখন মাথায় হাত রাখছে, হাত নাড়িয়েই যাচ্ছে, আর তার সাথে পা নাড়া, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়া, এদের মনটা চঞ্চল, চঞ্চল চিত্ত, এদেরকে কোন ভাবেই ভরসা করা যায় না। এখানে যে জপের জন্য এই রকম করছেন তা না, যে কোন মানুষকে যদি দেখা যায়, তার হাত সব সময় নড়ছে, পা নাড়ছে, ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছে, এদের মনটা চঞ্চল, মনের এই চাঞ্চল্য দেখে ঠাকুরের বিরক্ত বোধ হবে, যে কোন সাধু বিরক্ত হয়ে যান।

আমাদের একজন মহারাজ এক বড় ব্যবসায়ীর কাছে ডোনেশান নিতে গিয়েছিলেন। সেখানে মহারাজের সামনে বসে ভদ্রলোক কেবলই পা নেড়ে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ what nonsense বলে বিরক্ত হয়ে উঠে বেরিয়ে চলে গেলেন, ডোনেশান নিলেনই না। কি করে এই ধরণের লোকের কাছে টাকা নেব, যার এতটুকু নিয়ন্ত্রণ নেই! চঞ্চল মনের জন্য এগুলো একটা রোগ হয়ে যায়।

"একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছে। কালীঘরে এল। পূজার সময় আসত আর দুই-একটা গান গাইতে বলত। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইল।

"হলধারীকে বললাম, দাদা এ কি স্বভাব হল! কি উপায় করি, তখন মাকে ডাকতে ডাকতে ও-স্বভাব গেল"।

মন এত বেশি ঈশ্বরে পড়ে আছে, তখন ইনি রাসমণী, আমি ওনার কর্মচারী, এগুলোর ব্যাপারে কোন হুঁশ নেই। কিন্তু এই করে তো সমাজ জীবন চলে না। তখন মাকে প্রার্থনা করে করে ওনার এই ব্যাপারের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ল। তারপর বলছেন –

"ওই অবস্থায় ঈশ্বরকথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনলে বসে বসে কাঁদতাম। মথুরবাবু যখন সঙ্গে করে তীর্থে লয়ে গেল, তখন কাশীতে রাজাবাবুর বাড়িতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মথুরবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি, রাজাবাবুরাও বসে আছে। দেখি তারা বিষয়ের কথা কইছে। এত টাকা লোকসান হয়েছে – এই সব কথা। আমি কাঁদতে লাগলাম, বললাম 'মা, কোথায় আনলে। আমি রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম, তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা। কিন্তু সেখানে(দক্ষিণেশ্বরে) তো বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই"।

ওই সময় ঠাকুর পুরো প্রেমোন্মাদে ঈশ্বরের ভাবে ডুবে আছেন, তখন একটু কোন বিষয়ের কথা হলেই বিরক্তি লাগবে, ঠাকুর বিষয়ের কথা নিতে পারতেন না। মথুরবাবু তাঁকে ট্রেনে কাশী নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা বিষয়ের কথা বলছেন, ঠাকুর নিতে পারছেন না। ছোট শিশু সে মায়ের কাছে নেই, মায়ের জন্য কান্নাকাটি করছে। তখন তাকে আপনি যতই খেলনা দিন, খাবার দিন সব কিছুতেই তার বিরক্ত লাগবে। আমাদের মনও যখন কোন কিছু নিয়ে ডুবে থাকে, সেখানে যদি অন্য রকম কথা হয়, আমরা বিরক্ত হয়ে যাই। ঠাকুরের মন পুরো ঈশ্বরে ডুবে আছে, শুধু যে ঈশ্বরে ডুবে আছে তা না, পরে আমরা দেখব, মাস্টারমশাই ছেলেদের চরিত্র নিয়ে নরেনের সাথে কথা বলছেন, সেখানেও ঠাকুর জোর আপত্তি করছেন। এখানে মূল কথা হল, ঠাকুর তাঁর পুরনো দিনের কথা বর্ণনা করছেন, ঠাকুর নিজের সাধনার প্রথম অবস্থার কথা বলছেন – যখন তাঁর প্রেমোন্মাদ হয়েছিল তখন তাঁর আচার-আচরণ কেমন হয়ে গিয়েছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কীর্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে – নরেন্দ্রকে আলিঙ্গন

চতুর্থ পরিচ্ছেদে সাধনার কালে ঠাকুরের যে প্রেমোন্মাদের অবস্থা হত এবং আরও কি কি অবস্থা হত তার কিছু চিত্রণ পেলাম। পরে সাধন কালের আরও অনেক অবস্থার বর্ণনা ঠাকুর করবেন।

১৬ই অক্টোবর, ১৮৮২ সাল। সেদিন বেশ কয়েকজন ভক্ত আছেন, বিশেষ করে নরেন আছে। নরেন আর মাস্টারের পরিচয় আগে হয়ে গেছে। আজকে আরও বেশি কথাবার্তা হচ্ছে। ঠাকুর তাঁর আগে আগে যে প্রেমোন্মাদের অবস্থা হত সেই নিয়ে অনেকগুলো কথা বলেছেন। কথা বলতে বলতে এবার বিকাল হয়ে গেছে। নরেন্দ্র এক এক করে অনেকগুলো গান করছেন। সেখানে রাখাল, লাটু, মাস্টার, নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু প্রিয়, হাজরা সকলে আছেন। আপনার হয়ত জানবেন নরেন্দ্র আগে বাংলা গান জানতেন না, ঠাকুরের কাছে আসার পর থেকে একটা একটা করে বাংলা গান ধরতে শুরু করেছেন। প্রথমে নরেন্দ্র গাইছেন, 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন'। এই গানগুলো আপনারা কথামৃতের গানের যে ক্যাসেটা আছে তাতে নিশ্চয় শুনে থাকবেন। তারপর গাইছেন 'সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে', এরপরে গাইছেন 'আনন্দবদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম'।

"খোল করতাল লইয়া কীর্তন হইতেছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্তন করিতেছেন"। ভক্তেরা ঠাকুরকে ঘিরে রেখেছেন। ওর মধ্যে ঠাকুরও নৃত্য করছেন, বাকিরাও নৃত্য করছেন। ভাবলে অবাক লাগে, আমরা যখনই স্বামীজীর ছবির কল্পনা করি, স্বামীজীর ভাব কল্পনা করি, যিনি সিংহের মত বেদান্তের হুঙ্কার দিচ্ছেন, সেই স্বামীজী নরেন রূপে এখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে ঘিরে

নৃত্য করছেন। **"কখন গাহিতেছেন, 'প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন'। আবার কখন গাহিতেছেন 'আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম'।**

"কীর্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বারবার আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন, 'তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে'!!!

ঠাকুরের মন সব সময় ঈশ্বরে ডুবে থাকে। এর আগে একবার আমরা আলোচনা করেছিলাম, কিভাবে ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব তিনটে স্তরে থাকত। চৈতন্য মহাপ্রভুও তিনটে স্তরে থাকতেন। আসলে আমাদের সবারই ব্যক্তিত্ব তিনটে স্তরে থাকে। কিন্তু তিনটে স্তরে আমরা সচরাচর সহজে যেতে পারি না, যেভাবে ঠাকুর অনায়াসে তিনটে স্তরে চলে যাচ্ছেন – অন্তর্দশা অর্থাৎ সমাধিস্থ, মন তখন ঈশ্বর চিন্তায় ডুবে রয়েছে, দ্বিতীয় অর্ধবাহ্যদশা, যখন কীর্তনাদি করছেন আর বাহ্যদশা, যখন ভক্তদের সাথে ঈশ্বরীয় কথা বলছেন। এই তিনটে ব্যক্তিত্ব আমাদেরও রয়েছে – গভীর ধ্যানে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদেরও রয়েছে, গভীর ধ্যান থেকে আরও গভীরে চলে গেলে এটাই সমাধি হয়ে যায়, সেই ক্ষমতা আমাদেরও রয়েছে আর খোল করতাল সহ নৃত্য করে ভগবানের নাম করার ক্ষমতা আমাদের সকলেরই রয়েছে। ইদানিং যে চারিদিকে পপুলার 'ভাগবত কথা' হয়, এই 'ভাগবত কথা'র কথা এখানে বলা হচ্ছে না, এটা আপনাদের মত লোকের কথা বলা হচ্ছে, যাঁরা এখন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকার এই জিনিসগুলোকে অনেকটা বোঝেন।

স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে এসে চেন্নাইতে একটা সভাতে লেকচার দিচ্ছেন, সেখানে সব অধ্যাপকরা আছেন। স্বামীদের তাঁদের বলছেন, তোমরা হলে গোঁফওয়ালা সব শিশু; আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তোমরা সব শিশু। আমাদের একটা ধারণা যে, সংস্কৃত জানে মানে সে শাস্ত্র জানে। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বড় বড় সংস্কৃতের পণ্ডিতরা আছেন। একবার তাঁদের সাথে কথায় কথায় আমি বললাম, 'সংস্কৃত জানলেই যে শাস্ত্র জেনে যেত, তাহলে যত বাঙালী রিক্সাওয়ালা আছে, ওরা সবাই কথামৃতের ব্যাখ্যা করে দিত'। একটা ভাষার জ্ঞান আর শাস্ত্রকে জানা, শাস্ত্রকে বোঝা, দুটো পুরোপুরি আলাদা জিনিস। এমনকি ঠাকুরও বলছেন, ঈশ্বরে প্রেম হলেই হল, সংস্কৃত নাই বা জানলাম। ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরজ্ঞান, এর সাথে সংস্কৃতের কোন সম্পর্ক নেই। সংস্কৃতে আপনার শাব্দিক জ্ঞান হতে পারে। সাধারণ মানুষের এই জ্ঞানটা হয় না। ফলে এই কথাগুলো ক্লাশে বসেই হোক, ইউটিউবেই হোক, প্রথম যখন শুনবে তখন কথাগুলো সে নিতে পারবে না, মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে মন দিয়ে, কান দিয়ে কিছুই নিতে পারবে না কি বলছে। প্রথমে একটা দুটো কথা শুনল, আর আধ্যাত্মিক মনোরঞ্জনকারী বক্তারা মাঝখানে একটা চুটকি কি একটা কাহিনী বলে দিল। সেটা শুনে সবাই বলে, 'আঃ কি সুন্দর বলে'। আর তার সাথে পারলে বক্তা নিজে একটু নাচবে ও শ্রোতাদেরও নাচিয়ে দেবে।

ঠাকুর যে এখানে যে নৃত্য করছেন, তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা যে নৃত্য করছে, এই জিনিস পুরো আলাদা, কারণ এখানে ঈশ্বরের চেতনা টগবগ করছে। ভাগবত শুনতে শুনতে শ্রোতারা যে নৃত্য করে? তাদেরও ওটা থাকে। কিন্তু সেখানে সাময়িক একটা উদ্দীপন। ওখানে ঈশ্বরীয় ভাবকে বুঝে বা শাস্ত্রকে বুঝে যে ঈশ্বরে মন যাচ্ছে, তা না। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে নিয়ে একটা নামকরা ঘটনা আছে। ইংরেজদের থেকে আমেরিকা স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর তিনি আমেরিকায় ছিলেন। তিনি একটা ঘটনা বর্ণনা করছেন। ওনার সময় একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ছিলেন। সেই সময় মাইক্রোফোন ছিল না, গলার জোর বাড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিতে হত। সেই কারণে আগেকার দিনের বক্তাদের ভাল গলা থাকতে হত, কারণ মাইক ছিল না। বক্তা হলেই হবে না, গলাতে জোর থাকা চাই যাতে দু-হাজার লোক তার কথা শুনতে পায়।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বর্ণনা করছেন, কিভাবে ওই লোকটি একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রায় কুড়ি হাজার শ্রোতাদের সামনে খোল জায়গায়, যা কিনা দু-কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, সেখানে তিনি লেকচার দিচ্ছেন। বেঞ্জামিন সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখছেন সব জায়গা থেকে তার গলার আওয়াজ সমান ভাবে শোন যাচ্ছে,

গলার এতটাই জোর। আর এত তার উদ্দীপনাময় ভাষণ যে, শ্রোতাদের মনটাকে টেনে তার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই ধর্মযাজকের লেকচার দেওয়া দেখে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীন এত মুগ্ধ হয়ে গেছেন যে তিনি দান করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর পকেটে তখন কোন টাকা নেই। একজন পরিচিত ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিল, তাকে গিয়ে বললেন, 'আমাকে দুটো ডলার দেবেন'? ভদ্রলোক বেঞ্জামিনকে বলছেন, 'মশাই আপনি এখন হিপনোটাইজ্ হয়ে আছেন, আপনাকে এখন ডলার দেব না, কারণ ওই ডলারটা আপনি এই ধর্মযাজককে দেবেন। সভাটা শেষ হয়ে যাক, কিছুক্ষণ পরে আপনাকে দুটো ডলার দিয়ে দেব'। এটাকেই বলে জনসম্মোহনী, সবাইকে সম্মোহিত করে দিচ্ছে, শুধু ভাষণ দিয়ে। এত শক্তি যে পুরো অডিয়েন্সকে ক্যাপচার করে নিচ্ছেন। উনি বেঞ্জামিনকে শেষ পর্যন্ত টাকা দিলেন না।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন মজা করে এই ঘটনাটা লিখতে গিয়ে বলছেন, গলার আওয়াজ, বলার মধ্যে এত শক্তি। আমাদের এখানে যখন গানবাজনা হয়, যখন ভাগবতপাঠ আদি হয়, তখন ঠিক এই রকমই হয়; একটা আবেগঘন উদ্দীপন এসে যায়, যার সামনে যুক্তি তর্ক আর কোনটাই দাঁড়াতে পারে না, এগুলো সব পিছনে চলে যায়। কম্যুনিস্টরা বলে, ধর্ম হল আফিং, ঠিক কথাই বলে। এই ধরণের জিনিসগুলোই আফিং, মনটাকে মত্ত করে দেয়। বড় বড় লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে কিছু বুঝতে পারে না, ফলে যেখানে একটু ইমোশানালিজম্ পেয়ে গেল, সেখানে নিজেকে ঢেলে দেয়।

ঠাকুরের এই যে তিনটে অবস্থা, যেটা আমাদেরও হতে পারে, এই যে অর্ধবাহ্যদশা, এটাই কীর্তনাদিতে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা ভক্ত, কথামৃত পড়ছেন, কথামৃত শুনছেন, আরও অনেক কিছু পড়ছেন শুনছেন, এটা আশা করা যায় যে, তাঁদের সহজে আর ইমোশানালিজম্ হবে না। তা সত্ত্বেও যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটা দুর্ভাগ্য যে এতদিন আমাদের ক্লাশগুলো শোনার পরেও আপনি ইমোশানালিজম্ থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেননি।

আমাদের প্রধান সমস্যা হয় বাহ্যদশাকে নিয়ে। বাহ্যদশাতেও সব সময় যে ঈশ্বরীয় কথা হবে, সেটা আমাদের হয় না। আমরা ওই মাছির মত, কখন ঈশ্বরীয় কথাও হল, পরে পরেই আবার রাজনীতিতে ইদানিং কি হচ্ছে, কি হচ্ছে না, সেটাও হল। আর পাড়াতে কে কি করছে এই আলোচনাতে আমরা বেশি রস পাই। বাহ্যদশায় আমাদের নিয়ন্ত্রন নেই, এই নিয়ন্ত্রণ না থাকাতে অর্ধবাহ্যদশা মন দিয়ে হয় না, আর অন্তর্দশার তো কোন প্রশ্নই নেই। এখানে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশার কথা বলছেন না, কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, যখনই ঠাকুর কীর্তন করতেন তখন অর্ধবাহ্যদশায় ঈশ্বরে তাঁর মন ডুবে যেত। এখানে কোন ইমোশনালিজম্ নেই, পুরোপুরি ঈশ্বরে ডুবে আছেন।

ঈশ্বরে ডুবে থাকাটা ঠাকুরের স্বভাব, সেইজন্য তাঁর মনে একটা যেন কৃতজ্ঞতার ভাব আসছে, নরেনকে বলছেন, তুমি আমায় যে আনন্দ দিলে! এখানে নরেনের প্রাণঢালা গান, প্রাণ দিয়ে গাইছেন। কবিতা লেখার সময় শব্দগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রাণঢেলে যখন কবিতা লেখা হয়, সেই কবিতাগুলো পুরো আলাদা। কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, এখানে শব্দের খেলা নাকি প্রাণঢালা আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লেই এই জিনিসটা খুব ভাল করে বোঝা যায়। এরপর মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন –

"**আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে**"। ঠাকুরের এই জিনিস নিয়মিত হত, মাস্টারমশাই অতটা এখনও দেখেননি বলে এ-ভাবে বলছেন। অক্টোবর মাসের বিকাল চারটা কি পাঁচটা, আমরা ধরে নিচ্ছি দু-তিন ঘন্টা হয়ত গান হয়েছে। মাস্টারমশাই এবার বলছেন, রাত আটটা হয়েছে। বলছেন, "**তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া একাকী বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন। উত্তরের লম্বা বারান্দায় আসিয়াছেন ও দ্রুতপদে এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত পাদচারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, 'তুই আমার কি করবি'?**

"মা যার সহায় তার মায়া কি করতে পারে। এই কথা কি বলিতেছেন"? মাঝে মাঝে মাস্টারমশাই নিজের ব্যাখ্যা দিতেন। এখানেও তাই হচ্ছে। ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের দিক দেখার সময় দু-তিনটে কথা মনে রাখতে হয়। যেমন একটু আগে বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্বাহ্যদশার কথা বলা হল; ঠিক তেমনি ঠাকুর একজন গ্রামের লোক, তিনি এখন শহরে এসে বাস করছেন, শহুরে সংস্কৃতিও কিছুটা প্রবেশ করেছে, তার সঙ্গে ঠাকুর একজন সিদ্ধপুরুষ – এই তিনটে ভাব। কথামৃত পড়তে গিয়ে আমরা অনেক গ্রামের উপমা দেখছি, গ্রাম্য শব্দগুলি পাচ্ছি আর তার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বাস করতে এসে যে জিনিসগুলো শিখেছেন, সেগুলো পাচ্ছি; সাধুদের কাছ থেকে নানান রকমের কথা শুনেছেন, সেগুলো আছে আর ওনার নিজের যে উপলব্ধি। তৃতীয় দিকটা হয়, ঠাকুর অবতার আর তার সঙ্গে ঠাকুর একজন সাধুপুরুষ।

এই যে একাধারে নানান রকমের ব্যক্তিত্ব, এই জিনিস সবারই থাকে। যেমন শ্রীরামচন্দ্র, তিনি ভগবান, তিনি আবার এক ক্ষত্রিয় রাজা; তাঁর ব্যবহার এই ক্ষণে ভগবানের মত আবার এই ক্ষণে ক্ষত্রিয় রাজার মত। শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ভগবান, তিনি আবার রাজনীতিতেও আছেন; এই তিনি ভগবানের মত কথা বলছেন, আবার এই তিনি রণনীতি ঠিক করছেন। যীশু খ্রীষ্টও তাই, এই তিনি ভগবান আবার এই তিনি একজন ভক্ত। ঠাকুরও বলছেন, এর ভিতরে দুই আছে – এক তিনি আর তাঁর ভক্ত। এখন তিনি যে কথাগুলো বলছেন, এখানে তাঁর ভক্ত হয়ে কথা বলছেন। এটা হল, অর্ধবাহ্যদশা থেকে কিভাবে তিনি হয় অন্তর্দশা নাহলে বাহ্যদশায় যাচ্ছেন। এখানে যেটা বলছেন, 'তুই আমার কি করবি', যিনি চৈতন্যের সঙ্গে এক তাঁকে মায়া কি করতে পারবে, প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু ঠাকুর যখন পুরো বাহ্যদশায় চলে আসছেন, তখন তিনি এক ভক্ত। সেই ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি বলছেন, মা আমার সঙ্গে আছেন, তুমি কি করবে আমার! আমরাও যখন সংসারের মধ্যে থাকি আমরা এটা মনে রাখি যে, মা দেখছেন। আগেকার দিনে আমাদের বড় বড় নামকরা মহারাজরা যখন কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন ওনারা মায়ের মন্দিরের সামনে গিয়ে, স্বামীজীর মন্দিরের সামনে গিয়ে, ঠাকুরের মন্দিরের সামনে গিয়ে ওনাদের সাক্ষী রেখে সব কিছু করতেন। ভক্তের এটাই স্বভাব।

"নরেন্দ্র, মাস্টার, প্রিয় রাত্রে থাকিবে। নরেন্দ্র থাকিবেন; ঠাকুরের আনন্দের সীমা নাই"। ঠাকুরের প্রচণ্ড আনন্দ, এনারা তিনজন থাকবেন, বিশেষ করে নরেন্দ্র রাত্রে থাকবে, ঠাকুরের খুব আনন্দ হচ্ছে। এই ধরণের একটা ছেলেমানুষী ভাব সবারই থাকে। বাড়িতে কোন অতিথি এসেছেন, তিনি রাতে থাকবেন শোনার পর আমাদেরও ছোটবেলা খুব আনন্দ হত।

"রাত্রিকালীন আহার প্রস্তুত। শ্রীশ্রীমা নহবতে আছেন। রুটি ছোলার ডাল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভক্তেরা খাইবেন বলিয়া পাঠাইয়েছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন; সুরেন্দ্র মাসে মাসে কিছু খরচ দেন"। দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে ঠাকুর যা মাইনে পেতেন, তাই দিয়ে কোনমতে নিজের খরচটুকু চলত। সুরেন্দ্র কিছু টাকা দিতেন বলে ভক্তদের সেবা আদি চলত।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা ধরে নিতে পারি রাত নটা হবে। ঘরের পূর্বদিকের দরজার ধারে এখন নরেন্দ্রাদি গল্প করছেন। 'নরেন্দ্রাদি' মানে অনেকে মিলে গল্প করছেন। খুব নামকরা ঘটনা।

"নরেন্দ্র – আজকাল ছোকরারা কিরকম দেখছেন?

মাস্টার – মন্দ নয়, তবে ধর্মোপদেশে কিছু হয় না।

নরেন্দ্র – নিজে যা দেখেছি, তাতে বোধ হয় সব অধঃপাতে যাচ্ছে। বার্ডসাই, ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুল পালানো – এ-সব সর্বদা দেখা যায়। এমন কি দেখেছি যে, কুস্থানেও যায়।

মাস্টার – যখন পড়াশুনা করতাম, আমরা তো এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই।

নরেন্দ্র – আপনি বোধ হয় তত মিশতেন না। (নরেন যে কাদের সাথে মিশতেন ভগবান জানেন) **এমন দেখেছি যে, খারাপ লোকে নাম ধরে ডাক, কখন আলাপ করেছে কে জান!**

মাস্টার – কি আশ্চর্য!

নরেন্দ্র – আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিবাকরা এ-সব বিষয়ে দেখেন তো ভাল হয়"।

নরেন রীতিমত খবর রাখতেন। আমরা অনেক সময় ভাবি এনারা অন্য ধরণের, ও-সব কিছু না, সব কিছু আমাদের মতই, সেখান থেকে হঠাৎ অন্য রকম হয়ে যান।

এই কথা ১৮৮২ সালে হয়েছিল, আজকে ২০২২; আমরা যখন বর্তমান ছেলেদের কথা বলব, এই একই কথা বলব। স্বামীজী যখন এই কথাগুলো বলছেন, তখন উনি ঊনিশ-কুড়ি বছরের একজন যুবক। কিন্তু তাঁর মানসিক পরিপক্কতা এমন হয়ে গেছে যে, ইতিমধ্যে একটা জেনারেশান গ্যাপ তৈরী হয়ে গেছে। প্রত্যেক প্রজন্মের কাছে মনে হয়, আমরা ভাল ছিলাম, এই প্রজন্ম গোল্লায় গেছে।

"**এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাদের কাছে আসিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, 'কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে'? নরেন্দ্র বলিলেন, 'এঁর সঙ্গে স্কুলের কথাবার্তা হচ্ছিল। ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না'। ঠাকুর একটু ওই সকল কথা শুনিয়া মাস্টারকে গম্ভীরভাবে বলিতেছেন,** (যেটা আলোচনা করার জন্য আমরা এতটা বললাম), '**এসব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়। তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ-সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না'। (নরেন্দ্রের বয়স তখন ১৯/২০, মাস্টারের ২৭/২৮)**"।

আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে, দুজন এখানে কথা বলছেন, একজন নরেন আর মাস্টারমশাই। কথার দিক থেকে ঠাকুরের মুখপাত্র হলেন নরেন, আর লেখার দিক থেকে ঠাকুরের মুখপাত্র হলেন মাস্টারমশাই। আমরা যে আজ কথামৃত পাঠ করছি, মাস্টারমশাইয়ের জন্য। ঠাকুর কি বলতে চেয়েছিলেন, কিভাবে বুঝতে হবে, সেটা আমরা স্বামীজীর রচনাবলী থেকে পাই। আমরা ষোলজন সন্ন্যাসী বলি ঠিকই, কিন্তু হিন্দুদের যে পুরো আধ্যাত্মিক ইতিহাস আর পুরো হিন্দুদের যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, তার যে সার, সবটাই স্বামীজীর রচনাবলী আর কথামৃতে প্রস্ফুটিতে হয়ে গেছে।

আধ্যাত্মিক জিনিসটা কি? আপনি যখন কথামৃত পড়ছেন, লীলাপ্রসঙ্গ পড়ছেন, সাধুসঙ্গ করছেন, ঠাকুরের কাছে যখন আসছেন, আর আপনি মনটা খুলে সব কিছু যদি গ্রহণ করেন, তখন আপনার প্রথম কি অনুভূতি হয়? যাদের বদ্ধ মন তাদের নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না, বদ্ধ মন মানে পাথর। পাথরকে নদীতে, সমুদ্রে ফেলে রাখলে পাথর জল ধরেও না, পাথরে জল ভরেও না। হাজার হাজার বছর ধরে পাথরের উপর দিয়ে জল বইতে বইতে পাথর মসৃন হয়। যারা যুক্তিবাদী, যারা নিজেদের লিবারাল মনে করে, তারা ওই পাথরের মত আধ্যাত্মিক জলে পড়ে আছে। হাজার হাজার বছর তারা এভাবে পড়ে থাকবে, তারপর একটু মসৃন হবে। কেউ জল থেকে তুলে ছেনি দিয়ে একটু কাটাছেঁড়া করলে যদি একটু পাত্রের আকার নিলেও নিতে পারে। কিন্তু এখন এদের পাত্রতাই নেই।

যদি কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ পড়েন তখন আপনার কি মনে হবে? প্রথম যেটা মনে হবে, ধর্ম সত্য। বড় বড় কথা, যেমন 'মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ', আমরা এগুলোতে যাচ্ছি না। প্রথমেই মনে হবে ধর্মটা সত্য। আপনি জীবনে এর কতটা নামাতে পারবেন, আমরা এগুলোতেও যাচ্ছি না। যদি আপনি কথামৃত না জানেন, ঠাকুরের ভাব যদি না জানেন, কিছুক্ষণের জন্য যদি এগুলোকেও সরিয়ে

দেন। এরপর আপনি যদি উপনিষদ পড়েন, গীতা যদি পড়েন, কি মনে হবে আপনার? মনে হবে, বাঃ কি সুন্দর চিন্তা-ভাবনা। যে ভাব নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলছেন কি সুন্দর চিন্তা-ভাবনা, সেই একই ভাব নিয়ে আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়লেও বলবেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' আহা কি সুন্দর কথা আর '*ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্*', আহা কি সুন্দর কথা, কেমন একই রকম চিন্তা-ভাবনা।

টলস্টয় নিজের সময়ের এত বড় একজন লেখক, স্বামীজীর লেকচারগুলো বই হয়ে টলস্টয়ের কাছে গেছে, টলস্টয় পড়ে বলছেন, 'কি সুন্দর কথা, দেখ এই লোকটি কেমন আমার মতই চিন্তা-ভাবনা করে'। আপনি কি আজকে টলস্টয় আর স্বামীজীকে একই প্ল্যাটফরমে রাখবেন? কখনই না নিশ্চয়, স্বামীজী ভগবান; টলস্টয় একজন সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন কবি; স্বামীজীর সাথে কখনই তুলনা হয় না। তবে ঠাকুরের ভাব আপনার ভিতরে যদি ঢুকে থাকে, তবেই এই জিনিসটা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদি ঠাকুরের ভাব না ঢুকে থাকে, তাহলে টলস্টয় যে স্তরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেইখানে, ঠাকুরও সেইখানে আর উপনিষদের রচনাগুলিও সেই রকমই, ঊনিশ-বিশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো খুবই উচ্চমানের কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু উপনিষদের রচনা, গীতার কথা আপনার ওই রকমই মনে হবে – ঊনিশ-বিশ।

ধর্ম সত্য, আধ্যাত্মিক কথাগুলি সত্য, এই জিনিসটাকেই ঠাকুর কথামৃতে নিয়ে আসছেন – ধরে নিচ্ছি আপনি এটা খুব ভাল করে বুঝে গেছেন। এবার আপনি আমাদের ইউনিভার্সিটির উপনিষদের কোর্সগুলিতে অংশ নিয়ে মন দিয়ে শুনছেন, শুনতে শুনতে হঠাৎ আপনার মনে হবে উপনিষদের কথাগুলো যেন জীবন্ত। কথামৃত যে জীবন্ত গ্রন্থ, এই জীবন্ত গ্রন্থের জন্য আমাদের যত শাস্ত্র সেগুলোও জীবন্ত হয়ে যায়। আমি বাইরের কথা খুব কম জানি, আমি শুনেছি কিছু কিছু বক্তা আছেন তাঁরা এই পুরাণ সেই পুরাণকে সত্য বলে থাকেন। যেমন মাধ্বাচার্য উপনিষদের তুলনায় পুরাণকে বেশি দাম দিতেন। ঠিক আছে, কিন্তু বর্তমান কালে সেটা আর চলবে না। ঠাকুর, মা ও স্বামীজী এসে ধর্মকে ধর্ম যেমনটি, ঠিক তেমনটি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, আবর্জনাগুলিকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, খাঁটি জিনিসটাকে সামনে রেখেছেন। তারপরেও আপনি যদি পুরাণকে বেশি দাম দেন, বুঝতে হবে আপনার কোথাও গোলমাল আছে, ধর্ম জিনিসটাকে বোধগম্য করার ক্ষেত্রে আপনার ঘাটতি থেকে গেছে।

গীতা, উপনিষদকে, হিন্দুরা বেদকে ভগবান বলে মনে করত; কিন্তু পুরনো বাঙালী কিছু পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা বেদের মন্ত্রগুলিকে কবিতা বলে দিচ্ছেন। ম্যাক্সমুলার বেদকে কবিতা বলে দিয়েছিলেন, বেদকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বলে মানতেনই না। বেদ সম্পূর্ণ ভাবে আধ্যাত্মিক জিনিস, বেদেরই কিছু কিছু মন্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানে নামিয়ে দিলেন, কবিতায় নামিয়ে দিলেন। বেদের ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা কি এক? স্বামীজীর কথা আর টলস্টয়ের কথা এক কখন হতে পারে? ঠাকুর শাস্ত্রকে সত্য দেখিয়ে দিলেন; বেদ বলুন, উপনিষদ বলুন, গীতা বলুন, এগুলো সত্য হয়ে গেছে।

এই যে হিন্দুদের হাজার হাজার বছরের জীবন্ত পরম্পরা, এইটাকে আমাদের সামনে জীবন্ত করে দিয়েছেন স্বামীজী আর মাস্টারমশাই। ঠাকুরের এতজন শিষ্য ছিলেন ঠিক আছে, এনারা জীবনমুক্ত ছিলেন ঠিক আছে, তাঁরা সবাই গ্রেট, কিন্তু আমাদের কাছে যখন আসছে তখন এই দুটি রূপে আসছে। আজকে যদি আমাদের কাছে ধর্ম সত্য হয়ে থাকে, হিন্দু শাস্ত্র যদি সত্য হয়ে থাকে আর হিন্দু ধর্ম সত্য বলে অন্যান্য যে ধর্ম, তাদের যে কথা, সেগুলোও সত্য। খ্রীশ্চান ফাদাররা যখন বাইবেলের সাথে উপনিষদের তুলনা করছেন, বোঝেন না যে তাঁরা কি বলছেন।

যদি আমার 'World of Religiom' পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন কিভাবে তাঁরা একই কথা বলছেন। অবশ্য এখানে মূল যে আটটি ধর্ম আছে তাদের নিয়ে কথা বলছি। এখানে অমুক বাবা,

সেখানে তমুক বাবা এসে যে নিজের মত করে ধর্ম বানিয়ে দিচ্ছে, সেগুলোকে নিয়ে বলছি না। এই জিনিসটা করেছেন এই দুজন। এটা আমাদের জন্য এই দুজনের এক ঐতিহাসিক অবদান। ঠাকুরের অন্যান্য যাঁরা শিষ্য ছিলেন, আমাদের কাছে তাঁরা মহাপুরুষ। কিন্তু ঠাকুরের ভাব নিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁদের বাইরে যদি চলে যান, সেখানে দেখবে অনেকেই আছেন যাঁরা হয়ত তাঁদের নামও শোনেননি। কিন্তু তাঁরা বাড়িতে স্বামীজীর রচনাবলী রাখেন, কথামৃত রাখেন।

এই দুটি বই – এক মাস্টারমশাইয়ের অবদান আর দুই স্বামীজীর অবদান। এই দুই ব্যক্তিত্ব নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন তৎকালীন ছাত্রদের চরিত্রকে নিয়ে। এই আলোচনার অনুমতি কি দেওয়া যায়? কোন মতেই না। স্বামীজী বলছেন, জীবনে একটা আদর্শ নিয়ে নাও। একবার যদি আপনি একটা আদর্শ নিয়ে নিলেন, আর সময়ের অপচয় করা যায় না। আমরা স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং অন্যান্য মহারাজদের দেখেছি, একটা মিনিট তাঁরা নষ্ট হতে দিতেন না। জীবনটা পুরো সংঘটিত। তাঁদের একটি সাংসারিক কথা নেই। কোন পরিস্থিতির কারণে সাংসারিক কথায় ঢুকেছেন, এক-আধ মিনিট কোন রকমে থেকে পাশ কাটিয়ে ওই প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাবেন।

এই যে আমি এত লম্বা বর্ণনা দিলাম, কিভাবে আজকে ধর্মকে সত্য বলে আমাদের মনে হচ্ছে। আজ থেকে পনেরশ বছর পরে এগুলোকেই মনে হবে কি সুন্দর রচনা, কিন্তু এখন আমাদের কাছে জীবন্ত। কথামৃত জীবন্ত বলে গীতা, উপনিষদ, বেদ; তার সাথে অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থগুলো সবটাই জীবন্ত ও সত্য হয়ে গেছে। এই দুজন যে ধরণের বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করছেন, এটা ভাল না, সেইজন্য ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে আটকে দিয়ে বলছেন, "এ-সব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়"। আর মাস্টারমশাইকে বলছেন "তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ-সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না"।

বুদ্ধি হতে একটু সময় লাগে, তিরিশ পয়ত্রিশ বছর না হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধি পাকে না। এটা নয় যে ঠাকুর শুধু এনাদের জন্যই এই কথা বলছেন, আমাদেরও সাংসারিক কথায় বেশিক্ষণ থাকতে নেই। ঠিক আছে কোন কারণে মনে একটু চাঞ্চল্য এসেছে, একটা দুটো কথা বলে বেরিয়ে চলে এলেন। মাস্টারমশাই নরেনের থেকে সাত-আট বছরের বড় ছিলেন, তাই মাস্টারকে ঠাকুর বলছেন, তুমি সকলের চেয়ে বয়সে বড়, এই ধরণের কথা তুমি হতে দিও না, আটকে দিও।

"**মাস্টার অপ্রস্তুত। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ চুপ করিয়া রহিলেন**"। ঠাকুর যে এখানে তিরস্কার করছেন, তা না; ঠাকুর চান না, তাঁর যাঁরা বিশেষ ভক্ত তাঁরা নিজেদের সময় শক্তিকে এভাবে অপব্যয় করবে।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, সবাই ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বসে বিশ্রাম করছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করছেন। সেই সময় ঠাকুর নরেন্দ্রকে 'চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে' এই গানটি গাইতে বললেন। নরেন্দ্র গান করছেন, কীর্তন করতে করতে ঠাকুর আবার নৃত্য করছেন, সঙ্গের ভক্তরাও তাঁকে ঘিরে নিয়ে নৃত্য করছেন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর উত্তর-পূর্ব বারান্দায় এসেছেন। হাজরা মহাশয়ও সেখানে বসে আছেন। "**ঠাকুর একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি স্বপ্ন-টপ্ন দেখ**"? এখানে 'একটি ভক্ত' বলতে মাস্টারমশাইকেই জিজ্ঞেস করছেন।

আলোচনায় যাওয়ার আগে এখানে স্বপ্ন জিনিসটার উপর একটু আলোকপাত করা দরকার। স্বপ্ন জিনিসটা কি আমরা এখনও জানি না, এখনও এর উপর গবেষণা চলছে। স্বপ্ন নিয়ে ফ্রয়েডের খুব নামকরা সব আলোচনা রয়েছে, কিন্তু এখনও কারুর কাছে ঠিক পরিষ্কার নেই স্বপ্ন জিনিসটা কি। কারণ

স্বপ্ন জিনিসটাকে বোঝার আগে আমরা যতক্ষণ মস্তিষ্ক, মন বুঝে না নিই, ততক্ষণ স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। মন ও মস্তিষ্কের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকরা এখনও জানতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছু জিনিস এখন জানা যাচ্ছে। আমরা যখন ঘুমোই তখন ঘুমের তিন-চারটে অবস্থা হয়। যখন র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট হয় তখন মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন যখন দেখে তখন কি হয়? বলছেন, কিছু পুরনো স্মৃতি যেখানে কিছু চিত্রগুলি রয়েছে, কিছু শব্দ রয়েছে, এগুলো এলোপাতাড়ি মিলতে শুরু হয়ে যায়। যার জন্য দেখবেন স্বপ্নে আপনার বন্ধু হঠাৎ বাঘ হয়ে গেল। তার মানে, স্মৃতিতে আপনার বন্ধুরও ইমেজ আছে, বাঘেরও ইমেজ আছে, কথাগুলি আছে, সবটা মিলে এলোপাতাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যেও জিনিসটা পুরো লজিক্যাল চলে।

আবার অনেক সময় ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেখা যায়; এটা একটা রহস্য। কি করে এটা হয় জানা নেই, কিন্তু অনেকেরই এই ধরণের স্বপ্ন হয় যেখানে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস পান। অনেক সময় আপনি যে চিন্তা করেছিলেন, তা না; অনেক সময় যে অনুভব করেছিলেন, তাও না; কিন্তু হয়ে যায়। যাঁরা জপধ্যান করেন, কিংবা যাঁদের মন ঈশ্বরের দিকে যায়, ওনারা কোন না কোন ভাবে ইষ্টের স্বপ্ন পেয়ে যাবেনই। কখন দেখবেন আপনি আমাদের ক্লাশে এসে ক্লাশ শুনছেন বা বেলুড় মঠে এসেছেন, সেখানে কোন মহারাজকে দেখছেন, কিংবা ঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিচ্ছেন। এমনিতে এগুলোর কোন দাম নেই, কিন্তু একটা দাম হল যে, আপনার মন এখন ঈশ্বরকে নিয়ে ঘুরছে। যখন আধ্যাত্মিক স্বপ্নগুলি আসে বা যখন দেবীদেবতার স্বপ্নগুলি আসে, হিন্দু সাইকলজিতে বলে, দেবীদেবতারাই এই স্বপ্ন পাঠান। এর সত্যি-মিথ্যা আমাদের জানা নেই। আমাদের দেবীদেবতাতেই বিশ্বাস নেই, সেখানে তাঁদের পাঠানো স্বপ্নকে কি বিশ্বাস করব! তখন সেই ভক্ত বলছেন –

"ভক্ত–একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি; এই জগৎ জলে জল। অনন্ত জলরাশি! কয়েকখানা নৌকা ভাসিতেছিল; হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গেল। আমি আর কয়টি লোক জাহাজে উঠেছি; এমন সময় সেই অকূল সমুদ্রের উপর দিয়ে এক ব্রাহ্মণ চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কেমন করে যাচ্ছেন'? ব্রাহ্মণটি একটু হেসে বললেন, 'এখানে কোন কষ্ট নাই; জলের নিচে বরাবর সাঁকো আছে'। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন'? তিনি বললেন, 'ভবানীপুর যাচ্ছি'। আমি বললাম, 'একটু দাঁড়ান; আমিও আপনার সঙ্গে যাব'।

কোন মিল নেই, একদিকে বলছেন এই জগৎ জলে জল, অন্য দিকে এই ব্রাহ্মণ বলছেন, ভবানীপুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ – আমার এ-কথা শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে!

ভক্ত – ব্রাহ্মণটি বললেন, 'আমার এখন তাড়াতাড়ি; তোমার (জাহাজ থেকে) **নামতে দেরি! এখন আসি। এই পথ দেখে রাখ, তুমি তারপর এস'।**

শ্রীরামকৃষ্ণ – আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও।

এগুলো হল একটা লক্ষণ, তার মানে মন এখন আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। ঠাকুর সেইজন্য ভক্তটিকে মন্ত্র নিতে বলছেন। যাই হোক রাত এগারোটা হয়ে গেছে। **নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া শয়ন করিলেন।**

পরের দিন (১৭ই অক্টোবর, ১৮৮২; মঙ্গলবার) ভোর হয়েছে। ঘুম ভাঙার পর ভক্তদের মধ্যে কেউ দেখছেন – শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দিগম্বর, ঠাকুরদের নাম করিতে করিতে ঘরে বেড়াইতেছেন। কখন গঙ্গাদর্শন, কখন ঠাকুরদের ছবির কাছে গিয়া প্রণাম, কখন বা মধুর স্বরে নামকীর্তন। কখন বলিতেছেন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী, ভগবত-ভক্ত-ভগবান। গীতা উদ্দেশ করিয়া অনেকবার

বলিতেছেন, ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী। কখন বা – তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি; তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি; তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট; তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী; তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

এই লাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ঠাকুর দেখাচ্ছেন কিভাবে যত রকমের আধ্যাত্মিক কথা, আধ্যাত্মিক সত্য সব মিলেমিশে যেন এক হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা জিনিস যেটা আমাদের খুব মনে রাখা দরকার। ঠাকুর যখন এসেছেন, তার কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে ছাপাখানা চালু হয়। হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা তৈরী হয়। ফলে ঠাকুর আসার আগে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য পাণ্ডুলিপি ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। আর যিনি পড়াশোনা করতেন তিনি যেটাকে নিয়ে পড়াশোনা করতেন ততটুকুই জানতেন, ওর মধ্যেই তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিন্তু শঙ্করাচার্যের ভাষ্যগুলি পড়ার সময় অবাক লাগে, তিনি সেই সময় এত কথা জানলেন কি করে? বেদ থেকে বলছেন, উপনিষদ থেকে বলছেন, গীতা থেকে বলছেন, বিভিন্ন পুরাণ থেকে বলছেন, মনুস্মৃতি থেকে বলছেন, মহাভারত থেকেও বলছেন; সত্যিই অবাক লাগার মত। কারণ অত কম বয়সে অতগুলি শাস্ত্র পড়া, শুধু পড়া নয়, পড়ে সব কিছুকে মনে রাখা, কল্পনাই করা যায় না।

বর্তমান কালে কোন সমস্যা নেই, এখন গুগুল এসে গেছে, দুটো শব্দ টাইপ করে দিলে আপনাকে এক গুচ্ছ রেফারেন্স দিয়ে দেবে। তার আগে লাইব্রেরীগুলি ছিল, ওখানে বইগুলো ছাপা রয়েছে, ওখান থেকে বই নিয়ে নিন, সব জেনে যাবেন। যখন ব্যাসদেব ছিলেন, তাঁর এমন প্রতিভা যে, তৎকালীন যত শাস্ত্র ছিল, সবটাই তিনি জানতেন, যত দর্শন আছে, সবটাই তিনি জানেন, তিনি সবটাকে এক জায়গায় করে দিয়ে গেছেন। শঙ্করাচার্যের এমন প্রতিভা, তিনি তাঁর ভাষ্যে গীতা, উপনিষদ থেকে শুরু করে হিন্দু ধর্মের যত দর্শন আছে, সব দর্শনকে এক জায়গায় করে দিয়েছেন। এটা করার জন্য আগে আপনাকে সব কটা দর্শনকে ভাল ভাবে জানতে হবে। স্বামীজী দেববাণীতে যত রকমের জিনিস হতে পারে, যেখানে ভারতীয় ধর্ম, পাশ্চাত্য ধর্ম, হিন্দু দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন, আর এই যে ভৌতিকবাদ, মানুষ যেখানে ভোগবাদে ডুবে আছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞান, সমস্ত কিছু স্বামীজী এক সঙ্গে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছেন। এক একটা জিনিসকে এনে তিনি দেখাচ্ছেন কিভাবে সব কিছু বিভিন্ন ভাবে সেই অনন্তরেই প্রকাশ।

ইস্তাম্বুলে স্বামীজী দেখছেন মেয়েগুলো কিভাবে শরীর বিক্রি করছে, সেখানে স্বামীজী তাঁর সঙ্গীদের বলছেন, আহা দেখ কিভাবে ওরা ওদের দিব্যত্বকে শরীরে নামিয়ে দিয়েছে, আর আজ তাই এদের দুরবস্থটা দেখ। তার মানে, একজন নারী শরীরের ব্যবসায় নেমে গেছে, সেখানেও স্বামীজী দেখছেন, play of Divinity। স্বামীজী এটা যে নূতন দেখছেন তা না, গীতাতেও বলছেন *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*। স্বামীজী নূতন কথা কিছু বলছেন না, গীতাতে ভগবান বলছেন, কুকুর হোক, গরু হোক, হাতি হোক, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হোক, সব এক, কোন তফাৎ নেই। স্বামীজী সেখানে এটাই ব্যাখ্যা করছেন, আমাদের যে দিব্যভাব, আমাদের যে দিব্য স্বরূপ এই দুর্লভ দামী জিনিসটাকে কিভাবে কত সস্তায় আপনি বিক্রি করে দিচ্ছেন। আমাদের অন্তর্নিহিত দিব্য সত্তাকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হল। তার মানে শরীরের সৌন্দর্য যে সে বিক্রি করছে, এটা ঈশ্বরবিরোধী কিছু না।

কিন্তু এই কথাকে আবার খ্রীশ্চানরা মানবে না, ওরা বলবে এরা পাপ করছে। আমরা পাপ বলি না, আমরা বলি সে ভুল করছে, বোকাম করছে। তোমার যে দিব্য স্বভাব, যেটা দিয়ে তুমি মুক্ত হয়ে যেতে পার, যেটা তোমাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে, সেটাকে তুমি ঈশ্বরের দিকে না লাগিয়ে শরীরে দিয়ে নিজেকে অধঃপতনে নিয়ে যাচ্ছ। আজকে দেখ তোমার কি দুরবস্থা, দুরবস্থায় তুমি এখন কাঁদছ। এটা দিয়ে তুমি যদি সাফল্য পেতে তাহলে তুমি কাঁদতে না। গীতাতেও এটাই বলছেন, তুমি যেটা করতে চাইছ কর, কিন্তু পরে কেঁদো না। বাচ্চাগুলো যখন দুষ্টুমি করে, মা তাদের নিষেধ করতে করতে বিরক্ত হয়ে বলে, যাও, পরে যখন মারটি খাবে তখন আমার কাছে এসো না, কারণ মা জানে ওখানে

গোলমাল লাগবে। ছেলে বা মেয়ে যখন সবার কথাকে অমান্য করে সব কিছু ছেড়ে নিজের মত বিয়ে করতে বেরিয়ে যায়, তখন বাবা-মা এটাই বলে, যাও, মার যখন খাবে তখন আর আমাদের কাছে কাঁদতে কাঁদতে এসো না। তার মানে তোমার শক্তিকে এমন জায়গায় লাগিয়েছ যার জন্য তোমাকে আজকে কাঁদতে হচ্ছে। তোমার দিব্যশক্তিকে, তোমার যে অনন্ত শক্তি, সেটাকে শরীরে লাগিয়ে আজকে তুমি কাঁদছ। এটা হল সব কিছুকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা।

ঠাকুর এখানে সব রকম ভাব নিয়ে আসছেন, যেমন বলছেন, পুরুষও যা, প্রকৃতিও তা, কিন্তু আপনি যখন সাংখ্য পড়বেন, যোগ পড়বেন, তখন দেখবেন, এনারা কক্ষণ বলবেন না পুরুষও যা প্রকৃতিও তা। একমাত্র ব্যাসদেব বুঝলেন, সেইজন্য গীতায় পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতির কথা বলতে পারলেন – পুরুষ তাঁর পরা প্রকৃতি আর এই যে জড় প্রকৃতি, এটা তাঁরই অপরা প্রকৃতি, পুরুষ আর প্রকৃতিকে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। হিন্দু ধর্ম সমন্বয়ের ধর্ম, সব কিছুকে নিয়ে আসেন, এখানে আলাদা কিছু না। এটা মনে করো না যে এটা আলাদা, সেটা আলাদা; সবটাই সেই এক চৈতন্য, এগুলো তাঁর নানান রূপ।

সকাল হয়ে গেছে। মন্দিরে মঙ্গলারতির ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সবাই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়েছেন।

নরেন্দ্র – পঞ্চবটীতে কয়েকজন নানকপন্থী সাধু বসে আছে দেখলুম।

এরপর নানকপন্থীদের কিছু কথা বলে ভক্তি আদিতে চলে যাচ্ছেন।

"**শ্রীরামকৃষ্ণ – হ্যাঁ, তারা কাল এসেছিল। (নরেন্দ্রকে) তোমরা সকলে একসঙ্গে মাদুরে বস, আমি দেখি**"। পরে পরে ঠাকুর বলবেন, ভক্তরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে দেখলে উদ্দীপন হয়। স্বামীজীও এটা ব্যাখ্যা করছেন যে, আমরা যখন কোন মন্দির আদিতে যাই, সেই মন্দিরেই যাই যেখানে নিষ্ঠা আছে। এখন তো বেশির ভাগ মন্দিরই কর্পোরেট মন্দির, মন্দিরের বাইরে দেখবেন জিম আছে, সুইমিং পুল আছে, ওই সব মন্দিরের কথা বলা হচ্ছে না। যেখানে নিষ্ঠা আছে, মন্দিরে যা কিছু হচ্ছে সব নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়। দূর্গাপূজার সময় বেলুড় মঠে যদি আসেন, তাহলে দেখবেন শত শত ভক্ত সেখানে সকাল থেকে একনিষ্ঠ হয়ে চুপচাপ বসে আছেন। ওই ধরণের সমাগম দেখলে একটা উদ্দীপন হয়। যেখানে অনেকগুলো মন শুধু একটা জিনিসকে নিয়ে ডুবে আছে, সেখানে এমন একজন গেছে, যার মনে ওই জিনিসটাকে নিয়ে উৎসাহ নেই, তার মনের মধ্যেও একটা উৎসাহের সঞ্চার হয়। সেইজন্য সাধন-ভজন প্রথমের দিকে অনেকে মিলে করতে হয়। আরও চারজন জপধ্যান করছে দেখলে তারও মনটা উপরে উঠে আসে।

আমাদের বেলুড় মঠে নিয়ম আছে, সকালে মঙ্গলারতির পর সবাই একসঙ্গে ধ্যান করতে বসেন। কারণ সকালের সময়টা এমন যে, বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। অনেক সময় অনেকে মনে করেন বিছানাতেই বসে ধ্যান করব বা নিজের ঘরে বসে ধ্যান করব; সেখানে কিন্তু ধ্যান হয় না। কিন্তু যেখানে একশজন বসে ধ্যান করছেন, সেখানে ধ্যান নিজে থেকেই হয়। বাড়িতেও দেখবেন, পরিবারের তিন-চারজন একই পরম্পরায় দীক্ষাদি নিয়েছেন, একসঙ্গে জপধ্যান করতে বসলে মন নিজে থেকেই জপে বসে যায়।

'তোমরা সকলে একসঙ্গে মাদুরে বস, আমি দেখি', কথামৃতে এই ধরণের বর্ণনা প্রায়ই আসে। এখানে দুটো ব্যাপার – একটা হল ওই ভাব আর দ্বিতীয় হল ভালবাসা। এনারা সবাই আপনজন, সবাই ভালবাসার জন, সবাই একসঙ্গে বসে আছেন, এটা দেখলে আনন্দ হয়। ভক্তেরা আনন্দে ঠাকুরকে দেখছেন, গল্প করছেন। "**নরেন্দ্র সাধনের কথা তুলিলেন**"। ঠাকুর এখন সাধনের কথা বলছেন –

"শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি) – ভক্তিই সার। তাঁকে ভালবাসলে বিবেক বৈরাগ্য আপনি আসে"। রাজযোগকে পতঞ্জলি লজিক্যালি পুরো জিনিসটাকে দাঁড় করিয়েছেন, যেখানে তিনি যম, নিয়ম, আসন এই জিনিসগুলিকে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছেন, আর জোর দিচ্ছেন এগুলোর কতটা গুরুত্ব। রাজযোগেও পতঞ্জলি থেকে থেকে বলছেন, ঈশ্বরে ভক্তি হলে এগুলো আর লাগে না। যোগে যেখানে যোগসিদ্ধির কথা আসে, সেখানেও যোগসিদ্ধির সব কথা বলে তিনি বলছেন, যাদের মন পুরোপুরি ঈশ্বরে চলে গেছে, মন একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে, এই সিদ্ধিগুলি তাদের এমনিই এসে যায়।

ভালবাসা দুই প্রকার – একটা হল ঈশ্বরের প্রতি আপনার স্বাভাবিক ভালবাসা, আপনার স্বাভাবিক একটা ভালবাসা কোন একটা আদর্শের প্রতি, সেটা উপনিষদের আদর্শ হতে পারে, কিংবা কর্মের আদর্শ হতে পারে বা ভক্তির আদর্শ হতে পারে। দ্বিতীয় আরেকটা হল, যেখানে গতিটা স্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইচ্ছে আছে। তখন তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, অনুশীলন করিয়ে করিয়ে আধ্যাত্মিক ভাবকে স্বাভাবিকের দিকে নিয়ে আসা হয়। এই যে বিবেক, বৈরাগ্যের কথা বলা হয়, এগুলো বলা হয় যাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভক্তি ভালবাসা নেই, আধ্যাত্মিক ভাব স্বাভাবিক নেই। কিন্তু কারুর কাছে শুনেছে, বা কোন কিছু পড়েছে, তারও ইচ্ছে হয়েছে মনটাকে ওই দিকে নিয়ে যাওয়ার, এটা তাদের জন্য। এই যে আমরা বলি ভারতবর্ষে চারটি বর্ণ – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। চারটে বর্ণের সাথে চারটে সন্ন্যাসের কথা বলছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে, বিশেষ করে আগেকার দিনে আশ্চর্যজনকে ভাবে দুটো গ্রুপ ছিল।

প্রথম গ্রুপ হল, যাঁরা পুরোহিতের কাজ করছেন, নামে ব্রাহ্মণ, এই একটু পড়াশোনা করছেন। দ্বিতীয় গ্রুপে আছেন, ব্রাহ্মণদের যাঁরা সন্ন্যাসী নন, কিন্তু সন্ন্যাসীদের মত থাকছেন। এনাদের আধ্যাত্মিক ভাবটা কিন্তু স্বাভাবিক না। কিন্তু যিনি সন্ন্যাসী, তাঁর আধ্যাত্মিক ভাব স্বাভাবিক; ধরেই নেওয়া হয় যে, তিনি সব কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেছেন। এনারাও স্বাভাবিক নন। কিন্তু ভারতবর্ষের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, একটা পুরো জাতিকে ওনারা আধ্যাত্মিক ভাবে নামিয়ে দিয়েছেন, তোমরা এটাই করবে। তোমরা শাস্ত্র পড়বে, শাস্ত্রকে নিয়ে চিন্তন-মনন করবে আর শাস্ত্রকে নিয়ে সাধনা করবে। আমাদের এত শাস্ত্র আছে যে, আমরা কল্পনাই করতে পারি না। তার মধ্যে যে কোন একটা বই যদি তুলে নেওয়া হয়, তার উপর এতগুলো ভাষ্য আছে, এতগুলো ব্যাখ্যা রয়েছে। ওই ব্রাহ্মণরা সাধনা করছেন, জপধ্যান করছেন, সন্ন্যাসীর মত জীবন-যাপন করছেন, বিয়ে-থা করেছেন, সন্তানাদি আছে। নিজেও খেতে পান না, সন্তানকেও খাওয়াতে পারেন না; কিন্তু বিদ্যাচর্চা করে যাচ্ছেন। আমরা যখন বিদ্যাচর্চার কথা বলি, 'বিদ্যাচর্চা' শব্দটা যে ভাবেই নিই, সেই অর্থে ব্রাহ্মণরা বিদ্যাচর্চা করতেন, কিন্তু তার থেকে আরেকটু বেশি করতেন, যেখানে আধ্যাত্মিক সাধনাকেও একটা রুটিনের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন – এনাদের জন্য বিবেক বৈরাগ্য খুব important। কারণ ওনাদের আধ্যাত্মিক জিনিসটা স্বাভাবিক না।

ঠাকুর সবার সাথে কথা বলতেন না, ওনার যাঁরা বিশেষ লোক, হয় দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, আর তা নাহলে খুব বিশেষ লোক, যাঁর মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবের জাগরণ ঘটাচ্ছেন; এনাদের ঠাকুর যখন কিছু বলবেন, তখন তাঁর কথাগুলো অন্য রকম হবে। তার সঙ্গে ওই কথাগুলো যেগুলো এখন বলছেন; এই কথাগুলিই পরে ডাইলিউট হয়ে একটু নরম হয়ে আমাদের কাছে আসবে, যেখান থেকে আমরা একটু জল মিশিয়ে মিশিয়ে আরও সহজ করে নেব। ঠাকুর যে বলছেন, ভক্তিই সার, এই কথা তিনি বিশেষদের বলছেন, যাঁরা স্বভাবেই আধ্যাত্মিক আর যাঁদের জীবনের উদ্দেশ্যই হল আধ্যাত্মিক হওয়া। ঠাকুর এখানে যে 'ভক্তিই সার' বলছেন, তিনি ঈশ্বরকে মনে রেখেই এই দুটি শব্দ বললেন।

কিন্তু অন্য আরেকটা দিক থেকে যদি দেখা হয় তাহলে এর আরেকটা অর্থ হবে – তোমার পথ যাই থাক, সেখানে তোমাকে ডুব দিতে হবে। সেখানে কর্মযোগ থাকে, ধ্যানযোগ থাকে, রাজযোগ

থাকে, সেখানে তোমাকে ডুব দিতে হবে। ভক্তিই সার এই কথা ঠাকুর অনেকবার বলছেন, আবার কলিতে নারদীয়া ভক্তি এই কথাগুলো অনেকবার বলছেন। যে কোন আচার্য চেষ্টা করেন, তাঁর যে শিষ্য, সেই শিষ্যের জন্য যেটা সহজ পথ; কোন পথই সহজ না; তবে তার জন্যে যেটা সহজ, সেই পথটাকে ধরিয়ে দিতে। যার জন্য ঠাকুর বলছেন, ভক্তি সহজ পথ। ভক্তি কি আদৌ সহজ পথ? নেমে দেখুন, পারবেন না ধরে রাখতে। তাহলে সহজ পথ কেন বলছেন? কারণ অন্যান্য পথের কোন ধারণাই আমাদের নেই। আমরা যখন উপনিষদের কথা বলি, অহং ব্রহ্মাস্মির সাধনার কথা বলি; যারা বলছে তারাও বোঝে না, যার শুনছে, তারাও বোঝে না। ইদানিং অনেক গুরু আছেন, যাঁরা যোগকে খুব জনপ্রিয় করে দিয়েছেন। একবার মন দিয়ে রাজযোগের আলোচনাগুলো শুনুন, মাথায় হাত দিয়ে বসে যাবেন, জিনিসটা কোন জায়গাতে নিয়ে যায়।

ভক্তির ক্ষেত্রে কি হয়, ভক্তি হল আমাদের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। ছোটবেলা থেকেই আমরা ভালবাসা জিনিসটার সাথে পরিচিত। আমরা মাকে ভালবাসি, বাবাকে ভালবাসি, কাকা, জ্যাঠা, মামা এদের মধ্যে কাউকে না কাউকে ভালবাসি; বন্ধুদের মধ্যে কাউকে ভালবাসি। ভালবাসার জন্য কাউকে ট্রেনিং দিতে হয় না। আবার এটাও হতে পারে, ভালবাসাতে দুটো চারটে ঘা খেয়ে ভালবাসা দিয়ে ধাপ্পা মারতে শিখে যাই। কিন্তু মানুষ কোন একটা সময় কখন কাউকে না কাউকে কিছুক্ষণের জন্য ভালবেসেছে। স্কুলে নিজের কোন শিক্ষককে ভালবেসেছে, হেডমাস্টারকে ভালবেসেছে, কাউকে না কাউকে admire করেছে। আচ্ছা যারা এগুলো কিছুই করেনি, কোন ক্রিকেটারকে খুব পছন্দ করে, কোন ফিল্মস্টারকে পছন্দ করে, কোথাও একটা এই পছন্দের ব্যাপারটা থাকবেই। ওই admirationটা ধরে নিজেকে তুলে নিয়ে যাওয়া, তার মানে ভালবাসা জিনিসটা তুমি জান।

অনেক আগেকার একটা ঘটনা, আইনস্টাইন খুব সুন্দর ভায়োলিন বাজাতেন। একবার উনি এক বন্ধুর বাড়িতে বড় পার্টিতে গেছেন। ওখানে অর্কেস্ট্রা বাজানো হচ্ছে। উনি লক্ষ্য করলেন, একটা ইয়ং ছেলে, ওই অর্কেস্ট্রার বাজনাতে ওর কোন আগ্রহ নেই। দেখে ওনার খুব খারাপ লাগল। উনি ছেলেটিকে আলাদা করে বলছেন, 'তোমার এগুলো ভাল লাগছে না'? ছেলেটি বলল, 'না, আমার ভাল লাগছে না, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমি বুঝি না'। আইনস্টাইন ওই বাড়ির পরিচিত ছিলেন। ছেলেটিকে উনি দোতালায় নিয়ে এলেন। বলছেন, 'কোন একটা গান তো হবে যেটা তুমি ভালবাস। এটা হতে পারে না যে জীবনে তুমি কোন গান করোনি, কোন গান তোমার পছন্দ হয়নি'। আইনস্টাইনের কথা শুনে ছেলেটি একটু লজ্জা পেল, হাল্কা করে একটা চটুল গান সে শুনিয়ে দিল। আইনস্টাইন শুনলেন, শোনার পর ওখানে যে গ্রামফোন ছিল আর তার পাশে সেখানে যে রেকর্ডের র‍্যাক ছিল, সেখানে বাই চান্স ওই ধরণের একটা গান পেয়ে গেলেন। গ্রামফোনে গানটা চালিয়ে আইনস্টাইন বলছেন, 'এই গানটা তোমার কেমন লাগছে'? 'হ্যাঁ এটাই, এটা হল আমার ঠিক ঠিক পছন্দের গান'। তখন ওই ডিস্কটা সরিয়ে আরেকটা রেকর্ড লাগালেন, গানটা আরেকটু উচ্চমানের। চালিয়ে আইনস্টাইন ওকে বোঝালেন আগের গানের সাথে এই গানের কি সম্পর্ক আছে। 'এবার এটা বুঝতে পারছ'? এই করে করে উনি এক ঘন্টা ধরে একটার পর একটা রেকর্ড পালটে পালটে শুনিয়ে যাচ্ছেন। একটা থেকে আরেকটা উচ্চমানের সঙ্গীতে নিয়ে যাচ্ছেন, উনি একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য কিনা। এরপর একেবারে শেষে উনি ক্লাশিক্যালের ওই রেকর্ডটা লাগিয়েছেন। চালিয়ে দিয়ে উনি বলছেন, 'তুমি যে গানটা পছন্দ কর, ওই গানের সাথে এই গানটা কিভাবে জুড়ে আছে দেখ, দুটো আলাদা কিছু না'। ঘন্টা দেড়েক পরে ছেলেটাকে দোতালা থেকে নীচে নামিয়ে আনলেন। এবার কিন্তু ছেলেটি অর্কেস্ট্রার বাজনাটা এনজয় করতে পারছে। আইনস্টাইনের জীবনের এটা একটা সত্যি ঘটনা।

আধ্যাত্মিক আচার্যরা ঠিক এই ধরণের হন। আমরা দুটো কথা শিখে নিয়ে জোর করে ওটাকেই সবার কানে ঠুসে যাচ্ছি। আচার্যরা কক্ষণ এ-রকম করেন না। ঠাকুরের জীবনে দেখুন। একজন ঠাকুরের কাছে এসে বলছে তার ভক্তি নেই। ব্যক্তিটি তার ভাইপোকে ভালবাসে। ভালবাসাটা তার মধ্যে আছে।

ঠাকুর তাকে বললেন, ওই ভাইপোর মধ্যে কৃষ্ণকে দেখ। ঠাকুর কেশব সেনদের রাধাকে নিয়ে বলছেন, তোমরা রাধাকে নাই মানলে, তাঁর টানটুকু নাও। যখন অহং ব্রহ্মাস্মি বলা হয়, সেখানে আসলে আমিত্বের নাশের কথা বলা হচ্ছে। ঠাকুর যখন বলছেন, 'ভক্তিই সার', ভক্তিতেও আমিত্বের নাশ করার কথাই বলা হয়। কর্মযোগে যে নিষ্কামকর্ম করার কথা বলা হয়, সেখানেও আমিত্বের নাশ হয়; রাজযোগেও চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে আমিত্বের নাশ হয়। আপনি যে কোন পথ নিন, সবটাতেই আমিত্বের নাশ হয়।

দেববাণীতে স্বামীজী অনেকবার ভালবাসা জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন। বর্তমান যুগে এসে ভালবাসার সংজ্ঞাটাই পালটে গেছে, যেখানে ভালবাসা মানে আমি তোমাকে টেনে আমার কাছে নিয়ে আসব। কিন্তু ভালবাসা আসলে তা নয়। ঠিক ঠিক ভালবাসা যেখানে, সেখানে শুধু দেওয়া, নেওয়া বলে কিছু নেই। একটা ছেলে ও মেয়ের যে ভালবাসা হয়, সেখানেও এক অপরকে উপহার দিচ্ছে। যদি না দেওয়া হয়, অন্য পক্ষ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু দেওয়াটা স্বাভাবিক, ভালবাসা আছে মানেই দেওয়া। এই দেওয়ার ভাব যখন খুব উঁচুতে চলে যায়, তখন সেখানে নারদ বলছেন, *ন তু কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ*। ভক্তি, ভালবাসায় সে কিছু চায় না, *ন তু কাময়মানা*, সে শুধু দিয়ে যায়। অনেকেই বলবেন, কই এ-রকম ভালবাসা তো দেখিনা, কোন ভালবাসায় তো এ-রকম হয় না। তা না, প্রত্যেক ভালবাসায় এই রকমই হয়।

একটা ছোট্ট অবোধ শিশু, মাকে সে ভাল করে জানেও না, প্রথমে সে মাকে ফুড সোর্স হিসাবে দেখে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার বোধ আসতে শুরু হয়, তখন মাঝে মাঝে সে মায়ের কাজের বোঝা লাঘব করার জন্য মাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, হয়ত বা একটু সেবা করে; কোথাও এসে তার মধ্যে দেওয়ার ভাবটা একটু জাগে। সেখানে হয়ত অতটা দেওয়ার ভাব আসে না। কিন্তু যেমনি পাড়ায়, স্কুলে, কলেজে ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব হতে শুরু হয়, দেখা যায় চার বছর পাঁচ বছরের বাচ্চারা তার বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে যাবে, একটা উপহার নিয়ে যাবে। যেমন যেমন মনের পরিপক্কতা হতে থাকে, যেমন যেমন মন খুলতে থাকে, তত সে দিতে চায়। দেওয়া মানেই আমিত্বের নাশ। কারণ মানুষের স্বভাবই এমন যে, সব কিছুকে সে নিজের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। সেখান থেকে একটু যখন সে ছাড়তে চাইছে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে ভালবাসার উদয় হয়েছে। বর্তমান কালে সমাজের সব ক্ষেত্রে যে এত অধোগতি হয়ে গেছে, সেখানেও দেখা যায় ছেলে মেয়ে পরস্পরকে ভালবাসছে। বিশেষ করে ছেলেরা, যাকে ভালবাসে তার জন্য একটা উপহার নিয়ে আসবে। এই দেওয়াটা হল আমিত্বের নাশ, ভক্তিতে আমিত্বের নাশ হয়।

উপনিষদের সময় সগুণ সাকারের উপাসনা খুব বেশি প্রচলিত ছিল না, যদিও বেদে আমরা সগুণ সাকারের উপাসনা পাই, কিন্তু সেখানেও এতটা প্রচলিত ছিল না; আর উপনিষদ হল একটা sect। আসলে উপনিষদ হল সন্ন্যাসীদের জন্য। মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখছেন, এই উপনিষদের পরম্পরাতে কিছু গৃহীদের নাম আছে ঠিকই, কিন্তু উপনিষদ হল সন্ন্যাসীদের জন্য, সন্ন্যাসী ছাড়া উপনিষদ চলবে না। উপনিষদ থেকে যেমনি আমরা গীতাতে আসছি, দেখছি সেখানে ভক্তি জোর কদমে এসে গেছে। সেখান থেকে কথামৃতে আমরা যখন আসছি, তখন দেখছি সেই সময় বাড়ি বাড়িতে পূজা হয়; শালগ্রাম শিলা থেকে শুরু করে শিবলিঙ্গ এবং নানান রকম দেবদেবীর পূজা চলছে। ঠাকুরের সময় এসে ভক্তি খুব স্বাভাবিক জিনিস হয়ে গেছে। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন, ভক্তিই সার।

দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – প্রথম কথা হল, ঠাকুরের সময় এবং বর্তমান কালে হিন্দুদের কাছে ভক্তি একটা স্বাভাবিক পথ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা, মানুষ সহজেই ভালবাসতে জানে, সেখান থেকে মানুষকে খুব সহজে ভক্তি পথে নিয়ে যাওয়া যায়। ফলে কি হয়, তাঁকে ভালবাসলে বিবেক বৈরাগ্য আপনি আসে – এই কথা ঠাকুর অনেকবার বিভিন্ন ভাবে বলছেন। বেদান্তে প্রথমেই বলে ষট্‌সম্পত্তির

কথা; শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এই জিনিসগুলো আপনার চাই, আত্মনিয়ন্ত্রণ চাই। যোগ পড়তে যান, সেখানেও একই কথা বলবে। আপনি যেটাই পড়তে যাবেন, এই ধরণের চারটে অনুশাসনের কথা বলবে, যে চারটে আপনার সাধনা শুরু করতে গেলে লাগবে। কিন্তু ভক্তিযোগে যদি ভগবানের প্রতি আপনার ভালবাসা এসে যায়, তাহলে এগুলো আর কিছু লাগবে না। ভালবাসা যদি না আসে, তখন ওনারা নবধা ভক্তির কথা বলছেন – শ্রবণ, মনন, পাদপূজন, নিদিধ্যাসন, এই জিনিসগুলো তখন আপনাকে করতে হয়, যাতে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভালবাসা, ভক্তি আসে। কিন্তু সবটাতেই উদ্দেশ্য হল, কিভাবে আপনার মন ঈশ্বরে ডুবে থাকতে পারবে, ঈশ্বরের ভাবে মন কিভাবে তন্ময় হয়ে যাবে। জ্ঞানযোগের সাধনের ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য হল – সংসার অসাড় ও ব্রহ্মই সত্য এই ভাবেতে মন কিভাবে ডুবে যাবে।

নরেন্দ্রের বয়স তখনও কুড়ি বছর হয়নি, এখন সালটা হল ১৮৮২, কুড়ি বছর বয়স, বাচ্চা ছেলে। ধর্ম, ঈশ্বরের ব্যাপারে দু-চারটে কথা শুনেছেন, দু-চারটে কথা শিখেছেন, আর বাংলায় তখন তন্ত্র সাধনার খুব নাম। এখন ভারতবর্ষ তন্ত্র ছেড়ে দিয়েছে, তার জায়গায় আমেরিকা এখন তন্ত্রকে ধরেছে। মাঝে মাঝে আমি মেইল পাই। আরেকজন সমর্পণানন্দ আছেন, যিনি তান্ত্রিক সেক্স শেখান। আমাকে লেখে, আপনি কি সেই সমর্পণানন্দ, আপনি কি তান্ত্রিক সেক্স শেখান? ওদের মাথায় সব কিছুতে, যদি তন্ত্র সাধনও করে, ওই জিনিসগুলিই ঘোরে। যেমনি আমি লিখে দিলাম, এটা ছাড়া অন্য সব কিছু জানি, সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই সম্পর্কের ইতি। ইউটিউবে আমাদের যে তন্ত্রের ক্লাশগুলো আপলোড করা আছে, সেখানেও ওরা ওই জিনিসগুলির খোঁজ করে।

"**নরেন্দ্র – আচ্ছা, স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন তন্ত্রে আছে**"? কোথাও শুনেছেন যে, এই রকম হয়। তন্ত্রের ক্লাশে মহানির্বাণতন্ত্রকে আধার করে আমরা তন্ত্রকে নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করেছি। একটা কথা আমরা প্রায়ই বলি – এটা জানবেন, নকল টাকা সেখানেই চলে যেখানে আসল টাকা আছে। ভারতবর্ষে কেউ নকল ডলার বানায় না, ভারতবর্ষে নকল টাকা বানায়। কারণ এখানে ডলার চলে না। এই যে আধ্যাত্মিক পথ, তাতে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাতে যে শান্তি লাভ হয়, ফলে কিছু ঢপবাজ, নিষ্ঠাহীন লোক, ঢপবাজ মানে পুরো ঢপবাজ, ওরা ধাপ্পা মারার জন্যই ঢুকেছে; আর কিছু আছে যারা নিষ্ঠা নিয়েই ঢুকেছিল, কিন্তু তাদের নিষ্ঠাটা কমে গেছে। কারণ যে কোন জিনিসে নিষ্ঠা ধরে রাখাটা অত সহজ জিনিস না। আমরা যখন ক্লাশ সেভেন এইটে পড়তাম, তখন কোন কারণে যদি রেজাল্ট খারাপ হয়ে যেত; তারপর বাড়িতে ও স্কুলে যখন বকুনি খেতাম, বন্ধুরা যদি হাসাহাসি করত; প্রথম দিন আমরা দিব্যি খেয়ে শপথ নিতাম – কাল থেকে আমি মন দিয়ে পড়াশোনা করব। মন দিয়ে পড়াশোন তো এমনি হবে না, তাই প্রথমেই তৈরী করা হত একটা জবরদস্ত টাইমটেবিল। সকালে ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে। যারা কোন দিন সূর্যোদয় দেখেনি, তারা উঠবে ভোর পাঁচটায়। ঘুম থেকে উঠে পর পর একেবারে সাজানো প্রোগ্রাম – এটার পর এটা, সেটার পর ওটা, তারপর এটা করব; দেখা যাবে জল খাবারও সময় নেই, এতটাই বাঁধা রুটিন। প্রথম দিন হয়ত কোন রকমে করল, হয়ত দুদিন চালিয়েও দিল। তারপর দেখা যাবে কিছুই নেই; রুটিন-ফুটিন সব ভো ভাঁ।

মার্ক টোয়েন ইংলিশের খুব নামকরা লেখক, তিনি বলছেন – It is very easy to give up somoking, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়াটা কোন ব্যাপারই না, I have given it up hundred times, শতবার আমার ছাড়া হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্কল্পগুলিও এই রকমই হয়। আমরা খুব উৎসাহ, নিষ্ঠা নিয়ে নেমে পড়ি, কিন্তু কিছু দিন পরে দেখা যাচ্ছে ধরে রাখতে পারছি না। ধরে রাখা খুব কঠিন। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্র ধৃতি জিনিসটাকে, 'লেগে থাকা' এটার উপর খুব জোর দিয়েছেন।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, সাধন জীবনের সবচেয়ে বড় বিঘ্ন কি? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তরে বেশির ভাগ লোক বলবে – কামিনী কাঞ্চন। আসলে কামিনী-কাঞ্চন কোন বিঘ্নই না, ওটাকে ফুঁ মেরে উড়িয়ে

দেওয়া যায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা ধৃতির অভাব; ধরে রাখা, লেগে থাকার অভাব হল সাধন জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। দীক্ষা নেওয়া হয়েছে, প্রথম কয়েক দিন খুব জপধ্যান হল, তারপর ধীরে ধীরে জপধ্যান বন্ধ হয়ে গেল। একদিন কি করতে করতে বেলুড় মঠে এলো, সেখানে অনেককে জপধ্যান করতে দেখে মনে অনুশোচনা এলো, খুব অন্যায় করছি – নাঃ বাড়ি গিয়ে আজ থেকেই আবার খুব করে জপধ্যন করব। একদিন হল, দু-দিন হল; তৃতীয় দিন থেকে আস্তে আস্তে আবার ডাউন হয়ে যাবে। এটা হল নিষ্ঠাহীনদের কাহিনী।

ঢপবাজ হল, এরা মানুষকে বোকা বানাবার জন্যই ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। এই জিনিস শুধু যে তন্ত্র পথেই হয় তা নয়, সব জায়গাতেই হয়। মানুষ স্বভাবেই দুর্বল হয়, পরিশ্রম না করেই সাফল্য পেতে চায়, না খেটে শক্তি পেতে চায়। দিনকাল খারাপ চলতে থাকলে বলবে, হে ঠাকুর আমাকে তুলে নাও। তুলে নেওয়ার কি আছে, পাহাড় থেকে ঝাঁপ মেরে দাও না কেন; ঘরে দড়ি আছে, ঝুলে পড় না কেন, সেখানেও ভগবানের উপরে দোষটাই যাবে। দুঃখ কষ্টে মরতে চাইছে, মরতে পারছে না, সেটার দোষটাও ঠাকুরের উপর যাবে। না হয় তুমি টাকা আয় করতে পারলে না, না হয় তুমি জীবনে সফল হতে পারলে না, না হয় হাত থেকে সব কিছু চলে গেছে, এখন মরে যেতে চাইছ, সেটা তুমি করে নিলেই পার, সেটাও পারবে না; সব দোষ ঠাকুরের উপর যাবে।

সাধারণ মানুষ জীবনের সব কিছু ঈশ্বরের মাধ্যমে চায়, নিজের মৃত্যু পর্যন্ত। এখানে স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে না, যারা এই ধরণের কথা বলে তাদের কথা বলছি। তখন ওরা খুঁজে বেড়ায় কোন বাবাজী এই রকম করে দেবে। আর যে বাবাজীরা বলে আমি করে দেব, সেই বাবাজীরা সব ঢপ হয়, প্রত্যেকটি বাবাজী ঢপ হয়। কারণ যে সত্যিকারের একজন সাধু বাবাজী, তিনি জানতেও দেবেন না যে তিনি একজন বড় মহাত্মা। আমরা ঠাকুরকে দেখছি, কেউ যখন তাঁর কাছে আসত, উনি পাশ কাটিয়ে যেতেন। ঢপ বাবাজীদের নানান রকমের প্রস্তুতি আছে, কাকে কিভাবে ট্র্যাপে ফেলবে, যেটা দিয়ে আপনাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে। ছাগল এসে বলছে, আমাকে কেটে খাও; মুরগি এসে বলছে, আমাকে কেটে খাও; কেউ এই সুযোগ হাতছাড়া করবে! আপনি বোকা হতে চাইছেন, আর বোকা বানানোর ওস্তাদকে গিয়ে বলছেন – আপনি আমাকে একটু বোকা বানান। যখন বলছেন, আমাকে একটু কৃপা করুন বাবাজী, তার মানে আপনি হাতজোড় করে বলতে চাইছেন – প্রভু আমি এসেছি, আমার গলাটা কাটুন। সে তো এর জন্যই প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে। তখন এরা নানা রকমের ফন্দি আঁটে, কখন কাউকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়ে নিচ্ছে, কাউকে তন্ত্র করিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে তন্ত্রে আবার পঞ্চ মকার সাধন আছে – মৎস, মাংস, মদিরা, মুদ্রা ও মৈথুন। যার জন্য স্বামীজী পরে যখন রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী তৈরী করলেন, সেখানে তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, এখানে যে তন্ত্র সাধন করবে তাকে মঠ থেকে বার করে দেবে। ঠাকুর নরেনের কথা উত্তরে বলছেন –

"**শ্রীরামকৃষ্ণ – ও-সব পথ ভাল নয়, বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই হয়**"। পতন আর হবে কি, পতন হওয়ার জন্য তো এগিয়েই আছে, সেইজন্য সেখানে নূতন করে পতন হওয়ার আর কিছু নেই। "**বীরভাবে সাধন, দাসীভাবে সাধন, আর মাতৃভাবে সাধন! আমার মাতৃভাব। দাসীভাবও ভাল। বীরভাবে সাধন বড় কঠিন। সন্তানভাব বড় শুদ্ধভাব**"।

এখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হয়ে সবাই নিজের নিজের মতকে জাহির করার সুযোগ পেয়ে গেছে। সোস্যাল মিডিয়াতে একটু সার্চ করুন, দেখবেন মুসলমান, খ্রীশ্চান, হিন্দু, হিন্দুদের বিভিন্ন পন্থীরা এক অপরকে গালাগাল দেওয়ার সাথে সাথে নিজেদের মতটাকে শ্রেষ্ঠ দেখাতে গিয়ে কিসব কিসব যুক্তি, কাহিনী নিয়ে আসছে। একটু আগে দেখলাম ইন্টারনেটে একটা প্রশ্ন এসেছে – হিন্দি বা ইংলিশে গীতার উপর সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা কার? আমি একটু কৌতুহল হয়ে নেট খুলে দেখতে চাইলাম দেখি কার নাম আছে। যার নাম লিখেছে তার নাম আমি জীবনে শুনিনি। কিন্তু তার প্রশংসা পুরো এক পাতা জুড়ে।

কেন উনি শ্রেষ্ঠ? কারণ একমাত্র উনিই ঈশ্বর দর্শন করেছেন, বাকিরা কেউ ঈশ্বর দর্শন করেনি। এই ধরণের কথা এখানে এত চলছে যে, খুব তপস্যা যদি না থাকে, নিষ্ঠা যদি না থাকে, ঈশ্বরের কৃপা যদি না থাকে, মানুষ এইসব কথাতে হারিয়ে যায়। বীরভাব, ঠাকুর এগুলো সব কাটিয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুরের ভাব হল সন্তান ভাব। ঈশ্বরের প্রতি এই ভাব রাখার জন্য বলছেন – হে প্রভু আমি তোমার সন্তান; এর বাইরে অন্য আর কোন কিছু করতে যেও না।

"নানকপন্থী সাধুরা ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন 'নমো নারায়ণায়'। ঠাকুর তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন"। উত্তরাখণ্ডে এটা খুব প্রচলিত, যে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করা। সবার হৃদয়ে সেই অন্তর্যামী নারায়ণ আছেন, তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছেন, বা ভগবানকে প্রণাম জানাচ্ছে। যেমন আমাদের মিলিটারিতে আছে সেলুট করে 'জয় হিন্দ' বলতে হয়, ওই রকম 'নমো নারায়ণায়' এই বলে এক অপরকে অভিবাদন করা।

অন্যরা এসে গেছেন, তাই ঠাকুরের কথাগুলোও অন্য রকম সাধারণ কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে। এখানে ঠাকুর **"ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়"** এই কথা বলে একটা কাহিনী বলছেন। নারদ ঋষি যাচ্ছিলেন, দুজন যোগী ঈশ্বরের সাধনা করেন, একজন নারদ ঋষিকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি নারায়ণের কাছ থেকে আসছেন, তিনি এখন কি করছেন? নারদ বললেন, তিনি ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট হাতি প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার বার করছেন। শুনে একজন বলছেন, তার আর আশ্চর্যের কি। আরকেজন বলছেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

এই একটা প্যারাগ্রাফকে তুলে আপনি যদি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে যারা লিবারাল, র‍্যাশানাল, যুক্তিবাদী সবাই হৈচৈ লাগিয়ে দেবে। কিন্তু একটা নামকরা কথা আছে – God explained is no God। ঈশ্বরের ব্যাখ্যা যদি কেউ করে দেয়, তাহলে ঈশ্বর আর কোথায় থাকলেন। কারণ তখন ঈশ্বর মনের এলাকার জিনিস হয়ে গেলেন। শাস্ত্রে বারবার একটা কথাই ঘুরে ঘুরে বলে যাচ্ছেন – *অবাঙ্মনসগোচরম্*, ঈশ্বর মন ও বাণীর পারে। এবার আপনি ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন, ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন মানে, আপনি তাঁকে মনের এলাকায় বেঁধে দিলেন, বিপরীত হয়ে গেল। এগুলো না বুঝেই লোকেরা বলবে, এর কি যুক্তি? কি করে এটাকে নিয়ে যুক্তিতর্ক করতে যাবে। যে জিনিসটা পুরোপুরি মনের বাইরে, মনের বাইরে তার মানে যুক্তিতর্কের পারে; তার মানে এই নয় যে তিনি irrational। তিনি যুক্তিতর্কের পারে। ফলে উনি কি করতে পারেন, কি না করতে পারেন; এটাকে নিয়ে আলোচনা হয় না। এই যে আলোচনা হয় না, তিনি যুক্তিতর্কের পারে, এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য, ব্যাখ্যা করার জন্য এই ধরণের গল্প বলা হয় – তিনি ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট হাতি পার করাচ্ছেন। আদৌ তিনি করাচ্ছেন কিনা আমরা কি করে জানব! করাতে পারেন কিনা আমরা জানি না। পারবেন বা পারবেন না, আমরা কোনটাই জানি না। আমরা শুধু এটা জানি, ঈশ্বর মন-বাণীর পারে; ফলে তাঁর সমস্ত ক্রিয়া মন-বাণীর পারে। ফলে আপনি কখন কোন পরিস্থিতিতে বলতে পারেন না যে, ঈশ্বর এই রকম করেছেন। আমরা যে কথায় কথায় বলি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা ঠাকুরের ইচ্ছা, যদি আপনি এই বোধ নিয়ে বলেন, আমার জানা নেই, আর তিনি যুক্তিতর্কের পারে, তাহলে আপনি একেবারে ঠিক বলছেন। কিন্তু আপনি যদি অন্য ভাব নিয়ে বলেন, তিনি ইচ্ছা মাত্র এটা অন্য রকম করে দিতে পারেন বা আমি প্রার্থনা করেছি তিনি শুনবেনই শুনবেন, আমার শুদ্ধ চিত্ত তিনি শুনবেনই শুনবেন; তাহলে আপনি নিজের তর্কে নিজেই ফেঁসে যাচ্ছেন।

একজন মহারাজ মজা করে বলতেন, 'একজন বলছেন শুদ্ধ হৃদয় থেকে প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন', তার উত্তরে আবার আরেকজন বলছেন, 'যার যেটা পাওয়ার সে সেটাই পাবে তার বেশি পাবে না'। কে ঠিক? দুজনই ঠিক। কারণ কর্মফল যেটা আসছে সেটাও তাঁর ইচ্ছাতেই আসে। কোনটা হয়, কোনটা হয় না, কেউ জানে না। একটা সাধারণ ঘটনা হল, আমাদের মন এমন যে, আমরা

প্যাটার্ন ছাড়া থাকতে পারি না, যুক্তি তর্ক ছাড়া আমরা থাকতে পারি না। বাচ্চা বয়স থেকে আমাদের কাছে একটা যুক্তি আছে যে, খেলে পেট ভরে, পেট ভরলে শরীরে শক্তি হয়, সেইজন আমরা খাওয়া-দাওয়া করি। কিন্তু পেটের গণ্ডগোল হলে খেলে কি হয় দেখুন, পুরো উলটো হয়ে যাবে। বোঝানর এটা একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দেওয়া হল।

এই যে কার্য-কারণ সম্পর্ক, এর থেকে অসম্ভব জিনিস আর কিছু হয় না। আমাদের জগৎ যেটা চলছে, সেখানে আমাদের চোখের সামনে যা কিছু আসছে, সেটা দেখে মনে হয় এখানে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। দুই-এ দুই-এ চার হয়, আসলে কি দুই-এ দুই-এ চার হয়? বেশির ভাগ সময় এটাই হয়, আবার নাও হতে পারে। বিভিন্ন ম্যাথম্যাটিক্যাল সিস্টেমে যদি নিয়ে যাওয়া হয়, দেখবেন ওটা পালটে যাবে। কিন্তু এটাই খন ঈশ্বরের এলাকায় চলে যাচ্ছে, শুদ্ধ চৈতন্যের এলাকায় চলে যাচ্ছে, তখন আর কোন কথা বলা যাবে না। সেইজন্য বলছেন, ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব না। আমরা আবার এটাকে অন্য ভাবে নিই; কিছুই অসম্ভব না, সেইজন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি এটা করে দেবেন।

এত উচ্চমানের কথা, যার তত্ত্বগুলি এত গভীর, এইসব কথা চলছে। এরপর মনোমোহন কোন্নগর থেকে সপরিবারে এসেছে, সবাইকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছেন। **"ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিয়া বলিলেন 'আজ ১লা, অগস্ত্য, কলকাতায় যাচ্ছ; কে জানে বাপু'! এই বলিয়া একটু হাসিয়া অন্য কথা কহিতে লাগিলেন"**। বাংলা মাসের এক তারিখকে অগস্ত্য বলে, মাসের প্রথম দিনটাকে অশুভ মনে করা হয়। আগেকার দিনে বিভিন্ন টোলে বা আশ্রমে পয়লা তারিখ অশুভ বলে আচার্যরা পঠন-পাঠন করাতেন না, কোন যাত্রাও করা হত না।

কাহিনী হল, অগস্ত্য মুনি খুব বড় একজন ঋষি ছিলেন, তাঁর বিশাল যোগ ক্ষমতা ছিল। মহাভারত ও রামায়ণে ওনার অনেক কাহিনী আছে। দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের তাড়া খেয়ে অসুরগুলো সমুদ্রে লুকিয়ে যেত, সেই কারণে দেবতারা অসুরদের কিছু করতে পারতেন না। অগস্ত্য মুনিকে বলা হল। উনি সমদ্রের পারে এসে এক গণ্ডুষ জল পান করে নিলেন, পুরো সমদ্রের জল তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে গেল, যার ফলে সমুদ্র শুকিয়ে গেল।

এটা তো গেল তাঁর যোগের একটা কাহিনী। অন্য দিকে আছে যে, আগেকার দিনে ওনাদের জ্যোতির্বিদ্যার অতটা জ্ঞান ছিল না। ওনারা দেখতেন সকালে সূর্য এক দিকে দিয়ে উঠে সারাদিন আকাশের এই দিক দিয়ে গিয়ে বিকালে আরেক দিক দিয়ে ডুবে যায়। ওনারা মনে করতেন উত্তর দিকে কোথাও পাহাড় আছে, যার নাম সুমেরু পর্বত। সূর্য এই সুমেরু পর্বতকেই প্রদক্ষিণ করে। যখন পাহাড়ের পিছনে সূর্য চলে যায় তখন তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতে বিন্ধ্যাচল পর্বত আছে, সে বলল, আমি সুমেরু পর্বতের থেকেও বড় হব, সূর্যকে আমায় প্রদক্ষিণ করতে হবে। বিন্ধ্যাচল বড় হতে শুরু হয়েছে। ফলে চারিদিকে প্রচুর সমস্যা তৈরী হয়ে গেল। প্রথম সমস্যা, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের লোকেদের এপার ওপার করা খুব কঠিন হয়ে গেল। দ্বিতীয় সমস্যা, সুমেরু পর্বতকে পরিক্রমা করার সময় সূর্যের পথ আটকে যাবে। অন্য দিকে বিন্ধ্যাচল পর্বতকে যদি সূর্যের পরিক্রমা করতে হয়, তাহলে তো পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাই দেবতারা আবার অগস্ত্য মুনির শরণাপন্ন হলেন। সব শোনার পর অগস্ত্য মুনি তাঁর স্ত্রী লোপমুদ্রাকে নিয়ে যাত্রা করলেন দাক্ষিণাত্যের দিকে।

বিন্ধাচলের কাছে এসে উনি বলছেন, 'বিন্ধ্যাচল আমাকে ওই দিকে যেতে হবে, কিন্তু তুমি এত উঁচু হয়ে গেছ যে আমার পক্ষে ওপারে যাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছে। তুমি তোমার মাথাটা একটা নোয়াও'। বিন্ধ্যাচল অগস্ত্য মুনিকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নীচু করে প্রণাম করেছে। বিন্ধ্যাচলের মাথাটা নিচু হয়ে গেল। যাওয়ার সময় অগস্ত্য মুনি বললেন, 'আমি তো চলে যাচ্ছি কিন্তু তুমি তো আবার

বাড়তে শুরু করে দেবে, তখন আমি ফিরব কি করে'? বিন্ধ্যাচল বলল, 'আপনি যত দিন না ফেরেন আমি আমার মাথা এভাবেই নীচু করে রাখব'। অগস্ত্য মুনি স্ত্রীকে নিয়ে ওপারে চলে গেলেন, দাক্ষিণাত্য থেকে তিনি আর কোন দিন ফেরৎ এলেন না। এখনও বিন্ধ্যাচল ওই ভাবেই মাথা নীচু করে আছে। মানবজাতির স্বার্থে অগস্ত্য মুনি নিজের জন্মভূমি উত্তর ভারত ছেড়ে চিরদিনের জন্য দক্ষিণ ভারতে চলে গেলেন। এই যে বলা হয়, সাধু-সন্তরা যা কিছু করেন সব অপরের কল্যাণের জন্যই করেন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বলা হয় যে, অগস্ত্য মুনি বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অগস্ত্য মুনি ওই ভাবে গিয়ে কোন দিন ফেরত এলেন না, এটাকে বলা হয় অগস্ত্য যাত্রা। অগস্ত্য মুনি হয় মাসের প্রথম দিন এই যাত্রাটা করেছিলেন, কারণ ক্যালেণ্ডার বিক্রম সম্পাতের পর পালটে গেছে, আমরা ঠিক জানি না। বারবেলা, অগস্ত্য যাত্রা, অশ্লেষা নক্ষত্র, এগুলো হিন্দুদের অনেকেই এখনও মানে। ঠাকুর কোন কিছু ভাঙতে আসেননি। এখন অগস্ত্য যাত্রা, এটা ঠিক না ভুল, সত্য না মিথ্যা আমরা জানি না, লোকেরা বলে আসছে, তাই মানতে হয়। আমাদের একজন মহারাজ আছেন, উনি নিজেকে খুব যুক্তিবাদী মনে করেন। উনি এগুলোকে নিয়ে আমাদের কাছে বলতেন, ঠাকুর অযৌক্তিক ছিলেন। এতদিনেও আমরা ওনাকে বোঝাতেই পারলাম না যে, ঠাকুর কেন অযৌক্তিক হতে যাবেন। যে কোন আচার্য, ভগবান বুদ্ধই হন, যীশু খ্রীষ্টই হন, এনারা কখন সমাজের প্রচলিত ধারাকে ভেঙেচুরে কোন পরিবর্তন আনেন না। অগস্ত্য যাত্রা মানতে হবে না, এগুলো অযৌক্তিক, অবতাররা কক্ষণ এই জিনিস করতে যাবেন না। যাঁরা প্রচারক হন, তাঁরা এগুলো করেন। যাঁরা সত্যিকারের আচার্য তাঁরা জানেন গোলমালটা কোথায় আছে, ওনারা সেই জায়গাতে হাত লাগান। ওই জায়গাটাকে ঠিক করে দিলেন, বাকি জিনিসগুলি নিজে থেকেই ঠিক হয়ে গেল।

এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ঠাকুর কি অগস্ত্য যাত্রা মানতেন? আমাকেই যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলব, আমি জানি না। কথামৃতে তাহলে কেন আছে? কারণ ওটা সবাই মানছে, এটা হিন্দুদের একটা মত, উনিও তাই ওটা মানবেন। অগস্ত্য যাত্রা করলে আর ফেরত আসবে না, কিংবা অশুভ কিছু হবে, এটাকে মানা উচিত কি উচিত না, আমরা এটাও জানি না যে, এটা কোথা থেকে এসেছে। কারণ এগুলো আধ্যাত্মিক কিছু জিনিস না, এগুলোকে মেনে নেওয়া হয়েছে, কবে হয়ত দু-চারটে ঘটনা কিছু ঘটে গেছে, সেখান থেকে অগস্ত্য যাত্রা হিন্দু সমাজে ঢুকে গেছে। ঠাকুরও ওটাকে ভাঙবেন না। অন্য কোন অবতারও কোথাও এই ধরণের কিছু করবেন না। যেগুলো এক একটা খুব হাস্যকর কথা, স্বামীজী সেগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছেন, তার বেশি কিছু না।

নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুরা স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর ব্যগ্র হইয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, "যাও বটতলায় ধ্যান কর গে, আসন দেব"?

নরেন্দ্র ও তাঁর কয়টি ব্রাহ্মবন্ধু পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেছেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পরে সেইখানে উপস্থিত; মাস্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) – ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নিচে রত্ন পাওয়া যায়?

একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম – ভক্তিই সার। এখন বলছেন, ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। পরে এই ভাবের উপরেই ঠাকুর গান করছেন, সেখানেও বক্তব্য হল, উপর উপর ভাসলে কি জলের নিচে রত্ন পাওয়া যায়? গান হচ্ছে – ডুব দে মন কালী বলে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে। যখন জপ করা হয়, যখন ধ্যান করা হয়, যখন ভক্তি করা হয় – তখন ডুব দিতে হয়। নিয়ম রক্ষার জন্য জপধ্যান অনেক দিন তো করলেন, আর কত করবেন।

আমি একবার খুব সিনিয়র এক মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাধু-সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক জীবন কবে শুরু হয়? উনি বললেন, প্রথম দশ পনের বছর এমনিই চলে যায়, কারণ তখন রজোগুণের তোড় থাকে সব সময় মনে করে আমি এটা করব সেটা করব, আমাকে এটা করতে হবে। মোটামুটি পনের বছর, কুড়ি বছর হয়ে গেলে সাধুরা বহির্জগতের থেকে মন গুটিয়ে নেন। এখন যাঁরা বাইশ তেইশ বছরে জয়েন করছেন, আমি তো কুড়ি বছরে জয়েন করেছিলাম; কুড়ি আর কুড়ি যোগ চল্লিশ বছর বয়স যখন হয়ে গেল, তার মানে আপনার জীবনে যা কিছু পাওয়ার হয়ে গেছে; এবার যা আছে হারানোর আছে। চল্লিশের পর থেকে মানুষ আর কিছু পায় না, হারায়। এরপরে ধীরে ধীরে নিজের যে প্রকৃত অবস্থা সেটার দিকে যেতে হয়। ভক্তির দিকে মন দিতে হয়, ধ্যান আরও গভীর ভাবে করতে হয়। ঠাকুর এটাই বলছেন, ধ্যান করার সময় তাতে মগ্ন হতে হয়। এর পরে ডুব দেওয়া নিয়ে নরেনের সাথে আরও কিছু কথা হবে।

নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ পঞ্চবটীর চাতাল হইতে অবতরণ করিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের দিকে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছেন। ঠাকুর কথা বলতে শুরু করে প্রথম কথা বলছেন, ডুব দিতে। তারপর গান করলেন। এরপর কথামৃতে যে রকম আছে –

ঠাকুর বলিতেছেন, "ডুব দিলে কুমির ধরতে পারে, কিন্তু হলুদ মাখলে কুমির ছোঁয় না। 'হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে' কামাদি ছয়টি কুমির আছে। কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর তোমাকে ছোঁবে না"। এটা একটা প্রচলিত ধারণা যে জলে থাকা অবস্থায় কুমির হলুদ মাখা থাকলে ধরে না। হলুদের গন্ধেই হোক বা হলুদ রঙের জন্যই হোক কুমির তাকে আর ছোঁবে না। কিন্তু এখানে খুব মজার আলোচ্য বিষয় হল, ঠাকুর একদিকে বলছেন ডুব দাও, সাধনাতে মন দাও। এবার সাবধান করছেন – ছয়টি কুমিরের কথা বলছেন। এর আগে বলেছিলেন ভক্তিই সার, তাঁকে ভালবাসলে বিবেক বৈরাগ্য আপনিই আসে। এখানে আবার উল্টোটা বলছেন, ডুব দিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ছয়টি কুমির এসে আক্রমণ করে।

সাধারণ মানুষ এই জিনিসটাকে ঠিক ভাবে বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আমরা যাঁরা সন্ন্যাস জীবনে আছি, আমরা এটাকে খুব ভাল করে বুঝি, শুধু বুঝি না, একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝি। জপধ্যান করা হল চাষবাশ করার মত। চাষ করা মানে বীজ দেওয়া হল, জল দেওয়া হল আর সার দেওয়া হল। যেমনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্‌গমন হতে শুরু করে তেমনি জমিতে আগাছাগুলিও জন্মাতে শুরু করে। আগাছা তো এমনিতে জংলি, নিজে থেকেই এগুলো দাঁড়িয়ে যায়। এখন জলও পাচ্ছে, তার সাথে সারও পাচ্ছে। জংলি আগাছাগুলি খুব জোর পেয়ে বড় হতে শুরু করে। আসল গাছকে এরা মেরে ফেলে। এমনি ভাসা ভাসা যাঁরা ঈশ্বরের নাম করেন, তাঁরা এই সমস্যাটা বুঝতে পারবেন না।

প্রথমে আমরা সাধু সন্ন্যাসীদের কথা বলছি, মানুষ যখন সাধন-ভজনের দিকে যায়, প্রথমে তাঁরা সংসার থেকে আলাদা হয়ে যান। ঠাকুর অনেকবার বলবেন, সংসারে থাকলে অনেক সুবিধা, checks and balance থাকে। আপনি যদি কিছু গোলমাল করেন, তাহলে আপনাকে এখানে আটকাবে সেখানে আটকাবে, এখানে এলেমেলো হচ্ছে ওখানটা চেপে দেবে। সন্ন্যাসীরা একদিকে যেমন স্বাধীন হয়ে গেলেন, কাঁধে কোন বোঝা নেই, তেমনি protection কিছু থাকে না। একদিকে জপধ্যান করছেন অন্য দিকে কি হয়, আগাছাগুলো জন্মাতে শুরু করে। আগাছা যেগুলো জন্মাচ্ছে, সবটাই জোরালো।

অনেক আগে, প্রায় দুই জেনারেশান, তিনি জেনারেশান আগে আমাদের এক মহারাজ বলতেন, পুরাণে যে রম্ভা, মেনকা অপ্সরাদের কথা বলা হয়েছে, আমাদের এগুলো লাগবে না, আমাদের ঘুঁটে কুড়োনি, মেথরানী হলেই হয়ে যায়। পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ, যিনি এত গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, একটা সময় উনি আমাদের এক সেন্টারে ছিলেন। সেখানে এক ব্রহ্মচারী ছিল, রূপে গুণে

খুব আকর্ষণীয় ছিল। যাই হোক কিভাবে কিভাবে একজনের পাল্লায় পড়েছে। যাই হোক সাধু সন্ন্যাসী যখন এগুলো করে লুকিয়ে করে। শেষে কথাগুলো যখন বেরিয়ে এসেছে, কিভাবে কিভাবে গম্ভীর মহারাজ দেখেছেন। মহারাজের মনে একটা ধাক্কা লেগেছে। উনি সাধারণত এভাবে কথা বলেন না, কিন্তু ওনার মুখ দিয়ে এই ধরণের কথা বেরিয়ে গেছে। 'এই মেয়েটির জন্য তুমি তোমার জীবনটাকে নষ্ট করলে'। মেয়েটি দেখতে অতি সাধারণ ছিল।

সন্ন্যাসীর মন ফাঁকা হয়ে যায় কিনা, চেকস এণ্ড ব্যালেন্স থাকছে না, বাবা, মা, বন্ধু এনারা সংসারে যে চেকস এণ্ড ব্যালেন্স দেন সেটা সন্ন্যাসীদের থাকে না। তার সাথে মন পুরো ফাঁকা হয়ে গেছে। ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো প্রচণ্ড পাওয়ারফুল হয়ে যায়। যাঁরা সংসারে আছেন, সংসার বলতে যাঁরা ঘর-বাড়িতে আছেন যেখানে ভাই আছে, বোন আছে, কেউ না কেউ আছে, সেখানে কোন না কোন ভাবে চেকস্ এণ্ড ব্যালেন্স হয়ে যায়। কিন্তু যেমনি সাধন-ভজনে ঠিক ঠিক ডুব দিল, তখন গোলমাল হতে শুরু হয়। এনাদেরও হয়, কিন্তু তত জোর থাকে না, সাধন-ভজনে যত ডুব দেবে তত এগুলো জোরালো হয়।

আমরা কালির দোয়াতের উপমা ব্যবহার করি। কালির দোয়াত অনেক দিন ব্যবহার করা হয়নি, কালি ভিতরে শুকিয়ে জমে গেছে। দোয়াতে যেমনি জল দেওয়া হবে কালো জল বেরোতে শুরু হয়ে যাবে। যত জল দেওয়া হবে, তত কালো কালি বেরোতে থাকে। সেইজন্য যাঁরা সাধন-ভজন করেন, যদিও ঠাকুর আগে বললেন, ভালবাসা থাকলে এগুলো হয়, কিন্তু ভালবাসা তো একদিনে হয় না, সেই রাধার মত ভালবাসা তো একদিনে হয়ে যাবে না। তত দিন তাকে তাই ভয়তরাসে হয়েই থাকতে হবে। আর বিবেক-বৈরাগ্য যদি একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে না গিয়ে থাকে, যার জন্য সাধুরা যখন একজোট হয়ে থাকেন, আমাদের যেমন আশ্রমগুলি আছে, এখানে যেন আরেকটা সংসার পাতা হয়েছে, সংসারে যে সুবিধাগুলো আছে আর সংসারে যে সমস্যাগুলি আছে, তার কোনটাই এই সংসারে নেই। ফলে আমাদের সাধুরা এক অপরকে সাহায্য করতে পারে, এক অপরের উপর ব্যালেন্স রাখতে পারে। কোন সন্ন্যাসী একটু বাইরে বেশি ঘুরঘুর করতে শুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাকিদের চোখে পড়ে যাবেন। তখন সরাসরি হোক, ঘুরিয়ে হোক একটা সঙ্কেত দিয়ে দেওয়া হয় যে, ভাই তোমার এটা ঠিক হচ্ছে না।

কিন্তু সমস্যাকে আটকানো যাবে না, সমস্যা আসবেই। সাধন ভজনে যেই ডুব দিক, সন্ন্যাসীই নামুক, গৃহস্থই নামুক কাম ক্রোধ এগুলো পর পর চাড়া মারবেই। সবটারই মূলে কাম। হঠাৎ ইচ্ছে হল, এই রকম দেখতে চাই, এই ইচ্ছাটাই এবার টানবে, বিঘ্ন হলেই রেগে যাবে। কোন মহারাজকে যদি দেখি বেশি রাগারাগি করছেন, আমি বুঝি ভিতরে গোলমাল চলছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি ভালবেসে মহারাজকে সাবধান করে দিই।

ঠাকুর যদিও ছয় রিপুর কথা বলছেন, রিপু আসলে একটাই, ওই একটাই ছয়টি রূপে আসে। সাধুরা লক্ষ্য রাখে, ওর কাছে কটি ভক্ত আসে, আমার কাছে কটি ভক্ত আসে – এটাই মাৎসর্য, ঈর্ষা। সে কি আপনাদের সাধুদেরও এসব হয়? আরে ভাই আমাদের আরও জোর হয়, যা আপনারা কল্পনাই করতে পারবেন না। গৃহস্থদের এগুলো যখন হয়, যেমন হিংসার ভাব এসেছে, কেউ যদি বাড়িতে হিংসার ভাব নিয়ে আসে তখন তার যারা আছে, স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মা, এনারা বলবেন, অপরের দিকে তাকাতে নেই। সাধুদের তো বলার কেউ নেই, সবটাই তো তাঁদের মনে মনে হচ্ছে। ঠাকুর তাই বিবেক, বৈরাগ্যের কথা বলছেন; বিবেক বৈরাগ্য না থাকলে এই জিনিসগুলো একেবারে শেষ করে দেবে। সাধুদের গৃহস্থদের মত প্রোটেকশান নেই কিনা, সেইজন্য সাধুদের শেষ হওয়া খুব সহজ। ঈশ্বর কৃপা করে যদি না বাঁচান, সাধুদের বাঁচার কোন পথ থাকবে না।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, শ্রেয়র পথ অত্যন্ত কঠিন, এতই কঠিন যে, এতজন যে পড়ে যায় এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু কেউ কেউ যে পথ উতরে লক্ষ্যে পৌঁছে যান, এটাই আশ্চর্যের।

আমি তাই যখন কোন বয়স্ক সন্ন্যাসীকে দেখি, দেখে অবাক লাগে, কি করে এতটা পথ চলে এলেন! নূতন যারা জয়েন করে, ওদের দেখে আতঙ্ক লাগে; হে ভগবান এই লম্বা পথ চালাবে কি করে। কারণ এই ষড়রিপুর কথা বলা হচ্ছে, এরা অনবরত আক্রমণ করে যাচ্ছে। আর বিবেক, বৈরাগ্য যদি না থাকে তাহলে খুব বিপদ। ঠাকুর এখানে সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়ে বলছেন না, নরেনাদি ব্রাহ্মভক্তদের উদ্দেশ্যে যখন বলছেন, তখন এটা সবার জন্যই বলছেন যে, বিবেক, বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে কামাদি ছয়টি কুমির কিছু করতে পারে না। এখান থেকে ঠাকুর এবার তাঁর প্রিয় বিষয়, যেটা কথামৃতের সব জায়গাতে পাওয়া যাবে, সেটাকে নিয়ে বলছেন।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজে লেকচার দেওয়ার প্রথা ছিল। লেকচারের প্রচলন খ্রীশ্চানিটি থেকে এসেছে, খ্রীশ্চানিটি ছাড়া লেকচারের ধারা কোথাও নেই। ইসলামে প্রার্থনা পরিচালিত করা হয়; ইমাম বা মোজাইন যাঁরা থাকেন তাঁরা নমাজের সময় সামনে থেকে নমাজকে পরিচালনা করেন, এ-ছাড়া তাঁরা লেকচার দেন না। হিন্দুদের তো লেকচারের প্রথা একেবারেই নেই। হিন্দুদের হল প্রবচন, প্রবচন হল কোন একটা শাস্ত্রকে আধার করে, আমরা যেমন করছি, শাস্ত্রকে একজন নিজের মত ব্যাখ্যা করলেন। শাস্ত্রে যেটুকু বলা হয়েছে, তার বেশি ডানদিক বামদিক যাওয়া যাবে না। এই যে ভাগবত সপ্তাহ হয়, সেখানে নাচ, গান, পাঠ সব কিছুই করছে; বিশেষ করে রাসলীলাদির বর্ণনা যখন করা হয় তখন তাঁরা ওই ভাবেই করেন। কিন্তু শাস্ত্রের বাইরে যেতে পারবে না। আপনি কতক্ষণ আর চালাবেন, খুব জোর এক ঘন্টা, আপনি পরের দিন যখন শুরু করবেন তখন পরের শ্লোক থেকেই শুরু করতে হবে। লেকচারে এই ব্যালেন্সটা রাখা হয় না। আপনি আলফাল বলে সারা জীবন লেকচার চালিয়ে যেতে পারেন। যার জন্য খ্রীশ্চান ট্রাডিশানে সব মজার মজার কাহিনী পাওয়া যায়।

ইংলিশে পি জি উডহাউস একজন নামকরা হিউমারাস লেখক আছেন। তিনি এই জিনিসগুলিকে নিয়ে খুব মজার মজার কাহিনী লিখতেন। খ্রীশ্চান ফাদার লেকচার দিতে যাচ্ছেন, তাঁর লেকচারটাকে কে চুরি করে নিচ্ছে, এই ধরণের মজার কাহিনী বলেন। খ্রীশ্চানদের এই লেকচার দেওয়া নিয়ে স্বামীজীও খুব মজা করতেন। একটা যেমন বলছেন, একজন ফাদার খুব বাজে লেকচার দিত। সেই ফাদারকে লোকেরা বলে দিল যে, আপনার এত বাজে লেকচার হলে আমরা আর আপনাকে রাখব না। পরের রবিবার, রবিবার দিনই লেকচার হয়, এসে ফাদার একটা 'V' সাইন মারল আর খুব সুন্দর একটা বিরাট লম্বা লেকচার দিলেন, লেকচার শেষ করে একটা 'ভি' দিয়ে নেমে এলেন। সবাই বলল, 'আপনার লেকচার তো দারুণ হয়েছে, কিন্তু 'ভি' সাইন মারলেন কেন'? বললেন, 'না, ওটা কোটেশান'। আরেকজনের স্পীচ মুখস্ত করে এসে পুরোটা এখানে ঝেড়ে দিয়েছে, তাই 'ভি' সাইন দিয়ে বলে দিলেন, কোটেশান শুরু হল আর কোটেশান শেষ হল।

ক্যাসানোভার অনেকগুলো কাহিনী আছে, ভল্টায়ারের সাথেও ওনার দেখা হয়েছিল। ক্যাসানোভা এক সময় খ্রীশ্চান ফাদার ছিল। উনি একটা ভাল লেকচার দিয়েছিলেন, সেই থেকে ওনার একটা আত্মবিশ্বাস হয়ে গেছে। তারপরে ওনার আরেকটা লেকচার দেওয়ার কথা ছিল, এত আত্মবিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, উনি মনে করলেন প্রস্তুতি না নিয়েও একটা ভাল লেকচার দিয়ে দিতে পারব। কিন্তু লেকচার দেওয়ার সময় শ্রোতাদের সামনে দাঁড়াতেই লেকচারটা ভুলে গেছেন, আর লেকচার দিতে পারলেন না। ওটাই ওনার জীবনের শেষ লেকচার ছিল, জীবনে আর লেকচার দেননি, আর খ্রীশ্চান ফাদার হওয়াটাও বাদ দিয়ে দিলেন। এরপর নানা রকমের কাহিনী রয়েছে।

ঠাকুর এই লেকচার দেওয়া জিনিসটাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না, সেইজন্য আমাদের মঠ মিশনেও লেকচার দেওয়ার রেওয়াজ নেই। বিশেষ বিশেষ দিনে ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে নিয়ে আমাদের মহারাজরা বলেন ঠিকই কিন্তু সাধারণ ভাবে আমাদের হল শাস্ত্রকে আধার করে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের

ব্যাখ্যা করা। এই শাস্ত্র আছে, আপনি একে আধার করে বলুন, কিন্তু বেশি নিজের মত ব্যাখ্যা করতে যাবেন না।

"পাণ্ডিত্য কি লেকচার কি হবে যদি বিবেক-বৈরাগ্য না আসে। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু; এর নাম বিবেক"।

এবার ঠাকুর বিবেক-বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা করছেন। ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য। সন্ন্যাসীরা যখন শাস্ত্র পড়ান, বিশেষ করে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আছে, গোলপার্কে আছে, যেখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করানো হয়, এবং মহারাজরাই সেখানে শাস্ত্র পড়ান, লোকেরা সেখানে শুনতে আসেন। কারণ ওনারা ধরে নেন ইনি সন্ন্যাসী। যতই ঢপবাজ হন, নিষ্ঠাবান হন, অনিষ্ঠাবান হন, যাই হন, কিছু তো বিবেক-বৈরাগ্য আছে, তা নাহলে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসতে পারতেন না, কিছু তো একটা আছে, ফলে লোকেরা সন্ন্যাসীর কথা শোনেন। সন্ন্যাসী থাকলে সংস্কৃতের পণ্ডিতকে লোকেরা শুনবে না। যিনি সন্ন্যাসীকে ছেড়ে সংস্কৃত পণ্ডিতকে শুনতে যান, বুঝবেন শাস্ত্রের বোঝাপড়ায় তাঁর গোলমাল আছে। যত বড় সংস্কৃত পণ্ডিত হন, যত আচারি হন, ওই যে শেষ ত্যাগ, যেখানে সমস্ত কিছুকে সন্ন্যাসী ছেড়ে দিয়েছেন, সেটা তিনি পারেননি। ক্যাথলিক ফাদাররা ঘরবাড়ি ছেড়ে দেন, তাঁরা সংসার করেন না। প্রোটেস্টান্ট ফাদাররা বিবাহ করেন, তাঁদের সংসার আছে। ফলে দেখা যায় ক্যাথলিকদের জোরটাই পুরো আলাদা, তেজ আলাদা।

"তাঁকে হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বক্তৃতা, লেকচার, তারপর ইচ্ছা হয়তো করো। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বললে কি হবে, যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? ও তো ফাঁকা শঙ্খধ্বনি"?

আমরা যে এই ক্লাশগুলো নিচ্ছি, এখানে কিন্তু আমরা লেকচার দিচ্ছি না। শাস্ত্র আছে, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাটাও দেওয়া আছে, ওটাকেই আরেকটু সহজ সরল করে বলে দেওয়া। ঠাকুর এখানে যে লেকচারের কথা বলছেন, এই লেকচার হল; 'আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ', 'আমি বলছি তোমরা শোন'। এমনকি ভাগবতেও এক জায়গায় আমরা পাই, রাজা জনক সভায় বসে আছেন, সেখানে একজন সাধ্বী এসে বলছেন, 'আমি বলছি তুমি শোন'। যেখানে বলা হয়, 'আমি বলছি আপনি একটু শুনুন', এটাতে বোঝাতে চাইছে, আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ; এ-জিনিস একেবারেই ভাল না। ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে ঠিক এখানেই খুব জোর আটকে দিচ্ছেন। ডাঃ সরকার ঠাকুরকে কিছু বলতে যাচ্ছেন, ঠাকুর খুব রেগে গেছেন। তোমার কথা কি শুনব; তুমি কামী, লোভী, অহঙ্কারী। এই কথা ঠাকুরের মত অথরিটি যাঁরা তাঁরাই বলতে পারেন, আমাদের এই কথা বলার কোন অধিকার নেই। কারণ এই সমস্যাগুলো আমাদের ভিতরেও রয়েছে, কিন্তু অন্য রূপে রয়েছে। ঠাকুর যে লেকচার দেওয়া নিয়ে বলছেন, কারণ ব্রাহ্মভক্তরা লেকচারের প্রথাটা খ্রীশ্চান ধারা থেকে নিয়েছে; বিশেষ করে কেশব চন্দ্র সেন খ্রীশ্চান ধারা থেকে নিয়ে নানান বিষয়ের উপর লেকচার দেওয়াটাকে খুব জনপ্রিয় করে দিলেন।

এরপর ঠাকুর খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন, একটা গ্রামে পদ্মলোচন নামে একটা ছেলে থাকে। লোকেরা তাকে পোদো বলে ডাকে। গ্রামে একটা ভগ্ন মন্দির পড়ে আছে। হঠাৎ একদিন কি হল পোদোর খুব জোশ এলো, ভাঙা মন্দিরে গিয়ে ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ ফুঁকতে লেগেছে। লোকেরা ভাবল হয়ত কেউ মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছে, পূজা আরতি হচ্ছে। লোকের দৌড়ে এসে দেখছেন পোদো মন্দিরের এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ শাঁখ বাজাচ্ছে। তখন সে বলছে –

মন্দিরে তোর নাহিক মাধব।
পোদো, শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল।
তায় চামচিকে এগার জনা, দিবানিশি দিচ্ছে থানা –

ঠাকুরের খুব প্রচলিত গল্প। মন্দির শঙ্খধ্বনি দিয়ে হয় না, মন্দির প্রসাদ দিয়ে হয় না। আমরা সেইজন্য মূর্তি বলি না, আমরা বলি বিগ্রহ। বিগ্রহ হল, মন্দিরের যে প্রতিমা রয়েছে সেখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইদানিং অযোধ্যা ইস্যু নিয়ে অনেক ঝামেলা চলছে, তাতে অনেকে একটা ইস্যুকে সামনে বেশি করে নিয়ে আসছেন – হিন্দুদের মন্দির হল ঈশ্বরের বাসস্থান। মুসলমানদের যে মসজিদ, এটা বাসস্থান নয়, মসজিদ হল place of prayer। হিন্দুদের place of prayer যে কোন জায়গায় হতে পারে, আমরা যে কোন জায়গায় প্রার্থনা করতে পারি। আপনি ট্রেনে যাচ্ছেন, জপ করতে করতে যেতে পারেন, ঘরে বসে জপ করতে পারেন। কিন্তু মন্দির হল ঈশ্বরের বাসস্থান, সেখানে বিগ্রহ আছে, প্রতিমা যেটা আছে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এটা অন্য কোন ধর্মে নেই। বিগ্রহ মানে, প্রভু সেখানে সাক্ষাৎ বিরাজমান। অন্যরা বলতে পারেন যে, বিগ্রহে সাক্ষাৎ ভগবান আছেন, এটা তো মনের কল্পনা। সে তো ভাই ওই অর্থে তোমার যে আল্লা সেটাও মনের কল্পনা। তুমিও আল্লাকে দেখনি, আমিও ভগবানকে দেখিনি, আমার ওইটা ভাব, তোমারও ওটা ভাব। এখানে ঠাকুর ওটাই বলছেন –

"যদি হৃদয়মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ ফুঁকলে কি হবে"। এটা ঠাকুর পছন্দ করতেন না, লোকেরা ধর্মের নামে শুধু লেকচার দিয়ে যাচ্ছে, কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে কিছু নেই।

"আগে চিত্তশুদ্ধি। মন শুদ্ধ হলে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয় – পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেকচার দিও"। এখানে ঠাকুর যে 'মাধব প্রতিষ্ঠা' বলছেন, এটাকে যে ঠাকুর ঈশ্বর-দর্শন রূপে বলছেন, তা না; ঠিক ঠিক যদি ধারণা হয়ে যায় ঈশ্বর আছেন, যেমন আচার্য শঙ্কর গীতায় বলছেন, যিনি জ্ঞানের পথ নিয়ে নিয়েছেন তিনিও জ্ঞানী; ঈশ্বরের পথ যিনি নিয়ে নিয়েছেন, তিনিও ভক্ত। যদি আপনি পথ নিয়ে থাকেন, তা যে পথই নিয়ে থাকুন, সেই পথে আপনার পতন হতে পারে, তবুও আপনি একজন ভক্ত বা জ্ঞানী। গীতায় বলছেন *জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা*; কাম-ক্রোধ জ্ঞানীদের নিত্য বৈরী। আমরা একটু আগে যে সাধন-ভজনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, গীতাও সেটা বলছেন – জ্ঞানীদের এটা নিত্যবৈরী। তখন বলছেন, জ্ঞানীর কেন নিত্যবৈরী হবে, জ্ঞানী তো আত্মজ্ঞানী? তার উত্তরে বলছেন, না, যিনি জ্ঞানের পথ নিয়েছেন, তিনিও জ্ঞানী। আর তাঁদের এই সমস্যা সব সময় হয়, ঠাকুর যেমন বলছেন ডুব দিলে কামাদি এই ছয়টি কুমির থাকবেই, মারাত্মক বিপজ্জনক। সাধারণ লোকেরা এটা কল্পনাও করতে পারেন না যে, কত সমস্যা হয়, যাঁরা সাধন-ভজনের জগতে আছেন তাঁরা জানেন। সেখান থেকে লেকচার দেওয়া নিয়ে ঠাকুর আরও বলছেন।

একজন মুসলমান প্রচারক সোস্যাল মিডিয়াতে দেখে থাকবেন সারাটা দিন হিন্দুদের নামে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে – হিন্দুরা শাস্ত্র জানে না, হিন্দুদের ওই দোষ আছে, সেই দোষ আছে। আরে ভাই একজন ভাল হিন্দুর কাছে যাও, কিছু দিন তাঁর কাছে বসো, বসে নিজেকে ঘষো মাজো। দেখবেন কোন সাধু যদি সোস্যাল মিডিয়াতে বিজ্ঞানকে নিয়ে কিছু বললে, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদীরা বলতে শুরু করবে – আপনি আগে বিজ্ঞানটা ভাল করে পড়ুন তারপর বিজ্ঞানকে নিয়ে বলবেন। ইসলামকে নিয়ে যদি কিছু বলেন, তখন বলবে, আপনি ইসলামকে নিয়ে ভাল করে পড়াশোনা করুন। যদি বলা হয়, হ্যাঁ আমি পড়েছি। তখন বলবে, আপনি আরবিক ভাষা কি জানেন? ওরা যখন হিন্দুদের নামে বলে, তখন আর এগুলো খাটে না। লিবারালসরা যখন হিন্দুদের নামে বলে, হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা করে, তখন আপনি যদি বলেন, আপনি হিন্দু ধর্মটা কার কাছে পড়েছেন বলুন তো? তখন আর কিছু বলবে না।

আমাদের প্রকাশিত 'হিন্দু জীবনধর্ম' বা ইংরাজীতে 'The Hindu Way' যদি পড়েন, যেখানে হিন্দু ধর্মকে সংক্ষেপে একেবারে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, সেখানে এই প্রশ্নটা রাখা হয়েছে,

হিন্দু কে? হিন্দু মানে যার গোত্র আছে। হিন্দু মানে গোত্র তার থাকতেই হবে, গোত্র যদি না থাকে সে হিন্দু নয়। গোত্র কোথা থেকে আসে? প্রথম হল, যে বংশে জন্ম নিয়েছে, যদি মেয়ে হয়, সে বিয়ে করার পর চাইলে গোত্র পালটে যায় বা গুরু থেকে, সে যদি চাই আমি আমার গুরুর গোত্র নিলাম, সে নিতে পারে। যিনি আপনার গুরু, সেই গুরুর গোত্রটা আপনার গোত্র। তার মানে, মেয়েদের তিনটে গোত্রের সম্ভবনা আছে, যার মধ্যে একটা কোন গোত্র নিয়ে সে চলে। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, যখনই কেউ কারুর কাছে যেত, তাকে জিজ্ঞেস করা হত, তোমার গোত্র কি? তার মানে, তুমি কোন পরম্পরায় বড় হয়েছ; তোমার আচার্য কে, তুমি কোনটা জান, কোনটা জান না।

দেখবেন মাঝে মাঝে কন্যকুব্জ ব্রাহ্মীণ, মৈথিলী ব্রাহ্মীণ, নাম্বুদ্রিপাদ ব্রাহ্মীণ এদের মধ্যে ঝগড়া হয়। আসলে হল কে কোন গোত্র, কি তার পরম্পরা এই নিয়ে বিবাদ বাধে। গোত্র, পরম্পরা এগুলো দিয়ে বোঝা যায় তোমার জীবনদর্শনটা কোথা থেকে পরিচালিত হয়। যারা হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে, তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার গোত্র কি? অর্থাৎ, কার কাছে আপনি হিন্দু ধর্ম অধ্যয়ন করেছেন? তখন আর কোন কথা বলতে চাইবে না। ওদের কথা ছেড়ে দিন, ভারতে নামকরা অনেক স্পীকারস আছে, তারা বলে আমার জ্ঞানগুলো সব আমার ভিতর থেকে এসেছে। ভিতর থেকে জ্ঞানওয়ালাদের হিন্দুরা একেবারেই বিশ্বাস করে না। ঠাকুর এদেরকে নিন্দা করতেন। একটা কিছু তোমার ভিতরে হোক, একটু শক্তি অর্জন কর, তবে তুমি লোকেদের বলবে। নিন্দাও যদি কারুর করতে হয়, তাহলে যাদের নিন্দা করছ তাদের সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা কর, তাদের সঙ্গ কর, তারপর তুমি তার নিন্দা করবে।

কুমারিল ভট্ট ছিলেন প্রধান, যিনি বৌদ্ধ ধর্মকে খণ্ডন করলেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মকে আক্রমণ করার আগে তিনি রীতিমত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন, ওদের মধ্যে ঢুকে বৌদ্ধ ধর্মের সব কিছু শিখে নিয়ে তারপর তাদের আক্রমণ করেছেন। অন্য দিকে হিন্দু ধর্ম হল গ্রামের বিধবা, যে কেউ এসে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। এটা নেগেটিভ সাইড, পজিটিভ সাইড হল, কিছুই জানে না, দুটো বই পড়ে নিয়ে ফরর্ ফরর্ করে যাচ্ছে। তুমি হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করার আগে অন্তত একটা বইকে পড়ে নিয়ে সেটাকে আধার করে নাও। হিন্দিতে একটা খুব প্রচলিত বই আছে 'গীতাসার', চারিদিকে ঝোলান দেখতে পাওয়া যায়, বাংলাতেও বোধ হয় এখন বেরিয়েছে। গীতাসারে যে কটি কথা লেখা আছে, তার একটি কথাও গীতাতে নেই। যো হো রহা হ্যায় ও ঠিক হো রহা হ্যায়, গীতার কোথাও এই কথা নেই। প্রত্যক্ষ তো ছেড়ে দিন, পরোক্ষ ভাবেও কোথাও নেই। এ-সব দেখলে দুঃখও হয়।

একবার দিল্লীতে একজনের সাথে দেখা করতে গিয়ে এক সম্প্রদায়ের এক সাধুবাবার সাথে দেখা হল। উনি বলছেন, 'গীতাতে বলছেন, ভাল কাজের জন্য যদি মিথ্যাও বলা হয়, সেই মিথ্যাটাও সত্য'। শোনার পর আমি প্রচণ্ড রেগে গেলাম, 'গীতার কোথায় আপনি পেয়েছেন এই কথা? গীতার কোথাও বলছে না। আপনি সন্ন্যাসী, গীতা আপনার আদর্শ আর আপনি গীতা যেটা বলেনি সেটাকে গীতার কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, গীতার ভুলভাল উদ্ধৃতি দিয়ে যাচ্ছেন'! এই ধরণের লোকেরাই আজকাল টিভিতে, ইন্টারনেটে sensation। হয় একটু নিজে নেচে দেয়, তা নাহলে অডিয়েন্সকে নাচিয়ে দেয়, এরাই আজ লোকেদের কাছে পপুলার। কোন পরম্পরা নেই, কোন আচার্যের তত্ত্বাবধানে বড় হয়নি। একজন এসে একটা নূতন সম্প্রদায় বানিয়ে দিয়ে যায়, সেই গদিতে নিজের ছেলেকে বসিয়ে দেয়, সে আবার নিজের ছেলেকে বসিয়ে দিচ্ছে, এটা কি ধরণের স্পিরিচুয়ালিটি? এটা হিন্দু ধর্ম, এখানে আধ্যাত্মিক পরম্পরা চলবে, বংশ পরম্পরা চলবে না; কিন্তু বেশির ভাগ জায়গায় বংশ পরম্পরা চলছে।

ঠাকুর বলছেন, **"আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ।**

"কেউ ডুব দিতে চায় না, সাধন নেই, ভজন নেই, বিবেক-বৈরাগ্য নেই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার"। এই কথাগুলো ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের নিয়ে বলছেন।

"লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন।.....ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তাহলে লোকশিক্ষা দিতে পারে"। লোকশিক্ষা মানে, আমার একটা বক্তব্য আছে, আমি এটা আপনাকে বলছি। আমরা সন্ন্যাসীরা এখানে বিভিন্ন শাস্ত্রের যে ক্লাশগুলো নিচ্ছি, এগুলো একটা পারায়ণের মত। আমাদের বেশির ভাগ সেন্টারে দেখবেন, একটা নির্দিষ্ট সময় কথামৃতের পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়, এটা হল পারায়ণ। পারায়ণ সাধনার একটা অঙ্গ। লেকচারটা হল, আপনি দেখাচ্ছেন আপনি যেন সিদ্ধ হয়ে গেছেন, আমি তাই লেকচার দিচ্ছি। লেকচার আর পারায়ণে তফাৎ আছে। পাঠ ও ব্যাখ্যা যখন বলা হয়, তখন এটা একটা সাধনার অঙ্গ হয়ে গেল। ঠাকুর এখানে এই জন্যই নিন্দা করছেন, তুমি দেখাচ্ছ যেন তুমি সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেছে। আসলে হয় কি, দুটো ভাল কথা শুনলে, জানলে লোকেরা আপনার প্রশংসা করবে, সন্ন্যাসী হলে প্রণাম করবে। এরপর কি হয়, আস্তে আস্তে আপনার মাথাটা বিগড়োতে শুরু করবে, তখন নিজেকে ব্যালেন্সে ফিরিয়ে আনা মুশকিল হয়ে যায়।

মাস্টারমশাই এবার নিজের উপর নেমে পড়েছেন, নিজের নাম আর বলছেন না, মণি বলে শুরু করছেন। **"কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় পশ্চিমাংশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মণি কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বারবার বলিতেছে, 'বিবেক-বৈরাগ্য না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না'। মণি বিবাহ করিয়াছে, তাই ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছে কি হইবে। বয়স ২৮, কলেজে পড়িয়া ইংরেজী লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন।** (মাস্টারমশাই নিজের বর্ণনা দিচ্ছেন)। **ভাবিতেছেন, বিবেক-বৈরাগ্য মানে কি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ"**? মাস্টারমশাইর এবার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)–স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছ না, আমি আত্মহত্যা করব; তাহলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরস্বরে)–অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে। আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক।

"যে ঈশ্বরের পথ বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী"।

পরে আমরা দেখব, ঠাকুর এক জায়গায় তিরস্কার করে মাস্টারমশাইকে বলবেন, এখনও স্ত্রীসঙ্গ কর লজ্জা করে না! ওনার স্ত্রী পাগল ছিল, কিন্তু স্ত্রীকে ছেড়েও থাকতে পারতেন না।

গভীর চিন্তানিমগ্ন হইয়া মণি দেওয়ালে ঠেসান দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণও ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিলেন। নরেনের তখন কুড়ি বছর বয়স, এই ধরণের কথাগুলি শুনছেন। এদিকে ঠাকুরের কথা শুনে মাস্টারমশাই কেমন যেন চিন্তামগ্ন হয়ে গেছেন। ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন। **তিনি হঠাৎ মণির কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিতেছেন, -**

"কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলই বশে আসে – রাজা, দুষ্ট লোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে"।

যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলই বশে আসে – রাজা, দুষ্ট লোক, স্ত্রী। এটা খুব মূল্যবান একটি কথা। যোগশাস্ত্রে অণিমা, লঘিমা, গরিমা ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধির কথা বলা হয়। যাঁরা যোগ পথে আছেন বা ধর্ম পথে আছেন বা সাধনার মধ্যে আছেন, তাঁরা কি করে বুঝবেন যে তাঁরা এই পথে

এগোচ্ছেন? ঠাকুর এই ব্যাপারে কিছু গাইডলাইন দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম হল, আমার কোন সিদ্ধাই লাগবে না, এই ভাবটা তার আসে। কিন্তু তারপরে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, ধর্ম পথে যে বিঘ্নগুলো আছে সেগুলো সরে যেতে শুরু করে। আপনার যে দায়ীত্বগুলো আছে, সেগুলো অন্য কেউ নিয়ে নেবে। অনেকে বলে, আমার মায়ের জন্য আমি সন্ন্যাসী হতে পারিনি, তার মানেই হল, তার এখনও সময় হয়নি। কারণ যদি তোমার সময় হয়ে থাকত, তাহলে ঠাকুর তোমার মাকে আগেই তুলে নিতেন। কথাগুলো একটু কটূ মনে হতে পারে, কিন্তু একেবারে বাস্তব। যার সময় হয়ে গেছে ঠাকুর তাকে দায়ীত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। হয় কাউকে এনে দেবেন সে তার মাকে বা বাবাকে দেখাশোনা করবে, আর তা না হলে সরিয়ে দেবেন। সাধনাতে এগিয়ে যাওয়ার পথে কাউকে থাকতে দেবেন না। আমরা অনেক সময় দোহাই দিয়ে থাকি, এটার জন্য হল না, অমুকের জন্য হল না। সোজা কথা হল, তোমার সময় হয়নি ভাই। সময় হয়নি মানে, আন্তরকি ভাবে তুমি ডাকনি। আন্তরিক হয়ে যদি তুমি তাঁকে ডাক তিনি তোমার বিঘ্ন সরিয়ে দেবেন।

ঠাকুর সেইজন্য এখানে বলছেন, যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলই বশে আসে। যদি দেখেন সাধারণ ভাবে আপনাকে লোকেরা খুব কষ্ট দিচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে আপনি এখন এই পথে এগোননি। এই কথাগুলো শুনলে কেমন একটু অবাক মনে হয়, কিন্তু এটাই সত্য। সত্যিই যদি ঈশ্বরের মন থাকে তাহলে দুষ্ট যারা, তারাও আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না, কোথাও মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে। পিছন থেকে দু-চারটে গালাগাল হয়ত দেবে, সামনে এসে কোন গোলমাল করবে না। ঠাকুর এখানে রাজা, দুষ্ট লোক আর স্ত্রী, এই তিনজনকে একই শ্রেনীতে নিয়ে আসছেন। দুষ্ট লোক আমরা বুঝতে পারি, পাড়ার মস্তানদের, নেতাদের দেখলেই বুঝতে পারি এরা কি রকম দুষ্ট লোক, এদেরকে কন্ট্রোল করা খুব মুশকিল। রাজাকে তো কন্ট্রোল করা একেবারেই অসম্ভব। আর একই categoryতে স্ত্রীকেও রাখছেন।

এই যে ঠাকুর বলছেন, নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে। ঠিকই বলছেন, ভাল হয়। আবার আমি বেশ কয়েকজনকে জানি, যাঁরা সত্যিকারের ঈশ্বরের পথে আছেন। একজনকে তো জানি, তিনি বড় অফিসার ছিলেন, ঠাকুরের পথে খুব নিবিষ্ট ছিলেন। পরে শুনলাম, তাঁর স্ত্রী বাচ্চাগুলিকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে গালাগাল দিতে দিতে ছেড়ে দিয়ে চলেই গেল, ফেরত তো এলোই না, কোন দিন আর খোঁজ খবরও নিল না। আবার অন্যটাও দেখেছি, স্বামী ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত, ধর্মজীবনে খুবই অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু স্ত্রী ধর্ম জীবনের পুরো বিরোধী ছিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে তিনিও এই পথে নেমে এসেছিলেন।

আমার এক পার্সি বন্ধু, আমেরিকান এ্যক্সপ্রেস ব্যাঙ্কের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উনি আবার স্বামী ভূতেশানন্দজীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী এসবের পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন, যা নিয়ে ওনাদের মধ্যে খুব অশান্তি হত। আমি একবার বম্বে গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে ভদ্রলোক আমাকে খুব অনুরোধ করলেন, 'একবার যদি আপনি আমার বাড়ি আসেন'। আমাকে যেতে হল, ভদ্রমহিলা আমাকে এই মারে কি সেই মারে, আমাকে সব কিছুই করলেন শুধু মারতেই বাকি রেখেছিলেন। এই ঘটনাটা বললাম ১৯৯৭ কি ১৯৯৮। এখন দেখছি ওই ভদ্রমহিলা নিয়মিত রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে আসা যাওয়া করেন, দুজনে মিলেই আসেন। ভদ্রমহিলা ঠাকুরের ঠিক ভক্ত নন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম বা রামকৃষ্ণ মিশনের বিরোধিতা আর নেই। এই ধরণের অনেক ঘটনা আমি দেখেছি। ভদ্রলোক সারাদিন জপ করেন, পড়াশোনা করা লোক, প্রচুর বই পড়েন, বাড়িতে ঠাকুরের বইয়ের টাল, তাতে সব রকমের বইই আছে।

"মণির চিন্তাগ্নিতে জল পড়িল। তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন, আত্মহত্যা করে করুক, আমি কি করব"? আত্মহত্যাটা অবশ্য আর করতে হইনি।

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) – সংসারে বড় ভয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি ও নরেন্দ্রাদির প্রতি) – তাই চৈতন্যদেব বলেছিলেন, "শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গতি নাই"। এখানে সংসারী বলতে যাঁরা সংসারে আছেন, তা না। সংসারী মানে যাদের মনে সাংসারিকতা আছে, যাদের নানা রকম attachment রয়েছে।

(মণির প্রতি একান্তে একদিন বলিয়াছিলেন) – "ঈশ্বরেতে শুদ্ধাভক্তি যদি না হয়, তাহলে কোন গতি নাই। কেউ যদি ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই। নির্জনে মাঝে মাঝে সাধন করে কেউ যদি শুদ্ধাভক্তিলাভ করতে পারে, সংসারে থাকলে তার কোন ভয় নাই। চৈতন্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নামমাত্র থাকত। অনাসক্ত হয়ে থাকত"। এটাই আসল কথা। বিয়ে থা হয়েছে তো তাতে কি আছে, সন্ন্যাসী হতে পারল না, না হতে পারল তো কি হল, দোষের কিছু তো নেই। বাড়িতে কত সুবিধা, একটু ভোগের ইচ্ছে হল একটু আমোদ-আহ্লাদ করলে।

অদ্বৈত আশ্রমের একটা ঘটনা শুনেছিলাম, ১৯৮৭তে আমি অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম, তারও আগেকার ঘটনা। একবার এক মহারাজ ট্যাক্সি করে আশ্রমে গেছেন, সঙ্গে মালপত্র থাকাতে ট্যাক্সি নিতে হয়েছিল। এন্টালির মোরে একটা লোক, নেশা করেছিল কিনা জানা নেই, লোকটি পান খাচ্ছিল। জানালা দিয়ে দেখেছে ট্যাক্সিতে একজন সাধু বসে আছে। দেখেই বলছে, 'সাধু! আবার ট্যাক্সি চাপা চাই'; বলেই মুখের পুরো পানের পিকটা মহারাজের মুখে ফেলেছে। উনি আর কি করবেন, কিছু করার নেই, ওই ভাবেই আশ্রমে এলেন। লোকেগুলো এই রকমই; বলবে, সাধু হয়ে আবার এটাও করা চাই? পরে ঠাকুর সেইজন্য বলবেন, সব সুখ বুঝি তোমরাই ভোগ করবে? এখানে সুখেরও ব্যাপার না, আমাদের অনেক সময় কাজের জন্য এটা সেটা অনেক কিছু করতে হয়। সেইজন্য বলছেন, সংসারে থাকলে কি হয়, অনেক কিছু করে নেওয়া যায়। সাধুরা অনেক কিছু করবে, কোন প্রশ্নই নেই, একটু ডানদিক বামদিক করবে out of question। তবে নাম মাত্র, সংসারে ডুব দিতে নেই। সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন আছে, কি মন নেই, এগুলো কাউকে জানাবারও দরকার নেই। যাদের জানার থাকে তারা ঠিক বুঝে নেবে।

তারপর বলছেন, **ঠাকুরদের ভোগারতি হইয়া গেল। অমনি নহবত বাজিতে লাগিল। এইবার তাঁহারা বিশ্রাম করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ আজও ঠাকুরে কাছে প্রসাদ পাইবে।** এই বলে এই পরিচ্ছেদ এখানে শেষ হয়ে যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়াদিবসে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

আজকের তারিখটা হল ২২শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, রবিবার। ১৮৮২ সালে দূর্গাপূজার বিজয়ার দিন দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভক্তরা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর কথা বলছেন। কথামৃতে মাস্টারমশাই যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে সেইভাবে আর যাচ্ছি না। দক্ষিণেশ্বরে তখন ঠাকুরের সঙ্গে রামলাল ও হাজরা বাস করেন। রাম, মনোমোহন, সুরেশ, মাস্টার, বলরাম এনারা প্রায় প্রতি সপ্তাহে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসেন। মাস্টার এখানে নিজেকে মণি নামে সামনে নিয়ে আসছেন। ঠাকুর মণিকে জিজ্ঞেস করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ– তোমার পূজার ছুটি হয়েছে?

মণি–আজ্ঞা হাঁ। আমি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিনে কেশব সেনের বাড়িতে প্রত্যহ গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ – বল কি গো।

ঠাকুর খুশি হয়েছেন। মাস্টারমশাইএর ঠাকুরের কাছে আসা-যাওয়াটা খুব বেশি দিন হয়নি। নিজের মত তিনি নোটস নিয়ে যাচ্ছেন। তখনও ভাবেননি যে এগুলো বই করে ছাপাবেন; নিজের মনে রাখার জন্য সব লিখে রাখছেন। এখনও ঠাকুরের ভাব তিনি ধরতে পারছেন না; একটু পরেই আমরা দেখব। ঠাকুর শুনে খুশি হয়েছেন, মাস্টারমশাই ইংরেজী পড়া লোক, শিক্ষকতা করেন, এই রকম লোক প্রত্যহ কেশব সেনের বাড়ি যাচ্ছেন। তখন কেশব সেনের সঙ্গে ঠাকুরের একটা বিশেষ পরিচয় হয়ে গেছে; ঠাকুরও কেশব সেনের রোগমুক্তির জন্য ডাব-চিনি মেনেছিলেন, কারণ কেশব না থাকলে কলকাতায় কার সঙ্গে কথা বলব।

মণি–দূর্গাপূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ–কি বল দেখি।

মণি–কেশব সেনের বাড়িতে রোজ সকালে উপাসনা হয়,– দশটা-এগারটা পর্যন্ত। সেই উপাসনার সময় তিনি দূর্গাপূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বললেন, যদি মাকে পাওয়া যায়–যদি মা-দুর্গাকে কেউ হৃদয়মন্দিরে আনতে পারে–তাহলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি–এ-সব আপনি হয়ে যায়–মা যদি আসেন।

ঠাকুর ও মাস্টারমশাইএর এই অতি সাধারণ ছোট্ট একটা কথোপকথন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দুর্গাপূজার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা। আজকের দিনে পূজো মণ্ডপে উদ্বোধনের সময় যদি কেউ এই রকম ব্যাখ্যা করেন, লোকেরা থ হয়ে শুনবে। চারিদিকে যত লেকচারাদি হয় বেশির ভাগ জায়গায় দেখবেন, একটা সাধারণ জিনিসকে নিয়ে এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়। আপনরা যদি ইউটিউবের লেকচারগুলি শুনতে যান, প্রবন্ধগুলি যদি দেখেন, সব জায়গায় এই ধরণের ব্যাখ্যাই পাবেন। শুধু এটাকে নিয়ে না, যে কোন জিনিসকে নিয়ে শুধু ব্যাখ্যা, আর ব্যাখ্যা। ঠাকুর মন দিয়ে মাস্টারমশাইর কথাগুলো শুনলেন।

শ্রীযুক্ত ঠাকুর সকল বিবরণ শুনিলেন ও মাঝে মাঝে কেশবের উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিতেছেন, তুমি এখানে ওখানে যেও না – এইখানেই আসবে।

ঠাকুরের এটা একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য। এই কথা বলার পর বলছেন – **যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে**। 'তুমি এখানে ওখানে যেও না – এইখানেই আসবে' আর 'যারা অন্তরঙ্গ তার কেবল এখানেই আসবে', এই দুটো বাক্যকে একসাথে নিলে এর তাৎপর্য বোঝা যাবে।

ধর্মের দুটি দিক – একটা হল মানুষ যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিচ্ছে, তাদের কাছে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই – আমি আছি আর তিনি আছেন। দ্বিতীয় দিক হল – যেখানে ঈশ্বরকে আধার করে পুরো জগৎ জুড়ে সব কিছু চলছে। যখন সব কিছু জগৎ জুড়ে চলে, তখনই ধর্মের জন্ম হয়; এটাকেই ঠিক ঠিক ধর্ম বলে। আমরা যখন ধর্ম বলি, ধর্ম বলতে আমরা আধ্যাত্মিক ভাবটা ভুলে যাই, বাকি জিনিসগুলিকে রাখি। বাকি জিনিসগুলি কি?

যে কোন ধর্মের যে চারটি অঙ্গ – **দর্শন**, যাঁদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ তাঁরা ধর্মের দর্শন অংশটাকে নেন; যেমন তত্ত্ব চিন্তন করছেন, এনারাও কিন্তু একশ ভাগ আধ্যাত্মিক নন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতাকে যখন বুদ্ধি দিয়ে ধরার চেষ্টা করা হয়, এটাকে তখন দর্শন বলা হয়। এখানে আধ্যাত্মিক দর্শনের কথা বলা হচ্ছে, পাশ্চাত্য দর্শন না। সেই আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে যখন কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে বোঝানর চেষ্টা করা হয়, তখন সেটাকে আমরা বলছি **ইতিহাস পুরাণ**। মিথলজি শব্দটা বিদেশ থেকে এসেছে, আমরা

যে অর্থে মিথলজি বলতে চাইছি, সেই অর্থে বিদেশীরা মিথলজি শব্দের ব্যবহার করে না। আমাদের কাছে ঠিক ঠিক শব্দটা হল পুরাণ। পুরাণ শব্দের সংজ্ঞাই হয়, পুরনো কাহিনী কিন্তু আজকেও নূতন, যেখানে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই যেমন ভাগবতে আমরা কৃষ্ণের শুধু শৈশব কালেরই কত কাহিনী পাই, পূতনা বধ, ধেনুকাসুর বধ, কালিয়া দমন পর পর আসতেই থাকে। এগুলোকে যদি কেউ ঐতিহাসিক তথ্য রূপে প্রমাণিত করতে যায় তখন সে নিজেরও সর্বনাশ করবে, সমাজেরও সর্বনাশ ডেকে আনবে। চীরহরণ, রাসলীলা এই বর্ণনাগুলি একটা আধ্যাত্মিক সত্য। পরা ভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি যে শ্রেষ্ঠ ভক্তি, এই শ্রেষ্ঠ ভক্তি মানুষকে বোঝান যায় না। প্রেম, ভক্তি এই জিনিসগুলিকে বোঝান যায় না। এই পরা ভক্তিকে বোঝানর জন্য ব্যাসদেব নিয়ে এলেন রাসলীলা।

ধর্মের তৃতীয় অঙ্গ হল **পূজা-অর্চনা**। মানুষের মনে যে ভক্তিভাব রয়েছে, এই ভক্তিতেও অনেক বিধি থাকে। আমাদের এক মহারাজ আছেন, ওনার পূজা-অর্চনার প্রতি খুব আগ্রহ এবং খুব গভীর নিষ্ঠা। দেখে খুব মজা লাগত। মহারাজের বাল্যকালের পরিচিত এক ভদ্রলোকের সাথে আমাদের দেখা হলে তিনি বলছিলেন, ছোটবেলা থেকেই তিনি এই রকমই ছিলেন। বাচ্চা বয়স থেকে কোথায় শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়, কোথায় নারায়ণ শিলা পাওয়া যায়, এই করে যেতেন। ওটাই ওনার ভাব। এই রকম যাঁদের ভাব, তাঁরা পূজা-অর্চনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেতে চান। চতুর্থ ও শেষ অঙ্গ হল **আচার-আচরণ**। শুদ্ধ আচরণ পালন করে আমি ঈশ্বরকে পেতে চাই।

এই চারটে যেমন ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ, ঠিক তেমনি এগুলোকে সাধনা রূপেও নেওয়া যায়। আগেকার দিনে ঠাকুরমা, দিদিমারা পূজা অর্চনা করছেন। বাড়িতে একটা তুলসি মঞ্চ আছে, সন্ধ্যাবেলা সেখানে গিয়ে ধূপদীপ দেখাচ্ছেন। ছোট্ট নাতি সেও ঠাকুরমা বা দিদিমার পিছন পিছন যাচ্ছে। সেখানে তাকে একটা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, তুমিও এই রকম কর। শুধু এটাই না, নানা রকমের জিনিসের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে তাকে বিধি-নিষেধ শেখান হয় – এটা করবে, এটা করবে না। এটা করলে কি হয়, যদি তার ভিতর ধর্মভাব থাকে, বড় হয়ে এটাকেই ধরে সে ধর্ম পথে এগোবে।

এই চারটের বাইরে আরেকটা পঞ্চম অঙ্গ রয়েছে – যেটা হল সরাসরি – ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না। ইদানিং কালে অনেককে বলতে দেখা যায় – I am spiritual not religious। বাস্তবে এরা কিছুই বোঝে না, আধ্যাত্মিক মানে, আমি ঈশ্বরকেই চাই, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন কিছু আমার লাগবে না। যদি কেউ মনে করে আমার সেই ক্ষমতা নেই, একশ ভাগ সন্ন্যাসের ভাব আমার নেই। তখন তাকে বলা হবে, তাহলে তুমি এই চারটের মধ্যে যে কোন একটি পথ বেছে নাও।

আপনি হয়ত দর্শন ও পুরাণ নিলেন, তখন আপনাকে জানতে হবে যে, আমাদের দর্শন মূলতঃ আসে উপনিষদ ও গীতা থেকে, আর পুরাণ আসে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলি থেকে। পুরাণে যখন জিনিসগুলিকে সামনে রাখা হয় তখন নানা রকমের কথা কাহিনী তৈরী করে রাখা হয়। আর পুরাণকাররা যত খুশি কাহিনী তৈরী করে যেতে পারেন। তুলসীদাস রচনা করলেন রামচরিতমানস, তার মধ্যে তিনি এত রকমের বর্ণনা নিয়ে এলেন যে, লোকেরা যখন রামচরিতমানস পড়ছেন, তাঁরা ওই কাহিনীগুলিকেই মনে রাখে, আর তার মধ্যে যে হিউমারগুলি রয়েছে, শক্তির যে ব্যাপারগুলি রয়েছে সেগুলোকে মনে রাখে, আসল যে জিনিসটাকে ধরে রাখার কথা, সেই তত্ত্বটাকেই ছেড়ে দেয়। ফলে উদ্দেশ্য যেটা ছিল, সেই উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে যায়।

একটা হাসির ঘটনা পড়েছিলাম, খুব মজার ঘটনা। একটা বাচ্চা ছেলে ক্লাশ থ্রী-ফোরে পড়ে। তাকে একটা ওষুধ খাওয়াতে হয়। বাচ্চাদের যা স্বভাব, কিছুতেই ওষুধ খাবে না। বাচ্চাটিকে ওষুধ খাওয়াবার জন্য রসগোল্লা নিয়ে আসা হয়েছে, আর রসগোল্লার ভিতরে সেই ওষুধটা কায়দা করে ঢুকিয়ে

দেওয়া হয়েছে। বাচ্চা রসগোল্লাটা খাবে, ওষুধটাও ভিতরে চলে যাবে। মা কাজেকর্মে গিয়ে বিকেলে ফিরে এসে বলছে, 'রসগোল্লা খেয়েছিলে বাবা'? 'হ্যাঁ মা খেয়েছি, ওর মধ্যে একটা বীচি ছিল সেটা ফেলে দিয়েছি'। বেশির ভাগ শাস্ত্র যখন আমরা পড়ি, আমরা বলি রসগোল্লা খেয়ে নিয়ে ওর বীচিগুলো ফেলে দিই। কাহিনীগুলো নিয়েছি, তত্ত্বগুলি ফেলে দিয়েছি।

আমাদের হিন্দু ধর্মে একটা ছিল কথা-বাচক, কথা-বাচকের প্রথা এখনও আছে। দেখবেন এখানে সেখানে বড় বড় হোর্ডিং থাকে যাতে লেখা থাকে ভগবৎ সপ্তাহ, সাত দিন ধরে সেখানে ভাগবত কথা হবে । সেখানে একজন পণ্ডিত ভাগবতটা নিয়ে নিজের মত ব্যাখ্যা করে বেরিয়ে যান। অন্য দিকে খ্রীশ্চান ট্রাডিশানে আমরা দেখতে পাই, সেখানে রবিবার দিন বা বিশেষ কোন দিন একজন কোন পাদ্রী বাইবেল নিয়ে সেখান থেকে পাঠ করে ব্যাখ্যা করবেন। সেখানেও তিনি নিজের মত ব্যাখ্যা করে যান। এখন এই ব্যাখ্যাগুলো আদপে ঠিক না ভুল, কারুর জানা নেই। এই দুটোর কম্বিনেশান হলেন ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্র সেন। একদিকে যেমন তাঁর কথা বাচকের একটা পরম্পরা রয়েছে, অন্য দিকে স্টেজ থেকে খ্রীশ্চান ফাদাররা যে ব্যাখ্যা দেন, এই দুটোকে মিলিয়ে। বর্তমান কালে আমাদের যে বিভিন্ন ধর্মসভাগুলি হয়, সেগুলোও কেশব সেনের পরম্পরাতেই চলে – দুটোকে মিলে, একদিকে শাস্ত্র রাখছেন, অন্য দিকে একটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা, যেটা খ্রীশ্চান ট্রাডিশান থেকে আসে। মানুষ যখন ব্যাখ্যা করবে, তখন নিজের মন থেকেই করবে।

একবার একটা সভাতে একজনের সাথে দেখা হল, দেখলাম উনি নিজের মত ভুলভাল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। আমি মজা করে তাঁকে বললাম, 'কি ভুলভাল ব্যাখ্যা করলেন'! উনি বললেন, 'আরে আমি যেমন জানব তেমনই তো ব্যাখ্যা করব। আমাকে বলতে বলেছে আমি বলছি, আমি যেটা জানি সেটাই তো বলব, এতে আমার দোষ কোথায়'। 'একটু উল্টেপাল্টে দেখে নিলে তো পারেন'? 'সারা জীবনই তো দেখলাম আর কত দেখব'। লোকেরাও দল বেঁধে শুনতে আসছে, বাবাজীর নাম আছে তাই আসছে। এই সমস্যাটা সারা বিশ্বে আছে। খ্রীশ্চানিটির জোর আগের থেকে এখন অনেক কমে গেছে। কিন্তু কিছু বছর আগে, এখনও কিছু কিছু জায়গায় খ্রীশ্চান ফাদাররা লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। যীশু খ্রীষ্টের মহান চরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে কি কি যে বলে যাবে ভগবান জানেন।

কেশব সেন পড়াশোনা করা লোক, যা তা লোক নন, তিনি দুর্গার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, ঈশ্বর যদি আসেন তাঁর ষড়ৈশ্বর্য নিজে থেকেই আসবে। এখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশকে নিয়ে যেটা বলছেন, এটাই ষড়ৈশ্বর্য। হাজরা ঠিক এই কথাই ঠাকুরকে বলতেন – তিনি হলেন ঐশ্বর্যবান, তিনি চাইলে ঐশ্বর্যও দিতে পারেন। হাজরার কথা শুনে ঠাকুর প্রচণ্ড রেগে যেতেন। তিনি বলতেন, গত জন্মে হাজরা কাঙালী ছিল। ঈশ্বরের দিক থেকে দেখলে ঈশ্বর আর ঐশ্বর্য। যখনই মানুষ ধর্মের কথা বলবে, যখন পুরাণে যাবে, যখন পূজা-অর্চনাতে যাবে, আচার-আচরণে যাবে, তখন এরা ঈশ্বর আর ঐশ্বর্য এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলে। ভজনা করে ঈশ্বরের, কিন্তু আসলে চাইছে ঐশ্বর্যকে।

একজন মহাত্মাকে জানতাম, ওনার ভিতরে একটা ভাব ছিল যে, উনি খুব সৎ। উনি খুব করুণ স্বরে আমাকে একদিন বলছেন, 'দাদা, আমরা সৎ, আমরা কি কিছুই পাব না, যারা অসৎ লোক তারাই কি সব পাবে'? আমি তাঁকে বললাম, 'দেখুন, যদি আপনি কিছু পেতে চান তাহলে অসৎ হয়ে যান। সৎএর ফল সব সময় সৎই হবে। আপনি সৎ কেন? ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছেন বলে। যদি আপনি মনে করেন আমি সৎ থাকব, আমি পবিত্র থাকব, মিথ্যা কথা বলব না, চুরি করব না, এগুলো তো টাকার ধর্ম না, এগুলো ঐশ্বরীয় ধর্ম, আপনাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। এখন কে কোথায় কদাচিৎ একজন সৎ পথে থেকেও টাকা পেয়ে গেছে, সেটাকে দৃষ্টান্ত রূপে নিলে কি করে হবে, তা হয় না। আপনি সন্ন্যাসী, আপনি সাধুবাবা, আপনি একটা আশ্রমে আছেন, আপনি কেন বসে বসে এগুলো ভাবছেন'।

ঈশ্বর আর ঐশ্বর্য, এই দুটো আমাদের মনে সংশয় তৈরী করবেই করবে; আমরা ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ ভগবান আর মন এই দুটোকে মেলাবই মেলাবো। অথচ গীতা, উপনিষদ, কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী এগুলো ভাল করে পড়ে দেখুন, সেখানে দেখবেন ঈশ্বর আর ঐশ্বর্য এই দুটোকে এনারা একেবারে পরিষ্কার আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। আর বারবার সেখানে তাঁরা আমাদের দেখাচ্ছেন, ঐশ্বর্য তোমাদের জন্য নয়, তোমরা ঈশ্বরের দিকে যাও। বাকিরা যাঁরা ব্যাখ্যা করেন, সবাই না, বেশির ভাগই ঈশ্বরের সঙ্গে ঐশ্বর্যকে সংশয় তৈরী করে ভুলে ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐশ্বর্যের ব্যাখ্যাতে নামবেই নামবে, কিছুতেই ওখান থেকে বেরোতে পারে না। যেমন বলছেন, 'দেখো আজ ঠাকুরের নাম কত ছড়াচ্ছে', তার মানে আপনি ঐশ্বর্যে নেমে গেলেন। ঠাকুরের নাম ছড়াচ্ছে কি ছড়াচ্ছে না, তাতে আপনার কি। 'আজ ঠাকুরের নামে কত লোক আসছে', আপনি ঐশ্বর্যেতে নেমে গেলেন। কিছুতেই এটা থেকে বেরোন যায় না, এর থেকে বেরিয়ে আসা অত সহজ না। কারণ সচ্চিদানন্দের কথা বলতে গিয়ে মানুষ মনের জগতে পড়বেই, আর ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য এই দুটোকে মিশিয়ে দেবেই দেবে।

কেশব সেন অবতার নন। তাঁর ভিতর আধ্যাত্মিক চেতনা আছে, ঠাকুর নিজেই কত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাই বলে ঈশ্বরকে নিয়ে যে কথাগুলো বলবেন সেগুলো যে সব ঠিক ঠিক থাকবে তা না। এখানে দূর্গার ব্যাখ্যাতে তিনি যা বলছেন, ভুল কিছু বলছেন না, একেবারে ঠিক কথাই বলছেন। সংসারী লোকেদের যে ঈশ্বরীয় সাধনা, ঠিক এভাবেই হয়। তারা যখন দুর্গাপূজা করে, তখন ভাবে যে এতে অবশ্যই আমার কিছু ভাল হবে। শ্রাবণ মাসে বোলে ব্যোম বোলে ব্যোম করতে করতে লাইন দিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে বাবার থানে যাচ্ছে, তারা আশা করে থাকে এভাবে পায়ে হেঁটে গিয়ে শিবের মাথায় জল ঢাললে আমি কিছু একটা পাব। কেউ হয়ত একটা মানত করেছে। এখন আবার শুনলাম লোকেরা যাতে পায়ে হেঁটে না যেতে পারে, সেইজন্য রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালারা রাস্থায় ছোট ছোট পাথর ছড়িয়ে দেয়, যাতে পায়ে কষ্ট পেয়ে বাধ্য হয় রিক্সা বা ঠেলা নিতে বাধ্য হবে। ভোলে বাবা কিনা, তাঁকে সবাইকেই দেখতে হয়, ঠেলাওয়ালাকেও দেখতে হয় আর যত চোর-ডাকাতরা আছে তাদেরও দেখতে হয়। ওরা ওই সময় ওৎ পেতে থাকে যদি চালাকি করে ওদের গাটরি থেকে কিছু খসান যায়। ভক্তরাও পায়ে হেঁটে যাচ্ছে এই ভেবে যে, যদি আমি কষ্ট করে যাই, তাহলে আমার উপর তাঁর কৃপা হবে।

ঈশ্বর আর ঐশ্বর্য, কিছুতেই এই দুটো থেকে বেরোন যায় না। কেশব সেন সেদিক থেকে ঠিকই বলছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার, তিনি এটাকে আটকে দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলে আটকাচ্ছেন? তিনি কি বলছেন যে, কেশব সেন ভুল বলছেন বা দুর্গাপূজার এই ধরণের ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভুল? একেবারেই তা বলছেন না। অবতার আর আচার্য এই দুজনের মধ্যে বিরাট তফাৎ থাকে। যেমন ঈশ্বর আর ঐশ্বর্যের তফাৎ মাথায় রাখতে হয়, ঠিক তেমনি অবতার আর আচার্যে বিরাট তফাৎ থাকে। আচার্য শিষ্য ধরেন। যিনি আচার্য, যিনি ভাল বক্তা, যিনি নিজেকে ধর্মের শিক্ষক মনে করেন, তিনি নিজের প্রচার করবেন। তিনি দেখবেন তাঁর কত শিষ্য আসছে। যদি দেখেন কোন শিষ্য হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, চেষ্টা করবেন কিভাবে ওকে ধরে আবার ফিরিয়ে আনা যায়।

অবতার এসব কিছুই করেন না। পারলে কয়েকজন যে তার সাথে আছে তাদের কাউকে ছিটকে সরিয়ে দেবেন। কিন্তু অবতারের যিনি অন্তরঙ্গ, তাঁকে উনি কিছুতেই বেরোতে দেবেন না। আচার্য সমস্ত শিষ্যকে ধরে রাখার জন্য যতটা খাটেন, অবতার তাঁর একজন অন্তরঙ্গের জন্য তার থেকে অনেক বেশি খাটেন, ওকে কিছুতেই বেরোতে দেবেন না। নরেন বিভিন্ন কারণে দক্ষিণেশ্বরে আসছেন না, বা আসতে কয়েকদিন দেরী করছে, তখন ঠাকুর যেটা করার কথা না সেটাও তিনি করছেন, নরেনের মামার বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন, ব্রাহ্ম সমাজে পৌঁছে যাচ্ছেন, ঠাকুরকে দেখে উপাসনা গৃহের আলো নিবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই জিনিস যে তিনি শুধু নরেনকে নিয়ে করছেন, তা না, তাঁর প্রত্যেকটি অন্তরঙ্গ শিষ্যের জন্য করছেন। শ্রীশ্রীমায়ের জন্য করছেন, রাখালের জন্য করছেন। অমুকের জন্য কাঁদছেন, তাঁর জন্য

কাঁদছেন, কখন কাউকে একটা নেগেটিভ কথা পাঠিয়ে দিচ্ছেন, যেটা শুনে রেগেমেগে যাতে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে চলে আসে, এলে আবার তাকে ধরে রাখছেন। এগুলো মাত্র কয়েকজনের জন্য।

কারণ অবতার যখন আসেন, তিনি সব সময় ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আসেন। অবতার কখনই একা ধর্ম সংস্থাপন করতে পারবেন না। তাঁর কয়েকজন শিষ্য সঙ্গী দরকার, কারণ অবতারের সময় খুব কম। অবতারের দশজন লোক দরকার দুটো কারণে। এতদিন যেটা তিনি একা করছিলেন, এবার সেটা দশটা মুখ দিয়ে যাবে। গীতা ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর কথা বলছেন, ভাল শিষ্য পেলে শিক্ষার প্রচার প্রসার ভাল হয়। আর তৃতীয় আরেকটা হয়, শিক্ষাটাকে একটু ডাইল্যুট করা যায়। কারণ অবতারের কাছ থেকে যেটা আসে ওটা পুরো concentrated রূপে আসে, সাধারণ মানুষ ওটা সরাসরি নিতে পারবে না। ওটাকে জল মিশিয়ে মিশিয়ে একটু একটু করে তরল করতে হয়। সেইজন আমরা উপনিষদ পড়তে গেলে উপনিষদের কথাগুলো ঠিক ধরতে পারি না। আর কথামৃত পড়ে মনে হবে যে পুরোটাই বুঝে ফেলেছি, কিন্তু গভীরে যখন যাওয়া হবে তখন মনে হবে আরে এতো পুরো অন্য জিনিস দেখছি। এই অন্তরঙ্গদের ঠাকুর ধরে রাখছেন। এখানে ঠাকুর বলছেন না যে, এই ধরণের ব্যাখ্যা করা ঠিক না আর এটাও বলছেন না যে, কেশব সেন এটা ভুল বলছেন। যার জন্য মাস্টারমশাইকে প্রথম যখন বলছেন, তুমি এখানে ওখানে যেও না, এখানেই আসবে, তখন মনে হবে যে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে নিজের কাছে ধরে রাখতে চাইছেন, হাত থেকে ফসকে যেন না বেরিয়ে যায়, একেবারেই কিন্তু তা না। তারপরের লাইনে বলছেন –

যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে। 'অন্তরঙ্গ' আর 'কেবল এখানেই আসবে', এই দুটো কথা খুব দামী কথা। আজকে আমি আপনি আছি, আজকে ঠাকুর নেই, মাস্টারমশাই নেই, নরেন-রাখাল নেই; কিন্তু আমি আপনি নিজেদের আজকে কিভাবে দেখছি? বা ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, বা যাকেই বলুন, এখানেই এসো, তিনি ব্যক্তি ঠাকুরের কাছে আসার জন্য ডাকছেন না, ডাকছেন রামকৃষ্ণ ভাবের প্রতি। হাজরার কথাতে একদিন ঠাকুর খুব রেগে গেছেন, মন্দিরে গিয়ে মা কালীকে বলছেন, 'মা ওকে এখান থেকে সরিয়ে দে, ও এখানকার মত উল্টে দিতে চাইছে'। এই যে এখানকার মত উল্টে দেওয়া, এটাই বলা হচ্ছে – শ্রীরামকৃষ্ণ একটি ভাব। যারা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ তারা এই ভাবে পুরোপুরি মৌলিক ভাবে আসবে, সেখানে কোন কিছু মেলানো মেশানো থাকবে না। তখন মা দুর্গাকে বলতে গিয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ কোনটাই আসবে না, আসবে শুধু মা, আসবে শুধু শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন বেদ, উপনিষদ, গীতা এর মূর্তরূপ। গীতার পর ভারতবর্ষে আর শাস্ত্র রচনা হয়নি। আচার্য শঙ্কর ভাষ্য লিখেছেন, রামানুজাদিরা ভাষ্য লিখেছেন, তুলসীদাসের রামচরিতমানস ধর্মগ্রন্থ, এটা শাস্ত্র না; চৈতন্যচরিতামৃত প্রভুর সরাসরি কথা না, ওটা পরে রচনা করা হয়েছে, তাই ওটাও ধর্মগ্রন্থ। সেই দিক থেকে কথামৃত শাস্ত্র। তার মানে কথামৃতই একমাত্র শাস্ত্র যা কিন ভারতবর্ষে গীতার পরে এসেছে, মাঝখানে কোন শাস্ত্র নেই। কথামৃতের কোন কথা যদি কোন আচার্যের সঙ্গে না মেলে, বুঝতে হবে আচার্য ভুল। কথামৃতের কোন কথা যদি উপনিষদের সাথে না মেলে, তখন একটা ভাষ্য লাগবে। উপনিষদের অনেক কথা আছে, যেগুলো উপনিষদেরই অন্য কথার সাথে মেলে না, সেগুলোকে মিলিয়ে এক জায়গায় আনার জন্য ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র লিখলেন।

আচার্য ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করলেন ব্যাখ্যা করার জন্য। উপনিষদের এমন কিছু কিছু কথা আছে, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যেন এর মধ্যে অনেক অমিল আছে, আসলে কোথাও অমিল নেই। আচার্য ওগুলোকে একটা জায়গায় এনে মিলিয়ে দিচ্ছেন। কথামৃতের কোন কথা যদি গীতার সাথে না মেলে, উপনিষদের সঙ্গে যদি না মেলে, তাহলে যৌক্তিক ব্যাখ্যা করে, ভাষ্য দিয়ে ওটাকে মেলাতে হবে। অন্য কোন আচার্যের সঙ্গে যদি অমিল হয়, বুঝতে হবে ওখানে আচার্য ভুল।

কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য নন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান। তাই কথামৃতের কথাগুলো সরাসরি ভগবানের কথা। যেমন ধরুন আগামীকাল ঠাকুরের জীবনী নিয়ে বা ঠাকুরের এই কথাগুলোকে আধার করে কেউ একটা বই লেখেন, ওটাকে তখন প্রশ্ন করা যাবে, কারণ যিনি লিখছেন সেখানে তাঁর মন ঢুকে আছে। কিন্তু কথামৃত সরাসরি ভগবানের কথা, সেইজন্য কথামৃতের কোন কথাকে কোন দিন কোন ভাবে প্রশ্ন করা যাবে না। একবার স্বামী ভূতেশানন্দজী ও কয়েকজন মহারাজদের মধ্যে কথা হচ্ছিল। ওখানে কথা বলতে গিয়ে একজন বলছেন, মহারাজ এটা তো কথামৃতের কথা। এই কথা বলতেই স্বামী ভূতেশানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বলছেন, 'ওরে বাবা! কথামৃতের কথা, আর কোন কথা না, ভগবানের কথা'। হিন্দু ধর্মে ভগবান দুটি কথা বলেছেন – একটা বেদ আর একটি কথামৃত। সরাসরি ভগবানের কথা আমাদের আর কোথাও নেই, উপনিষদ মানেই বেদ। গীতাকে ওই একই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, উপনিষদের সার হল গীতা, ব্যাসদেব যে কথাগুলি লিখেছেন সেগুলো ভগবানের মুখ দিয়ে এনেছেন।

এখানে ঠাকুর এটাই বলছেন – এটা একটা ভাব। কি ভাব? শুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব। যে কোন মানুষ যদি কথামৃতের কিছু কথা শুনে থাকে বা জেনে থাকে, এবার তার ইচ্ছে হল যে, আমি তো ঠাকুরকে সামনে দেখছি না, দেখবও না কিন্তু আমরাও ইচ্ছা আমি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ হব, আমি জানি আমি অন্তরঙ্গ নই। কারণ আমি যদি অন্তরঙ্গ হতাম তাহলে ঠাকুরের সময়েই জন্মাতাম। তখন ঠাকুর অনেককে যেমন পাশ কাটিয়ে গেছেন, তেমনি আমাকেও হয়ত পাশ কাটিয়ে যেতেন বা আমি যদি সেই রকম আধার হতাম তাহলে আমাকেও হয়ত তিনি গ্রহণ করতেন। কিন্তু এখন আমার ইচ্ছে আমি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ হব, ঠাকুর নেই ঠিক আছে, কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলো তো আছে, আর আমিও আছি। অন্তরঙ্গ হওয়ার এটাই পথ – যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে। এখানেই আসবে মানে, ঠাকুরের যে ভাব, তার বাইরে আর কিছু দেখবে না।

ঠাকুরের ভাব মানে জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য। শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা। কিসের জন্য ত্যাগ, ত্যাগ শুধু ফেলে দেওয়া তো নয়। একজন যে কয়েদি, সেও সব কিছু ছেড়ে জেলে যায়। এখানে ত্যাগ মানে তা না, জ্ঞান ভক্তির জন্য সব কিছু ত্যাগ। ঠাকুর যেমন বলছেন, মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বই কিছু জানি না। এই ঈশ্বরকে জ্ঞান রূপে জানা, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক; দ্বিতীয় আমি ঈশ্বরের ভজনা করি, আমার কাছে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। এরপর ঈশ্বরের যে ঐশ্বর্যই থাকুক, আমি তার ধারে কাছে নেই। তাঁর কোন রূপে আমি নেই। ঠাকুরের যে ঐশ্বর্য, তা যে কোন রূপেই থাকুক, এই যেমন অনেক সময় বলে, 'দেখ ঠাকুরের ভাব কেমন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে', এটাই ঐশ্বর্য, এটা ঠাকুরের ভাব কেন হবে! ঠাকুরের শুধু সম্পর্ক আপনার। শ্রীরাধা আর দশটি মেয়েকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসছেন না। রাধা শুধু নিজের জন্য কৃষ্ণকে চাইছেন। নরেন আর পাঁচজনকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসছেন না, নরেন নিজে ঠাকুরকে চাইছেন। শ্রীশ্রীমা আর দশজনকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসছেন না, ওই জায়গাতে তুমি নিজেকে দেখ।

ঠাকুরের ভাব মানেই, আমি আছি আর তিনি আছেন, ব্যস, আর কিছু নেই। তাঁর যে ঐশ্বর্য, তাতে আমার কোন রুচি নেই। তিনি নিজের কাজ নিজেই করবেন, সারা বিশ্বে তাঁর ভাব ছড়াতে হলে তিনিই ছড়াবেন। আমি ওতে নেই, আমি আছি শুধু তাঁকে নিয়ে। ঠাকুরই উপমা দিচ্ছেন, বউমা অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী কাজ কমিয়ে দেয়। তারপর বলছেন, বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর তখন শুধু কোলের শিশুটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে, অন্য কিছু আর তার নেই। ঠিক তেমনি, ঈশ্বর বই আমার আর কিছু নেই। যারা অন্তরঙ্গ, তারা কোন ঐশ্বর্যের দিকে যাবে না। তার ঐশ্বর্যের যে কথাগুলো হচ্ছে, যে বর্ণনাগুলি হচ্ছে, তার ধারে কাছেও যাবে না।

এখানে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে কেশব সেন বা বিদ্যাসাগরের কাছে ওই অর্থে যেতে বারণ করছেন না। দর্শনের কথাগুলো যখন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, ঈশ্বরীয় কথাকে যখন পরিবেশন করা হচ্ছে, ওই জায়গাতে সাবধান করা হচ্ছে। ঈশ্বরীয় কথাটা ঈশ্বরীয় রূপে যাবে, অন্য কোন রূপে না। তিনি যদি আদেশ করে দেন, যেমন স্বামীজীকে আদেশ করলেন, এমনকি রাজা মহারাজ নোটস নিতেন, ঠাকুর বারণ কর দিলেন, ওটা তোমার কাজ না, এই কাজ তোমার জন্য নয়। সব কাজ সবার জন্য না। আমি নোট নিলে ঠাকুরের কথা আরও ছড়াবে, না না, তিনি নিজেই আদেশ করে দেবেন, এটা তোমার কাজ।

বলছেন, "**নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল – এরা আমার অন্তরঙ্গ**"। মাস্টারমশাইকে এই কথা বলছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তুমিও আমার অন্তরঙ্গ। একই লাইনে বলছেন – "**এরা সামান্য নয়। তুমি এদের একদিন খাইও**"। তোমার পরিশ্রম করা উপার্জন, সেই উপার্জনকে একটা উত্তম সাধুকাজে ব্যয় হোক। এদের সেবা করা মানে নারায়ণকে সেবা করা। সাধু-সন্ন্যাসীদের যখন কিছু দেওয়া হয়, কিছু সেবা করা হয়, তখন ওটাই নারায়ণ সেবা হয়। নারায়ণকে তো আমরা সামনে পাচ্ছি না, আপনিই নারায়ণ, আপনাকে সেবা করলাম। ঠিক তেমনি যাঁরা শুদ্ধ আধার, তাঁদেরকেও ওই ভাব নিয়ে সেবা করা হয়। ছোট বাচ্চা, তাদের মনে কোন ছল-কপট নেই, অনেক সময় তাদেরকে এনে সেবা করা হয়। নরেনকে নিয়ে আবার বলছেন – **নরেন্দ্রকে তোমার কিরূপ বোধ হয়**?

মণি–আজ্ঞা, খুব ভাল। ঠাকুর নরেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ–দেখ, নরেন্দ্রের কত গুণ–গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায়, আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না–ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন। 'বিয়ে করবে না', এগুলো শুনলে অনেক সময় মনে হয় ঠাকুর বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। না, ঠাকুর বিয়ের বিরুদ্ধে নেই।

প্রথমে মাস্টারমশাইয়ের নামে বলছেন, তারপর নরেনের নামে বলছেন। আমাদের ছোটবেলায় বা বড় হয়েও অনেকেরই একটা কথা শুনতে হয়েছে, বাবা-মা, স্কুলের মাস্টারমশাই বা কোন বন্ধু আমাকে বলবে – জানো তোমার কাছে আমি এটা আশা করিনি। এটা বলে যে, 'তোমার কাছে আমি এই রকম আশা করিনি', এই কথাটা শোনার পর প্রথম আপনি জানতে পারবেন, কোন ভুল করলে, কোন দোষ করলে বোঝা যায় যে, এই জগতে আপনার কত দাম ছিল। সেইজন্য মাঝে মাঝে একটু ভুল করতে হয়, ভুল করলে যখন বলবে, 'তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি', তখন বোঝা যায়, আমার কাছে লোকের কত প্রত্যাশা ছিল। তার আগে পর্যন্ত আপনি জানতে পারবেন না। ভুল যদি কোন দিন না করেন জানতেই পারবেন না যে, আপনার কাছে সবাই কত আশা করছে। এটা মজা করে বলে ঠিকই, কিন্তু জিনিসটা ঠিক তাই, তবে অন্য ভাবে।

ঠাকুর জানেন এনারা বিশেষ, এই যে বিশেষ, এই বিশেষকে কোন মতেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য যা যা করা দরকার, সবটাই করতে হবে। যদি আমরা একটু বিচার করে দেখি – বিবাহ মানেই সেখানে দুর্বল জিনিসটা সেঁটে আছে। বিবাহ মানেই আমি একাকী জীবন চালাতে পারছি না, একজনের সাহায্য দরকার। তুমি আমাকে ধরবে, আমি তোমাকে ধরব, দুজনে এক সঙ্গে ধরাধরি করে যাব। অনেক সময় হয়, যেখানে এক অপরকে সাহায্য করে, ইংরাজীতে এটাকে সিমবায়োসিস রিলেশানশিপ বলে। সিমবায়োসিসে, আমি তোমার সাহায্য নিচ্ছি, তুমি আমার সাহায্য নিচ্ছ, দিয়ে দুজনেই আমরা বেরিয়ে গেলাম। দূরপাল্লার ট্রেনে যাচ্ছেন, ফাঁকা ট্রেন, আপনার একঘেঁয়ে লাগছে, সেখানে একজনকে পেয়ে গেলেন। দুজন দুজনের সাথে গল্প করছেন, সময়টা কেটে গেল। এটাকে বলে সিমবায়োটিক রিলেশানশিপ। বিবাহ মানেই আপনি একটা কম্প্রোমাইজ করছেন – আমি একা জীবন চালাতে পারব না, একা ধর্ম সাধন করতে পারব না; তার সাথে এই জগতের অনেক রকম সমস্যা আমার একটা মন দিয়ে মোকাবিলা করতে পারব না। একই লোক যখন অনেক সমস্যায় কাজ করে, বৈজ্ঞানিকরা যেমন; যত বড় বৈজ্ঞানিকই হন, মন তাঁর যতই উন্নত হোক, তাঁর মন একা

সমস্ত কাজ সামাল দিতে পারবে না। আইনস্টাইন সেক্সপিয়ারের মত সাহিত্য রচনা করতে পারবেন না, সেক্সপিয়ার রবীন্দ্রনাথের মত সঙ্গীত রচনা করতে পারবেন না, গান গাইতে পারবেন না, রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানের তত্ত্ব বার করতে পারবেন না। এতগুলো মন যেখানে এক জায়গায় হয়ে যায়, তখন শরীর এক মন বহু। এক শরীর আর বহু মন, এতো সাংঘাতিক ক্ষমতা।

এই ধরুন আমাদের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আমাদের একটা শরীর। যত সন্ন্যাসী আছেন, সবাই সঙ্ঘের সেবা করে যাচ্ছেন। সঙ্ঘ থেকে যে আদেশ আসছে সেটাই ওনারা ঠাকুরের নামে করে দিচ্ছেন। কিন্তু মনের ক্ষমতা সবারই আলাদা আলাদা। আমরা যখন এক মনে কাজ করার কথা বলি, আসলে আমরা তখন বলতে চাইছি, এক শরীর হয়ে কাজ কর, মন তো আলাদাই থাকবে। মন যেন একটা শরীরের বাইরে, যেমন যুদ্ধ চললে সৈন্যরা এক শরীর হয়ে যায়, কিন্তু মন আলাদা। কি অর্থে? শরীরের চোখ, কান সবারই বিভিন্ন দিকে ঘুরে যাচ্ছে, এক সঙ্গে ওরা অনেক দিক সামলে নিচ্ছে। ফলে কি হয়? ক্ষমতা বেড়ে যায়। বিবাহ করা মানে, আমি আমার ক্ষমতাটা একটু বাড়িয়ে নিলাম। কারণ স্বামী-স্ত্রী স্বাভাবিক ভাবে ওটা একটা শরীর হয়ে যায়। একটা শরীর, মন দুই গুণ বেড়ে গেল। কিছু ঝামেলা এ পোয়াবে, কিছু ঝামেলা সে পোয়াবে।

কিন্তু যাঁরা ধর্ম পথে আছেন, বা কোন বড় কাজ করতে চাইছেন, সেখানে এই দুটো মন দরকার পড়ে না। কারণ কি, জগতে ফোকটাই কিছু আসে না, there is no free lunch, যেমনি আপনি বলবেন, এই এক শরীর, আমি পাঁচটা মন বানিয়ে নিলাম, তার জন্য আপনাকে কিছু ছাড়তে হবে, আপনার নিজের ক্ষমতা অনেক কমে যাবে, পাঁচটা মনকে চালাতে আপনার কিছু শক্তি চলে যাবে। সেইজন্য হিন্দু ধর্মে সন্ন্যাসের আদর্শ হল – তোমার ক্ষমতা আছে তুমি একা বেরিয়ে যাও; ক্ষমতা নেই, compromise করো, দুজন মিলে চলো। তাছাড়া মানুষের মনে ইমোশান প্রবল ভাবে রয়েছে, ইমোশানালি মানুষ এত দুর্বল যে সব সময় সে একজনকে ধরতে চায়। যেমনি একজনকে ধরল, এবার দুজন দুজনকে কিন্তু শুষে নেবে। সিমায়েটি রিলেশানে কিছু ছাড়তে হয়। ঈশ্বরের জন্য যখন এগোচ্ছে তখন ছাড়াটা চলে না। ঠাকুর যখন বিবাহের কথা বলছেন, তখন এই অর্থে বলছেন। যারা পুরোদমে ঈশ্বরের দিকে এগোতে যাচ্ছে, সেখানে কোন ডাইভারশান আর চলবে না।

অনেক সময় দেখা যায়, বিশেষ করে বড় বড় কাজ করতে গেলে দেখা যায়, ওরা বলে ওটা ছেড়ে দিন, ওটা আমি একাই করব। কারণ ওই ডাইভারশান সিমবায়োটিক রিলেশানে একজনকে যখন টানছে, ওভাবে ওটা হয় না। পড়াশোনা যখন করতে হয় তখন একা একা করতে হয়, মনকে একাগ্র করার সময় তাকে একা হয়ে যেতে হবে। যদি না পারে তখন দুজন মিলে পড়ে, এও তাকে বোঝাচ্ছে, সেও তাকে বোঝাচ্ছে। দুজনেরই তাতে সুবিধা, কিন্তু দুজনেরই তাতে ক্ষতি হয়। কিন্তু যার ক্ষমতা আছে সে একাই করবে। ক্ষমতা নেই, এক থেকে দুই করবে। নরেনের নামে সেইজন্য বলছেন, আবার দেখ জিতেন্দ্রিয়। শুধু বিবাহকে নিয়ে না, বিবাহটা যেমন আছে আবার তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার আছে। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ইন্দ্রিয়ই হয় কাম, কামের ইচ্ছা। ওটার জন্যই বাকি সব কিছু চলে। এমন কি, বিবাহ হল, বিবাহের পর তিন-চার মাস ভাল ভাবে চলল, এরপর সারাটা জীবন তাকে ট্যাক্স দিয়ে যেতে হবে। জিতেন্দ্রিয় মানে, নিজেকে পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। সেখানে শুধু কাম না, বাকি যতগুলো ইন্দ্রিয় আছে, সব কটাই তার নিয়ন্ত্রণে আছে।

মূল বক্তব্য অতি সাধারণ। প্রথমের দিকে আমরা আলোচনা করলাম অধ্যাত্ম-ধর্ম আর ধর্ম-অধ্যাত্ম। ধর্মে অনেক ডানদিক-বামদিক করা হয় এবং করা যায়। আধ্যাত্মিকতাতে কোন কম্প্রোমাইজ হয় না। আধ্যাত্মিকতা হবে যারা অন্তরঙ্গ, শুধু তাদের জন্য। গীতাতে ভগবান বলছেন, *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী আমার আত্মা, ওটা আমি। অন্তরঙ্গ কি, সেও আমি। ঠাকুর আর নরেন আলাদা কিছু না। ঠাকুরও যা নরেনও তা, দুজনে এক অপরের আত্মা। *তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি*, সে

আমাকে কখন ভোলে না, আমিও তাকে ভুলি না। ভগবান যখন গীতায় এই কথাগুলো বলছেন, তখন তিনি অন্তরঙ্গদের কথাই বলছেন। যে কোন ভক্ত অন্তরঙ্গ হয়ে যেতে পারে। অন্তরঙ্গ হওয়া মানেই, ভিতরের দৃষ্টিতে সে একজন জিতেন্দ্রিয়। বহির্দৃষ্টিতে সে এখানে সেখানে যাবে না, অর্থাৎ ঈশ্বরের যে ঐশ্বর্য, তা যে কোন রূপেই হোক নাকে, সেদিকে সে যাবে না, শুধু ঈশ্বরের দিকে থাকবে। ঠাকুর যখন বলছেন, এখানেই আসবে, তার অর্থটাই এটা। গীতায় যেমন ভগবান বলছেন – *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং মম*, সব ছাড়, ছেড়ে আমাতে এসো, এখানেও ঠাকুর এটাই বলছেন।

এসব কথাবার্তা হওয়ার পর **ঠাকুর মণির সহিত আবার কথা কহিতেছেন।**

শ্রীরামকৃষ্ণ–তোমার আজকাল ঈশ্বরচিন্তা কিরূপ হচ্ছে? তোমার সাকার ভাল লাগে–না নিরাকার? ঠাকুরের সঙ্গে মাস্টারমশাইর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ঠাকুর তাঁকে একই প্রশ্ন করেছিলেন।

মণি–আজ্ঞা, সাকারে এখন মন যায় না। আবার নিরাকারে কিন্তু মন স্থির করতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ–দেখলে? নিরাকারে একেবারে মন স্তির হয় না। প্রথম প্রথম সাকার তো বেশ।

মণি–মাটির এই সব মূর্তি চিন্তা করা?

শ্রীরামকৃষ্ণ–কেন? চিন্ময়ী মূর্তি।

ঠিক একই কথা কিন্তু আগেরবারেও হয়েছিল, আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছিলাম। মণি আবার বলছেন –

মণি–আজ্ঞা, তাহলেও তো হাত-পা ভাবতে হবে? কিন্তু এও ভাবছি যে, প্রথমাবস্থায় রূপ চিন্তা না করলে মন স্থির হবে না–আপনি বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, তিনি তো নানারূপ ধরতে পারেন। নিজের মার রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়? এটা আমরা পরে আলোচনা করছি। তার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

মাস্টারমশাই প্রথমের দিকেও একই কথা বলেছিলেন যে, মাটির প্রতিমা করা যায় না ইত্যাদি। নিরাকার-সাকার এগুলোকে নিয়ে অনেক সময় আমাদের মনে হয়, বিশেষ করে খ্রীশ্চানিটি ও ইসলামের প্রভাবে, আমাদের হিন্দু ধর্ম যেন কোথাও ছোট হয়ে যাচ্ছে। প্রথম যখন আলোচনা করা হয়েছিল, তখন এটা বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছিল। আবার যেমন যেমন আসবে তেমন তেমন আমরা আলোচনা করতে থাকব। এখন এই জায়গাতে আমরা সাকার-নিরাকার আলোচনাতে ঢুকছি না। মাস্টারমশাই কিছু দিন আগেই এই একই প্রশ্ন করেছিলেন, ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়েছেন, মাস্টারমশাই আবার ওই একই আলোচনাতে যাচ্ছেন। এটাতে বোঝা যায়, একবার শুনলে ধারণা হয় না। মাস্টারমশাইকে ঠাকুর একজন অন্তরঙ্গ রূপেই গ্রহণ করছেন, একটু আগেই তাঁকে বললেন, যারা অন্তরঙ্গ তারা এখানেই আসবে। তিনি ঠাকুরের কথামৃতকার, ভগবানের কথাকে তিনি নোট করছেন, কিন্তু তাঁরও একবার শোনার পরেও ধারণা হচ্ছে না। আচার্য শিষ্যের কথায় বলছেন, উত্তম শিষ্যকে একবার বলে দিলে বুঝে নেয়, মধ্যম শিষ্যকে এক কথা বারবার করে বলতে হয় আর অধম শিষ্যকে যা বলা হবে, তার বিপরীত বুঝবে।

এক সময় স্বামী মোক্ষদানন্দজী, রাম মহারাজের কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। শিষ্যের এই শ্রেনী-বিভাগটা মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে, আর কখন-সখন অন্যান্য জায়গাতেও এই জিনিসটাকে নিয়ে আসা হয়েছে। তখন আমার বয়স কম ছিল, একদিন রাম মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি কখন হয় যে, ধর্মের কথা একবার বললেই বুঝে নেবে'? 'কেন, ঠাকুর নরেনকে বলছেন, নরেন একবারেই বুঝে নিয়েছেন। নরেন যে তর্কগুলি করতেন, একবারই তর্ক করতেন, দ্বিতীয়বার তর্ক করতেন না; ঠাকুর

বলছেন আর সঙ্গে সঙ্গে উনি বুঝে নিচ্ছেন'। মাস্টারমশাই কিন্তু পারছেন না। এটা দোষের কিছু না, আমি আপনি এই রকমই। এইজন্য বলে, শাস্ত্রের পারায়ণ করতে হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু জিনিস মাথায় বসিয়ে নিতে হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনে কোন একজনের কাছে গিয়ে যদি মাথা নত না করা হয়, সম্পূর্ণ ভাবে নত, এখানে আমি আমার মাথা নত করলাম, নরেন যেমন ঠাকুরের কাছে মাথা নত করেছেন; এই মাথা নত না হওয়া পর্যন্ত ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জিনিসগুলি ধারণা হওয়া খুব মুশকিল। অনেক সময় ঠাকুর নরেনকে কত গালাগাল দিচ্ছেন, নরেন আবার ঘুরে ঠাকুরের কাছে আসছেন। নরেনের দিকে ঠাকুর তাকাচ্ছেন না, তাও নরেন আবার আসছেন। মাথা নত হওয়া মানে এটাই। ঠাকুরই খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, যার চাকরির দরকার সে অফিসে গিয়ে খোঁজ করছে, বলে দিচ্ছে চাকরি নেই। পরের দিন গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করছে, 'আজ কি চাকরি খালি হয়েছে'? 'না, হয়নি'। পরের দিন আবার যাচ্ছে। যদি দেখেন কারুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেটে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে, আসলে ওই সম্পর্কের কোন দরকারই ছিল না। এটা যে কোন লোকের ক্ষেত্রে হতে পারে। ধরুন কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে হবে, আসলে এদের এই সম্পর্কের কোন দিন দরকার ছিল না। কারণ যদি দরকার থাকে, তাহলে আবার যাবে।

এই রকম আমার জীবনে অনেকবারই হয়েছে, বড়দের কাছে শিখেছি, তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, আমাকে বার করে দিয়েছেন, যাও আর আসবে না। বয়স তখন কম ছিল, তেজ ছিল, দিব্যি খেয়ে বলতাম আর আসব না। পরের সপ্তাহে আবার যেতাম। ওনারা তত দিনে ভুলে যেতেন যে, ওকে এই রকম বলেছিলাম। তার কারণ হল, আমরা বেশির ভাগই হলাম মধ্যম আর অধম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী আর অধম অধিকারীর মধ্যে আমাদের বাচ খেলা চলে। বেশির ভাগ সময় আমরা বিপরীত বুঝি, কখন ঘষেমেজে দিলে বুঝি। যখন জানা হয়ে গেল, আমরা সমস্যা এই, তখন গিয়ে মাথা নত করতে হয়। এই যে ঠাকুর বলছেন, গুরু লাখ লাখ মেলে, চেলা পাওয়া যায় না। মাথা নত করবে, এই রকম চেলা পাওয়া দুষ্কর। আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি আমার কাছে কেউ এভাবে এসেছে। যারা আসে সবাই গুরু হয়েই আসে। এখন ইন্টারনেট হয়ে পঞ্চাশটা জিনিস আগে থেকেই শিখে আসে, যখন আসে হয় আমাকে একটু ভেরিফাই করতে আসবে, দেখি এই ভদ্রলোক কিছু জানে কি জানে না। ফলে কি হয়, শেখাটা আর তাদের হয় না।

মাথা নত করার পর একটা যেটা বড়দের কাছে আমি শিখেছি – তা হল, আগে নিজেকে বুঝে নিতে হয় যে আমি উত্তম অধিকারী নই। উত্তম অধিকারী না হওয়াতে মাস্টারমশাই যেমন বারবার ঘুরে ঘুরে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন, ঠিক তেমনি শাস্ত্রের কাছে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। এটাকে বলে পারায়ণ করা। দুটো-তিনটে গ্রন্থ ঠিক করে নিন যে এই দুটো-তিনটে গ্রন্থ আমার – গীতা হতে পারে, শ্রীশ্রীচণ্ডী হতে পারে, কথামৃত হতে পারে। কথামৃত তো বর্তমান কালের বেদ। এরপর এগুলোকে নিত্যপাঠ করে যেতে হবে। আর গীতার একটা অধ্যায়ের শ্লোকগুলো পাঠ করে গেলাম তা না, যে কোন একটা ভাষ্য নিয়ে, পারলে আচার্য শঙ্করের ভাষ্য নিয়ে পড়তে হয়। প্রথম প্রথম হয়ত কিছুই বুঝতে পারবেন না, কিন্তু চেষ্টাটা করে যেতে হবে। এটাই গ্রন্থসেবা। এই গ্রন্থসেবাই হল গুরুসেবা।

আগেকার দিনে গুরু শিষ্যকে কয়েকটা গরু দিয়ে বলে দিতেন, যাও গরু চড়াও। ওই যে কাজ করছে, গরু চড়াচ্ছে, তখন মনের মধ্যে যে নানান রকম আবর্জনা জমে আছে, এগুলো পুড়ে যেত এবং জ্ঞানের উদয় হত। আপনি দীক্ষা নিয়েছেন, দেখবেন দীক্ষার ফল আসবে না। আপনি বলবেন কেন আসবে না? প্রথম হল, মন্ত্র জপ হয় না। দ্বিতীয়, জপ করি কিন্তু কিছু হয় না। তৃতীয়, অল্প একটু হয় কিন্তু বেশি এগোচ্ছে না; কারণ মন আবর্জনায় ভর্তি।

একবার একটি সাক্ষাৎকারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনে আপনার চল্লিশ বছর হল, এতদিনে আপনি কতটা এগিয়েছেন'। আমি বললাম যে, 'চল্লিশ বছরে এতটুকু বুঝতে পেরেছি যে, এই কথাগুলো একেবারে সত্য'। উনি বললেন, 'একটু বেশি সময় চলে গেল না! এটুকু বোঝার জন্য'? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমার আবর্জনা বেশি, তাই এতটা সময় লাগল; বাকিরা যাঁরা বলেন অনেক এগিয়ে গেছেন, বা অনেক বুঝে গেছেন, ওনারা সত্যিই ভাগ্যবান। তাঁদের হয়ত অত আবর্জনা ছিল না, আমার আবর্জনা বেশি ছিল, আমার কি আর করার আছে। যে সংস্কার নিয়ে এসেছি, সেই সংস্কার নিয়েই না থাকতে হবে'। এই আবর্জনা গুলো যখন পরিষ্কার হতে শুরু হয়, তখন প্রথমে যেটা আসে সেটা হল, আমি অধম আর মধ্যম এই দুটোর মাঝখানে।

নচিকেতা যমরাজকে বলছেন, *বহুনামেমি প্রথম বহুনামেমি মধ্যম*। অনেকের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, একবার বললেই বুঝি নিই; অনেকের মধ্যে মধ্যম হতে পারি, কিন্তু অধম কোন পরিস্থিতিতেই না। আমরা কিন্তু অধমের মধ্যেও পড়ি, কারণ অনেক সময় আমরা ভুল বুঝি। সেইজন্য গুরুসেবা করতে হয়, গুরুসেবা করলে তখন ওই আবর্জনাগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়। পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে একটা যজ্ঞ হল নিত্য ঈশ্বরের পূজা। ধারে কাছে যে মন্দির আছে, সেখানে গিয়ে রোজ প্রণাম করা। বাড়িতে নিত্য পূজা করা, শাস্ত্র পড়া; এগুলো করতে হয়, এগুলো করলে মনের আবর্জনাগুলি পরিষ্কার হয়। মন পরিষ্কার হলে তখন বিশ্বাস আসে যে, এই কথাগুলো ঠিক। এই বিশ্বাস আসার পর আপনি এবার ধীরে ধীরে এগোতে থাকবেন, এখনও রাস্থা অনেক দূর, কিন্তু শুরু হল। এর আগে পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে, এগুলো কিছুই না। বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছে, ওই নিয়েই আনন্দ করছে। দিল্লীর ওদিকে এগুলো এক একটা স্ট্যাটাস সিম্বল, উনি অমুক বাবাজীর আখড়ায় যান, উনি অমুক বাবাজীর ক্যাম্পে যান। স্ট্যাটাস সিম্বল দিয়ে আর যাই হয়ে থাকুক, ধর্ম সাধন হতে পারে না।

এই যে মাস্টারমশাই বলছেন, মাটির এই সব মূর্তি চিন্তা করা? আগেও একই কথা বলেছিলেন, আবার সেই কথা বলছেন। আমাদের অবস্থা এর থেকেও খারাপ, আমাদের একই সংশয় ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। এগুলোকে কাটানোর একমাত্র পথ – গুরুসেবা। আপনি অনেক দিন ধরে শাস্ত্র পাঠ করছেন, শাস্ত্রের পারায়ণ করছেন, তখন তিনি কৃপা করেন – এটাকে বলে শাস্ত্রকৃপা। শাস্ত্র যতক্ষণ না কৃপা করছেন ততক্ষণ আপনি শাস্ত্রের কথা বুঝতে পারবেন না। যেমন কঠোপনিষদে বলছেন, *যমেবৈষে বৃণুতে তেন লভ্য*, তিনি যাঁকে বরণ করেন, একমাত্র তিনিই তাঁকে পান।

জীবনের সব জায়গায় এটাই হয়; আপনি যেটাই করতে যাবেন, সেটা যদি আপনাকে বরণ করে, ধরুণ আপনি ফিজিক্স পড়তে যাচ্ছেন, এখন ফিজিক্স যদি আপনাকে বরণ করে তবেই আপনি ফিজিক্সের জ্ঞান পাবেন। আমি 'পরম' বইতে এই আইডিয়াটা এনেছিলাম, যেখানে পরম পাখোয়াজ বাজাতে বসেছে, বাজনা শুনে মনে হচ্ছে সরস্বতী দেবী যেন তাকে কোলে করে নিয়েছন, বাজনটাই পুরো অন্য এক মাত্রায় পৌঁছে গেছে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ের যে সম্পর্ক, সেখানে ছেলে মেয়েকে ধরে না, পাল্টাপাল্টি হয়। স্বয়ম্বরে যেমন বরণ করা হয়, আমি তোমাকে বরণ করলাম; ঠিক তেমনি যে কোন জিনিসে যদি সফল হতে চান, ওই বিদ্যাটা যেদিন আপনাকে বরণ করবে তবেই আপনি সেদিন সফল হবেন। আমরা যাঁরা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর এই ত্যাগ জিনিসটা যেদিন আমাকে বরণ করবে, সেদিনই আমি সফল হব। তার আগে আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, সাফল্য আসবে না। কিন্তু চেষ্টাটা সব সময় করে যেতে হয়, চেষ্টা করতে করতে তখন সেই যে ত্যাগ, তাঁর কৃপা হয়। ওই ত্যাগ যখন কোলে নিয়ে নিল, তখন এমনিতেই সব কিছু খসে পড়ে যাবে, তখন আর আমাকে চেষ্টা করে ত্যাগ করতে হবে না। ঠাকুর জ্ঞানীদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, জ্ঞানীর বেতালা পা পড়ে না। সন্ন্যাসী তখন চাইলেও অন্য রকম কিছু করতে পারবে না। যে সন্ন্যাসীকে ত্যাগ গ্রহণ করে নিয়েছে, সেই সন্ন্যাসী অন্যথা কিছু করতে চাইলেও পারবেন না।

মেরি লুইবার্কের বইতে বর্ণনা আছে, স্বামীজী যখন নিউইয়র্কে ছিলেন সেই সময়কার ঘটনা। একদিন একটা হলের মত বড় ঘরে ওনার সেক্রেটারি টাইপ করে যাচ্ছেন আর স্বামীজী সেই ঘরেই এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পায়চারি করে যাচ্ছেন। সেই ঘরের দেওয়ালে একটা বড় আয়না লাগানো ছিল। স্বামীজী দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। একদিক থেকে পায়চারি করতে করতে আরেক দিকে আয়নার কাছে যাচ্ছেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকক্ষণ দেখছেন, দেখে আবার পায়চারি করতে লাগলেন। ওনার সেক্রেটারি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, 'আমি স্বামীজীকে দেখছিলাম, দেখে আমি ভাবছি এবার স্বামীজী অহঙ্কারে ফাটবেন। স্বামীজী সব সময় আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ এগুলোকে নিয়ে বলতেন, কিন্তু নিজের রূপে মুগ্ধ হয়ে এবার নিজের রূপের অহঙ্কার করবেন'।

স্বামীজী অনেকক্ষণ এইভাবে পায়চারি করে যাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর স্বামীজী এসে সেক্রেটারিকে বলছেন, 'নাঃ হল না'। 'স্বামীজী কি হল না'? 'যতক্ষণ আমি আয়নার সামনে থাকছি, ততক্ষণ আমার চেহারা মনে থাকছে, যেমনি আমি আয়না থেকে ঘুরে যাচ্ছি, আমার চেহারা আর মনে থাকছে না'। তার মানে, তিনি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। যাঁর নিজের চেহারাটুকুও মনে থাকছে না, আমি দেখতে কেমন। আর এখানে দেখবেন লোকেরা আয়নার সামনেই বসে আছে, পার্সের মধ্যে আয়না নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যখনই সুযোগ পাচ্ছে আয়নাটা বার করে নিজেকে একটু ঘষে মেজে নিচ্ছে। কারণ তার মাথায় সব সময় ওটাই ঘুরে যাচ্ছে, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে, আমি কেমন দেখতে। পারায়ণ করতে করতে শাস্ত্রের কৃপা হয়; শাস্ত্র তখন নিজের উপর থেকে আবরণটা সরিয়ে দেন – এই দেখ, এটাই আমার স্বরূপ।

মাস্টারমশাইর এখন জানার ইচ্ছা আছে, উনি তখন বলছেন, নিজের মার রূপ ধ্যান করা যায় কিনা। এগুলো হল টিপিক্যাল একটা সংশয়াচ্ছন্ন মন। নিরাকারও ভাবছেন, সাকারও ভাবছেন। আমাদের কাছেও অনেকে মাঝে মাঝে এই ধরণের প্রশ্ন নিয়ে আসে, বা দেখা হলে অনেকে জিজ্ঞেস করে। ঠাকুর তখন বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ–হাঁ! তিনি (মা) গুরু–আর ব্রহ্মময়ী স্বরূপা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছেন, *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে*, যেখান থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়। মা জন্ম দিয়েছেন, সৃষ্টি সেখান থেকে, মা তো ব্রহ্মময়ী। জননী আর জগজ্জননী – তফাৎ কিছু নেই। তিনি জগৎকে প্রসব করেন, তিনি মা রূপে আমাকে আপনাকে প্রসব করেছেন।

মণি চুপ করিয়া আছেন। তারপর আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন।

মণি–আজ্ঞা, নিরাকারে কিরকম দেখা যায়?–ও কি বর্ণনা করা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু চিন্তা করিয়া)–ও কিরূপ জানো? –

এই কথা বলিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তৎপরে সাকার-নিরাকার দর্শন কিরূপ অনুভূতি হয়, একটি কথা বলিয়া দিলেন। আবার ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর জানেন, এর যে আধার, এই আধারে এখন বুঝতে পারবে না। পরেও বুঝতে পারবেন কিনা জানা নেই, কিন্তু তখন তো বুঝতে পারছেন না। কিন্তু ঠাকুর স্নেহ করেন, একটু আগে কেশব সেনের দুর্গার ব্যাখ্যা নিয়ে এবং অন্তরঙ্গ নিয়ে হাল্কা তিরস্কার করেছেন। একটু চুপ করে তাই ঠাকুর আবার বলতে শুরু করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ–কি জানো, এটি ঠিক বুঝতে সাধন চাই। যে কোন জিনিসে প্রস্তুতি যদি না থাকে, মন যদি প্রস্তুত না থাকে আমরা কোন জিনিস গ্রহণ করতে পারব না। আমাদের যে ষোড়শ সংস্কার হয়,

এখন দশটি সংস্কার করা হয়, তার মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ বাড়িতে উপনয়ন হয়। কিছু দিন আগে পর্যন্ত উপনয়ন হলে তার বেশ কয়েকদিন আগে থেকে নানারকম উপাচার চলছে তো চলছেই। বিবাহের আগে বাড়িতে নানা রকমের উপাচার বিধি চলছে তো চলছেই। কেন? মনকে প্রস্তুত করানো হচ্ছে। আর ইদানিং কালে? 'উঠ ছুড়ি তোর বিয়ে' বলে কোর্টে চলে গেল, আজকে বিয়ে করে নিল, কালকে ডিভোর্স করে দিল। মানসিক প্রস্তুতি নেই কিনা। যে কোন জিনিসে সাধন চাই। একটা জিনিসকে যখন আপনি মন থেকে গ্রহণ করে নিলেন, মন তৈরী হয়ে গেল, তারপরে শুধু একটু পড়ল, তাতেই কাজ হয়ে যায়। মন যদি তৈরী না থাকে, আপনি যতই ঢালতে থাকুন, কিছুই হবে না।

আধ্যাত্মিক জীবনে এটাই হয়, মনের প্রস্তুতি যদি না হয়, আপনি শাস্ত্র পড়ে যাচ্ছেন, শুনে যাচ্ছেন, বুঝতেও পারছেন কিন্তু ধারণা করতে পারছেন না, আর যেটুকু বুঝেছিলেন সেটুকুও দুদিন যেতে না যেতেই মন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমার এক পরিচিত ভদ্রমহিলা বিহারের খুব নামকরা রাজনীতির নেতা, অনেকদিন থেকে ওনাকে জানি। মাঝে মাঝেই পেপারে নাম আসে। আগে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল, এখন সেই সম্পর্ক নেই। কিভাবে কিভাবে তিনি বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তারপর একবার উত্তরকাশীতে আমার সঙ্গে দেখা হল, দেখছি আরেকজন গুরুর সাথে ঘুরছে। সে গুরু মানে কিছুই না, একেবারে বাজে লোক। আমি অবাক হয়ে বলেই ফেললাম, 'কি ব্যাপার আরেকটা দীক্ষা নিলেন'। পরে জানলাম ওনার এর আগে তিনটে দীক্ষা হয়ে গেছে। উনি শুনে বললেন, 'আসলে কলিযুগ কিনা, কয়েকটা গুরু থাকলে ভাল হয়'। তিনজনের কাছে আগে মন্ত্রদীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে। কোন প্রস্তুতি নেই, দীক্ষাটাও তিন জায়গা থেকে নিয়ে নিয়েছে। সাধনা ছাড়া বাকি সবটাই আছে। শাস্ত্র আছে, বিভিন্ন ক্যাম্পেও যাচ্ছে, দীক্ষাও তিন জায়গায় নেওয়া হয়ে গেছে, তাও কিছুই হচ্ছে না। কারণ সাধনা নেই।

ঠাকুর এর খুব সহজ উপমা দিচ্ছেন – **ঘরের ভিতর রত্ন যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তাহলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা দেওয়া ঘর – দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, 'ওই আমি দরজা খুললুম, সিন্দুকের তালা ভাঙলুম – ওই রত্ন বার করলুম'। শুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে তো হয় না। সাধন করা চাই**।

এ যেমন ঠাকুরকে একজন বলছে, মশাই আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন। এভাবে হয় না। যে কোন জিনিসে নিজের মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার, সাধন-ভজন করা মানে মানসিক প্রস্তুতি হয়ে গেছে। মন প্রস্তুত থাকলে একটুতেই হয়ে যাবে। একটু আগে বলা হল, ঠাকুর যেটা বলে দিচ্ছেন, সেটাকে নিয়ে নরেন দ্বিতীয়বার আর আলোচনা করছেন না, নরেনের মন তৈরী।

ক্রিস্টাল তৈরী উপমা আমরা অনেকবার বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছি। ক্রিস্টাল বানানোর জন্য প্রথমে ওর সল্যুশান বানাতে হয়। যেটাতে ওটা গলে যাবে সেটাতে আপনি ঢেলে যাচ্ছেন। পুরো মিলে যাওয়ার পর নীচে তাপ দিয়ে ওর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আরও ক্রিস্টাল দেওয়া হয়। স্যাচুরেটেড সল্যুশান, সেখান থেকে সুপার স্যাচুরেটেড সল্যুশান হয়ে গেল। এরপর যেমনি যত পিওর ক্রিস্টাল পড়বে ততটা খাঁটি ক্রিস্টাল হয়ে যাবে, যতটা ক্রিস্টাল কম থাকবে ততটা ইমপিওর থাকবে। প্রথমের দিকে যে ক্রিস্টাল দেওয়া হয়, এটা হল নানান রকমের যে শাস্ত্র আদি পড়া, সাধুসঙ্গ করা। ওতে যে তাপ দেওয়া হয়, এটা হল সাধন-ভজন। সাধন-ভজন করলে মনের ভিতরে তাপ সৃষ্টি করে, সেই তাপে স্যাচুরেটেড হয়েই যাচ্ছে, এরপর যেমনি গুরুর একটা দুটা কথা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টাল তৈরী হয়ে যাবে। নরেন আদি তৈরী ছিলেন, ঠাকুর একটা করে কথা দিচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা করে ক্রিস্টাল তৈরী হয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্র আদি পড়ছেন, সাধুসঙ্গ করছেন, মন্দিরে যাচ্ছেন, এগুলো সব ওতে যোগ হচ্ছে। এরপর জপধ্যান করে যখন তাপ সৃষ্টি হতে শুরু হয়, এরপরে শাস্ত্রের কথাগুলো একটু একটু করে বোঝা যায়। ঠাকুর কৃপাসিন্ধু, তিনি জানেন মাস্টার এখনও তৈরী নন, তাও তিনি সপ্তম পরিচ্ছেদে গিয়ে বলে দিচ্ছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর অনন্ত ও অনন্ত ঈশ্বর – সকলই পন্থা – শ্রীবৃন্দাবন দর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণ – জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। আমরা যখনই জ্ঞানী বলি, জ্ঞান কথা বলতেই সবার আগে আমাদের মাথায় শঙ্করাচার্য আসেন। শঙ্করাচার্যের যে বেদান্ত, ইদানিং এর একটা খুব সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে – Post Shankar Vedanta। শঙ্করাচার্যের পরবর্তি সময়ে তাঁর পরম্পরাতে যে বেদান্ত এসেছে, তাতে খুব নামকরা সব বেদান্তের আচার্যরা ছিলেন। কিন্তু এনাদের সমস্ত শক্তি চলে গেল মায়াকে পরিভাষিত করতে গিয়ে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, বাকি সব মায়া। মায়া মানে – এর অস্তিত্ব তিনটে কাল মিলিয়ে নেই – এখন আছে, গতকাল ছিল না, আগামীকাল থাকবে না। মায়া মানে মিথ্যা না, মায়া মানে স্বপ্ন না; মায়া মানে যার অস্তিত্ব ক্ষণিক। এই মায়াকে পরিভাষিত করতেই তাঁদের সমস্ত শক্তি চলে গেল। আচার্য শঙ্কর নিজে অবতার মানছেন, পুরো গীতার ভাষ্য তিনি ওই কারণেই রচনা করলেন। সেখানে তিন অবতারকে পরিভাষিত করছেন – *স চ ভগবান*। এটাকে এনারা বললেন শুদ্ধাদ্বৈত। এগুলো শব্দমাত্র। বেদান্তের কত রকম স্কুল, তার কত সব নাম, শুদ্ধাদ্বৈত, অচিন্ত্য-ভেদাভেদাদ্বৈত, এগুলো দেখে মনে হয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই যেন হিন্দু ধর্ম হয়েছে। এক-একজন আচার্য এসে এক-এক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আর সবাই মনে করেন, আমি ঠিক বাকিরা ভুল।

এই যে Post Shankar Vedanta, তাদের কাছে জ্ঞানী নিরাকার চিন্তা করে, তারা অবতার মানে না। কিন্তু আচার্য শঙ্করকে যদি পড়েন, বিশেষ করে গীতাভাষ্য, তাহলে দেখবেন কোথাও তিনি এই ধরণের কোন কথা বলছেন না। আচার্য বলছেন, যিনি ভগবান তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই বাসুদেব।

ঠাকুর এরপর বলছেন – **তারা অবতার মানে না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করছেন, তুমি পূর্ণব্রহ্ম,; কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি পূর্ণব্রহ্ম কি না দেখবে এস। এই বলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি কি দেখছ? অর্জুন বললে, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি–তাতে থোলো থোলো কালো জামের মতো ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বললেন, আরও কাছে এসে দেখ দেখি ও থোলো থোলো ফল নয়–থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে–আমার মতো। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে**।

মুসলমানরা বলে, মহম্মদ হলেন শেষ প্রফেট। সেমেটিক ধর্মে যে প্রফেটের ধারণা, জুহুদি ধর্মে পদে পদে প্রফেট, আর আমরা যে অবতার বলি, এই প্রফেট আর অবতার সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক সময় ইংলিশে বলা হয়, Sri Ramakrishna is the Prophet, এই কথাতে আমরা গুলিয়ে ফেলি যে শ্রীরামকৃষ্ণ আর মহম্মদ যেন এক। কিন্তু তা না, সেমেটিক ধর্মে যে প্রফেটের ধারণা পুরো আলাদা, আমাদের অবতারের ধারণা পুরো আলাদা। এমনকি যীশুকে যখন প্রফেট বলা হয়, তখন মুসলমানরা যীশুকে দেখেন একজন আচার্য রূপে আবার খ্রীশ্চানরা যীশুকে দেখেন ভগবান রূপে, কিন্তু তিনি হলেন ভগবানের সন্তান। আমরা যে অবতার বলি, সেখানে আমরা দেখি ভগবান সেখানে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হয়েছেন। এটা একটা বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। জুহুদি ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, এদের যে প্রফেট, এর সাথে আমাদের কোন মিল নেই। আমাদের অল্প যে একটু মিল আছে, সেটা হল, যীশুর যে বাইবেল তার সাথে অল্প একটু মিল আছে, সেটাও পুরো মিল আছে বলা যাবে না। কারণ সেখানে তিনি ভগবানের সন্তান, সন্তান ভগবানের থেকে কিছু আলাদা না। কিন্তু তাও ওই অর্থে ভগবান নয়। যার জন্য ওরা বলে, ওদের যে হোলি স্পিরিট, ভগবান আর যীশু, তিনটে এক। হিন্দুদের তা হয় না, ভগবান নিজেই আসেন। এটা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বৈষ্ণবদের মধ্যে। গোঁড়া বৈষ্ণবরা বলবেন, কৃষ্ণই ভগবান, তিনি অবতারি, বাকি সব অবতার।

মাঝে মাঝে মনে করি, এনারা কি তত্ত্ব বলছেন, নাকি শব্দের খেলা করছেন? কিসের অবতার আর অবতারি? এটা একটা অত্যন্ত সহজ জিনিস, বুঝি না এত সহজ জিনিসকে কেন এনারা এত জটিল করেন? মাঝে মাঝে মনে হয়, এদের মনটাই হয়ত জটিল। ঠাকুর বারবার বলছেন, তিনি অনন্ত, তাঁর অনন্ত ভাব। অনন্ত অনেক প্রকার হয়, গণিত শাস্ত্রে অনন্তের একটা অর্থ, ফিজিক্সে অনন্তের একটা অর্থ, আমাদের স্পেসের একটা অনন্ত অর্থ। সাধারণ ভাবে আমরা যখন অনন্ত ভাবি, আমরা তখন মনে করি সমুদ্র, আকাশের মত অনন্ত বিরাট বড়। অনন্ত তা নয়, অনন্ত মানে যাঁর অন্ত হয় না। ভগবান অনন্ত, ভগবান যদি অবতার হন, তাঁর অবতারও অনন্ত হবে। অমুক শেষ প্রফেট কোন দিন বলা যাবে না, আর শেষ প্রফেট কোন দিন হবেনও না। আর কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান, কৃষ্ণই অবতারি; এর মত বোকা কথা আর হতে পারে না। যাঁরা শুনছেন তাঁরা বোকা, যাঁরা বলছেন তাঁরা আরও বেশি বোকা।

একটা খুব সাধারণ যুক্তি, সেটাকে নিয়ে বিরোধিতা করছে। ধর্ম কখনই বিশ্বাসে চলে না, ধর্ম পুরো যুক্তিসঙ্গত। যাঁরা মনে করেন ধর্ম বিশ্বাসে চলে, তাঁরা ধর্মকে বোঝেন না, ধর্ম পুরোপুরি যুক্তিতে চলে। তিনি চৈতন্য; আকৃতি, আকার, সীমাবদ্ধতা, এগুলো প্রকৃতির এলাকায় হয়। প্রকৃতি চিন্তার জগৎ, প্রকৃতি বস্তুর জগৎ, এখানে একটা সীমা আছে, চৈতন্যের কোন সীমা হয় না, তিনি অনন্ত। যাঁরা ধ্যানের গভীরে গেছেন তাঁরাও একই কথা বলছেন, বেদ একই কথা বলছেন, উপনিষদও একই কথা বলছেন, খ্রীশ্চানদের বাইবেল আদি গ্রন্থে একই কথা বলা হয়েছে, আল্লাকে মহম্মদ যখন বর্ণনা করছে, তখন তিনিও একই কথা বলছেন। সবাই যখন একই কথা বলছেন, তাহলে শেষ প্রফেট, একজনই প্রফেট – এই কথাগুলো কোথা থেকে আসে? আসে নিজের মস্তিষ্ক থেকে।

চৈতন্যকে যখন মন দিয়ে ব্যাখ্যা করা হবে, অনন্তকে যখন একটা সীমিত বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হবে, তখন এভাবেই ব্যাখ্যা করা হবে। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য থোলো থোলো জামের যে উপমা ঠাকুর দিচ্ছেন, এই উপমা ঠাকুর নিজের মন থেকে তো দিচ্ছেন না, ঠাকুর কোন পুরাণ থেকে নিয়ে আসছেন। থোলো থোলো কৃষ্ণ, তার মানে অসংখ্য অবতার। আমরা কি করে জানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত বড়? বলছেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। একদিকে অনেকের মনে হতে পারে এগুলো পুরাণের কল্পনা, এগুলো কবিতা। একেবারে ঠিক। কিন্তু আপনি পুরো যুক্তির দিকে যান, ভগবান যিনি অনন্ত ঐশ্বর্যবান, তাঁর মানেই দাঁড়ায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, যুক্তিতেই বলছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যদি হয়, তাহলে কোটি কোটি অবতার যে কোন সময়ে হবে। কোটি কোটি অবতার হোক আর নাই হোক, প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডের জন্য যে ভগবান, সেখানকার লোকেরা যেভাবে দেখছে তাতে তো আলাদা হবেই, এতে কোন সন্দেহই নেই। আর তিনি সেখানে অবতার হয়ে আসবেনই, খুব সাধারণ যুক্তি। এখানে বিশ্বাসের কিছু নেই, এটাকে মানা, না মানার কিছু নেই, অতি সাধারণ জিনিস।

কিন্তু আমাদের এখানে হিন্দুদের দুর্ভাগ্য, নিজেদের শাস্ত্র পড়তে চায় না, শাস্ত্র পড়লে বুঝতে চায় না। অল্প যেটুকু বোঝে সেটাও বাইরে থেকে নিয়ে আসে। খ্রিশ্চানিটি, ইসলামের কটা কথা নেবে, কটা কথা আমাদের নেবে, সেটা আবার অন্যদের উপর চাপিয়ে দেবে। এরপর কি যে আকৃতি হবে ভগবানই জানেন – আকৃতিটা গরুর, মুখটা ঘোড়ার, লেজটা হাতির তারপর ডানা জুড়ে একটা পাখি বানিয়ে কি একটা কিম্ভূৎকিমাকার জীব বানিয়ে দেবে, যেটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। শাস্ত্রে যখন খুঁজতে যাবেন, ওই রকম বস্তু আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেইজন্য কথামৃত হিন্দু ধর্ম যেমনটি তেমনটি আবার হিন্দু ধর্মকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে জিনিসটা করেছিলেন, বেদের যে ধর্ম সেটাকে গীতায় আবার হিন্দু ধর্মকে পুনঃস্থাপন করে দিলেন। গীতার পরে এই কথামৃত আবার হিন্দু ধর্মকে পুনঃস্থাপন করে দিলেন – দেখো ধর্ম মানে এই, এখানে তোমার বুদ্ধিকে লাগাতে যেও না, কারণ তোমার বুদ্ধি সীমিত বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি আবার সংসারের কাজে লাগিয়ে আরও হ্রাস হয়ে গেছে।

"কবীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণের কথায় কবীর দাস বলত, ওঁকে কি ভজব?–গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন"। এগুলো ভাগবতে বর্ণনা আছে, কৃষ্ণ তখন চার-পাঁচ বছরের। অনেক সময় পরিচিত কেউ বাড়ি এলে, নিজের ছোট বাচ্চাকে বা নাতিকে বলবে, খোকা, মহারাজকে একটু শুনিয়ে দাও তো আতা গাছে তোতা পাখি। খোকাও শোনাতে শুরু করে দেয়, আমরাও শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে গেছি। ওরা ওই সংসার নিয়ে আছে, ওতেই ওদের আনন্দ। গোপীদেরও ওটাই আনন্দের, গোপীরা ছোট শিশু কৃষ্ণকে বলছেন, কৃষ্ণ একটু নেচে দেখাও, কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে নাচতে শুরু করে দিল। কৃষ্ণ কুস্তি কিভাবে লড়ে দেখিয়ে দাও। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে নিজের থাইয়ের উপর চাপড় দিয়ে দেখাতে লাগল। এটাকেই কবীর দাস মজা করে বলছেন – গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন। এই কথা বলে ঠাকুর আবার বলছেন – **আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার, আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার**।

মণি (সহাস্যে)–যাঁর কথা হচ্ছে তিনিও (ঈশ্বর) যেমন অনন্ত, আপনিও তেমনি অনন্ত!– আপনার অন্ত পাওয়া যায় না। ঠাকুরও হেসে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – তুমি বুঝে ফেলেছ! এটা ঠাকুর এই অর্থে বলছেন না যে, তুমি ঠিক বুঝেছ, আমিই অনন্ত। একটা আইডিয়া দিচ্ছেন, হ্যাঁ অন্যরা যেমন পড়াশোনা করা পণ্ডিত, অন্যরা যে অর্থে জ্ঞানী, আমি সেই অর্থে না।**–কি জানো–সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়।- সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। খেলার ঘুঁটি সব ঘর না পার হলে কি চিকে উঠে?–ঘুঁটি যখন চিকে উঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না**।

ভগবানও যখন অবতার হয়ে আসেন, লোকেদের দেখানোর জন্য তিনি নিজে সব ধর্ম করে দেখিয়ে দেন, দেখ সব ধর্মই ঠিক। অনেক কিছুই তিনি করেন, যদি একটা জিনিসকেই ধরে নেন, তখন বলতে হয় তিনি অবতার নন, ইনি আচার্য। অবতার যেন লুডোর ঘুঁটির মত, সব ঘর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়, অবতার সব কিছু দিয়ে যান, সব কিছু দিয়ে না হলেও অনেক কিছু দিয়েই যান। মণি বলছেন, **আজ্ঞা হ্যাঁ**।

শ্রীরামকৃষ্ণ–যোগী দুই প্রকার– বহুদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছে–যার মনে এখনও শান্তি হয় নাই, তাকে বহুদক বলে। আসলে মন যখন শান্ত হয়ে তখন আর কোথাও যেতে চায় না। যে-যোগী সব ঘুরে মন স্থির করেছে, যার শান্তি হয়ে গেছে–সে এক জায়গায় আসন করে বসে–আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। তার তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। বলছেন, একেবারেই যে যায় না, তা না, তাহলেও যায় – **যদি সে তীর্থ যায়, সে কেবল উদ্দীপনের জন্য**। 'উদ্দীপন' শব্দটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

'উদ্দীপন' হল – প্রদীপে তেল রয়েছে, একটা কাঠি লাগিয়ে সলতেটা একটু ঠেলে দিলেন, প্রদীপের আলোটা আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। দীপ থেকে উদ্দীপন আসে। মন ভাবে পরিপূর্ণ, ভাবে মন একেবারে টগবগ করছে – একটু কিছু দিলেই ওটা জ্বলে ওঠে। কুটীচক যাঁরা, এনারা কোথাও যান না। এটা দেখা হয়ে গেছে, সেটা দেখে নিয়েছে, আগে আগে সব হয়ে গেছে, এখন আর কিছু নেই দেখার মত। পরে ঠাকুর আবার বলবেন – কিন্তু গেলে কি হয়, উদ্দীপন হয়, এই জায়গাতে ঠাকুর নিজের তীর্থদর্শনের কথা বলবেন। এখানেও বলছেন, কেবল উদ্দীপনের জন্য, গেলে ভাল লাগে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে নারদ বলছেন, যোগীরা তীর্থে যান ওই তীর্থস্থানকে আবার পুরো চার্জ করে দেওয়ার জন্য - *তীর্থীংকুর্বন্তি তীর্থানি*।

"আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল – হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত – এ-সব পথ দিয়ে আসতে হয়েছে"। এগুলোকে, এক-একটা পথকে ঠাকুর ধর্ম রূপে বলছেন। **"দেখলাম, সেই এক ঈশ্বর – তাঁর কাছেই সকলি আসছে – ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে"**।

"তীর্থে গেলাম তা এক-একবার ভারী কষ্ট হত। কাশীতে সেজোবাবুদের সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে"। এগুলো খুব নামকরা ঘটনা। ঠাকুরের জীবনী, কথামৃত যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানবেন। ঠাকুরের এমন অবস্থা যে, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা তাঁর চলবে না। বিশেষ করে সেজোবাবুদের সঙ্গে তীর্থে গেছেন, সেই সময় ওনার মন পুরো ঈশ্বরের ভাবে ডুবে আছে। বাচ্চারা যেমন মাকে ছেড়ে দূরে গেলে মা ছাড়া ওর কিচ্ছু ভাল লাগে না, খেলনা দিলে ছুড়ে ফেলে দেবে আর চেঁচিয়ে সবাইকে অস্থির করে দেবে। ঠাকুরের তখন সেই অবস্থা। বলছেন, **"সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে। - টাকা, জমি, এই সব কথা"**। ঠাকুর কাঁদছেন, বলছেন, **"মা কোথায় আনলি। দক্ষিণেশ্বরে যে আমি বেশ ছিলাম"**। ঠাকুর বলছেন, সব একই রকম দেখলাম। আসলে কি হয়, তীর্থ বলুন, সাধুসঙ্গ বলুন সবটাই হল ভিতরে ভাব জমানোর জন্য। ভাব একবার জমে গেলে তখন এগুলো আর কিছু দরকার পড়ে না। অনেক সময় একটা কৌতুহল থাকে, আচ্ছা জায়গাটা কেমন, একটু দেখে নিলাম ঠিক আছে।

"তবে তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে"। আবার উদ্দীপন নিয়ে আসছেন। যখন কেউ তীর্থে যায়, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, পুরী যাচ্ছেন, উদ্দীপনের জন্য যেতে হয়, তাতে ভাবটা জাগে। আগেকার দিনে লোকেরা যখন তীর্থে যেত, যাওয়ার আগে অনেক দিন ধরে প্রস্তুতি নিত, ফলে ওখানে গেলে মনটা সত্যিই একটা উচ্চ অবস্থায় চলে যেত। এখানে একটা বিরাট লম্বা বর্ণনা করছেন। **"মথুরবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলাম। মথুরবাবুর মেয়েরাও ছিল–হৃদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখামাত্রই উদ্দীপন হত– আমি বিহ্বল হয়ে যেতাম। হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে ছেলেটির মতন নাওয়াত"**। ঠাকুরের সেই সময় কোন হুঁশ থাকত না।

"যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম"। এখনও যদি বৃন্দাবনে যান, যমুনা নদীর উপর অনেকগুলো পুল রয়েছে, পুল পেরিয়ে যমুনার ওপারে যদি যান, দেখবেন সব সেই একই রকম আছে। আমি বৃন্দাবন গেলে বিকেলের দিকে প্রায়ই চেষ্টা করি যমুনা পেরিয়ে ওপারে চলে যাওয়ার। নিজের মত একা একা হাঁটি। আর তখন মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের সময়কার যে বর্ণনা আমরা ভাগবতে পাই, সেই একই জিনিস এখনও রয়েছে। **"যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হতে গরু সব ফিরে আসত। দেখামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হল, উন্মত্তের ন্যায় আমি দৌড়াতে লাগলাম – 'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই' এই বলতে বলতে"**। ঠাকুর নিজের ভাবের কথা বলছেন। এখনও ওই জায়গাটাতে যদি দাঁড়ান, মাঝে মাঝে ট্র্যাক্টর, মোটর সাইকেল যাচ্ছে ঠিকই, এটুকু বাদে মনে হয় যে সত্যি ভাগবতে ভগবান কৃষ্ণের জীবনের যে বর্ণনাগুলি রয়েছে, সেই একই দৃশ্য, একই অবস্থা আজকেও আছে।

এরপর বর্ণনা আছে, এগুলোর ব্যাখ্যা করার কিছু নেই, নিজের মত পড়ে নিলেই হবে। ঠাকুর শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের পথে যাচ্ছেন। গোবর্ধন পর্বতে উঠে ঠাকুর বিহ্বল হয়ে গেছেন। ব্রজবাসীরা সেখান থেকে ঠাকুরকে সন্তর্পণে নামিয়ে আনলেন। পালকি করে যাচ্ছেন, হৃদয়রাম পালকির পিছন পিছন চলেছেন আর বেয়াড়াদের সাবধান করে দিচ্ছেন, 'খুব হুঁশিয়ার'। কারণ ঠাকুর ভাবে রয়েছেন, ভাবের ঘোরে পালকি থেকে পড়ে না যান।

গঙ্গামায়ী একজন ভক্তিমতি মহিলা, বৃন্দাবনেই থাকতেন। ঠাকুরকে খুব ভালবাসতেন, দেখছেন এও একজন কৃষ্ণভক্ত। ঠাকুর বলছেন, **"গঙ্গামায়ী বড় যত্ন করত। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে**

কুটিরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে, বলত –ইনি সাক্ষাৎ রাধা দেহধারণ করে এসেছেন"। 'ইনি সাক্ষাৎ রাধা দেহধারণ করে এসেছেন', এই বাক্যটা খুব মুল্যবান।

রাধা আর কৃষ্ণ এই দুটো নাম শুনলেই আমাদের ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়, রাধা আর কৃষ্ণ মানে আমরা মনে করি প্রেমের ব্যাপার। কেন প্রেম হবে? এটা প্রেমাভক্তি, এটা পরাভক্তি, যে ভক্তির বর্ণনা হতে পারে না। সাধক যখন ইষ্টসাধন করে তখন রাধা যেভাবে কৃষ্ণকে চাইতেন, সাধকের ইষ্টের প্রতি ভক্তি ঠিক সেই ভাবেই যায়। ঠাকুরের দুটো রূপ –একদিকে তিনি অবতার আবার অন্য দিকে তিনি একজন ভক্ত। যখন তিনি ভক্তরূপে নিজেকে নিয়ে যেতেন তখন প্রেমাভক্তি, ঈশ্বরের প্রেমে ডুবে আছেন। সেইজন্য গঙ্গামীয় ঠাকুরকে 'দুলালী' বলে ডাকতেন। হিন্দিতে দুলালী মানে আদুরে। রাধার একটা নাম দুলালী। "**তাকে পেলে আমার খাওয়া-দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া সব ভুল হয়ে যেত। হৃদে এক-একদিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত – সেও খাবার জিনিস তয়ের করে খাওয়াত**"।

আবার বলছেন গঙ্গামায়ীর ভাব হত। অনেক সময় ভাব অনেকেরই হয়, ভাবে যখন খুব ডুবে যায় তখন ভাব হয়। "**তার ভাব দেখবার জন্য লেকের মেলা হত। ভাবেতে একদিন হৃদের কাঁধে চড়েছিল**"।

"**গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিক-ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব, গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হবে, আমার বিছানা ওদিকে হবে**"। এগুলো সব বর্ণনা। কিন্তু হৃদয়রাম ছাড়বে না। হৃদয়রাম ঠাকুরের এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী আরেক হাত টানছেন। ঠাকুর ঠিক করতে পারছেন না, কি করবেন। সেই সময় মনে পড়ল, ওনার মা দক্ষিণেশ্বরে একা আছেন। মায়ের কথা মনে পড়তেই তিনি আর বৃন্দাবনে থাকতে রাজী হলেন না।

"**বৃন্দাবনের বেশ ভাবটি। নতুন যাত্রী গেলে ব্রজ বালকের বলতে থাকে, 'হরি বোলো, গাঁঠরী খোলো**"। গাঁঠরী মানে তীর্থযাত্রীদের সাথে যে পুটলিটা থাকে, গাঁঠরী খুলতে বলা মানে, কিছু টাকা-পয়সা ছাড়। এখন এসব উঠে গেছে। আগেকার দিনে সাধারণ ঘরের বাচ্চারা মিষ্টি, ভাল খাবার কিছু পেত না। গ্রামের মন্দিরে কোন ভক্ত এলে কিছু প্রসাদ চড়াবে, বাচ্চাগুলো সব লাইন করে দাঁড়িয়ে যেত, আজকে একটু প্রসাদ পাওয়া যাবে। আসলে বাচ্চাদের বড় হয়ে ওঠার সময়টাই ওদের একটু মিষ্টি দরকার পড়ে। ভারত তখন একটা গরীব দেশ, কোথায় মিষ্টি পাবে। প্রসাদের মাধ্যমে যদি একটু মিষ্টি পাওয়া যায়। সেইজন্য ওরা বলত ভগবানের নাম করে তুমি কিছু আমাদের দাও, এটাই ওদের ভাষায় গাঁঠরী খোলো। কয়েক বছর আগেও কামারপুকুরে কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়েরা থাকত। কলকাতা বা বাইরে থেকে ট্যুরিস্ট ভক্তরা এলে কিছু অর্থের বিনিময়ে ওরা কামারপুকুর ঘুরিয়ে দেখাত, এক প্রকার গাইডের কাজটা ওরাই করত। তখনকার দিনে ওদের আটা আনা, এক টাকা দিয়ে দিলে খুব খুশি হয়ে যেত।

এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে বেলা হয়ে গেছে। "**বেলা এগারটার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নে একটু বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তায় কাটাইতেছেন– কেবল মধ্যে মধ্যে এক-একবার প্রণবধ্বনি বা 'হা চৈতন্য' এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন**"।

এই ভাবে দিন কেটে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মাস্টারমশাই সব বর্ণনা করে যাচ্ছেন, এর মধ্যে এমন কিছু নেই। সেদিন মা-কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হয়েছিল। মাকে দেওয়া হয়েছে বলে ঠাকুর স্পর্শটুকু করলেন। এখানেই এই পরিচ্ছেদ শেষ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বলরামাদির সঙ্গে – বলরামকে শিক্ষা

মঙ্গলবার অপরাহ্ণ, ২৪শে অক্টোবর (৮ই কার্তিক, ১২৮৯, শুক্লা ত্রয়োদশী)। বেলা ৩টা-৪টা হইবে। মাস্টার আছেন, বলরামও আছেন। ঠাকুর খাবারের তাকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আগেকার দিনে দেওয়ালে তাক থাকত, তাতে অনেক কিছু রাখা থাকত, মিষ্টি আদিও রাখা থাকত। ঠাকুরের ঘরেও ওই রকম তাক ছিল। ঠাকুর বলরাম ও মাস্টারকে হাসতে হাসতে বলছেন, **তাকের উপরে খাবার নিতে গিছিলাম, খাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় টিকটিকি পড়েছে, আর অমনি ছেড়ে দিইছি**। (সকলের হাস্য)

এই পরিচ্ছেদে ঠাকুর বলরাম ও মাস্টারকে নিজের কিছু কথা বলছেন। এই পরিচ্ছেদ খুব নামকরা। যাঁরা নিজেদের যুক্তিবাদী বলে মনে করেন, তাঁরা অনেক সময় এই পরিচ্ছেদের কথাগুলোকে নিয়ে তার সাথে ঠাকুরের আরও অনেকগুলো কথাকে একসাথে করে নিয়ে আলোচনা করেন। যাঁরা ভক্ত তাঁরা যেমন আছে তেমন ভাবেই সব মেনে নেবেন। কিন্তু ভক্তদের মধ্যে কিছু আছেন, যাঁদের মধ্যে কেউ মনে করেন এটা একটা বিশ্বাস, কেউ মনে করে এটা অন্ধ বিশ্বাস বা এটা শ্রদ্ধা; তখন এগুলোকে নিয়ে সমস্যা হয়ে যায়। তার মধ্যে একটা খুব নামকরা ঘটনা, ঠাকুর হাত দিয়েছেন হঠাৎ একটা টিকটিকি পড়েছে, এটাকে বলা হয় খটকা; খটকা হয়ে গেছে ঠাকুর খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তারপরে ঠাকুর বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ – হাঁ গো, ও-সব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের অসুখ, আমারও হাত-পা কামড়াচ্ছে। হল কি জানো? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি! (সকলের হাস্য) হাঁ গো লক্ষণ দেখতে হয়। আবার নরেনের নামে বলছেন, নরেন কোন বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল, তার শরীরে এই দোষ। সেখান থেকে আবার বলছেন একজন আসে তার জিনিস খেতে পারি না। তার কুড়ি টাকা মাইনে, আর কুড়ি টাকা মিথ্যা বিল করে পায়।

এই যে টিকটিকি পড়েছে, ঠাকুর খেলেন না; অমুকের মুখ দেখেছেন বলে মনে করছেন শরীরে এগুলো হয়েছে। আমরা প্রথমের দিকে যখন কথামৃত শুরু করেছিলাম, তখন একটা আলোচনা হয়েছিল, যেখানে ঠাকুর বলছেন, আমি লক্ষণ দেখে বুঝতে পারি। মাস্টারমশাইয়ের কপাল, চোখ দেখে বলছেন, এগুলো দেখে মনে হয় যেন তিনি ঈশ্বরের জন্য বলিপ্রদত্ত। কিন্তু বিবাহ করেছেন, সন্তানাদি হয়েছে দেখে ঠাকুরের মন খারাপ হয়ে গেছে। টিকটিকি পড়া, খাওয়া ছেড়ে দেওয়া, এগুলোকে নিয়ে যুক্তিবাদীরা অনেক কথা বলবেন। বর্তমান কালে ম্যাজিক্যাল প্র্যাক্টিসেস নিয়ে আইন-টাইন পাশ হয়েছে, যারা ডাইনি বিদ্যা ও আরও এই ধরণের কিছু ম্যাজিক্যাল বিদ্যা করে তাদের সাজা হয়ে যাবে। কয়েকজনের সাথে আমার কথা হয়েছে, তাঁরা মনে করেন, ঠাকুর অবতার, তিনি এগুলো কি করে সমর্থন করে গেলেন! এখানে বেশ কিছু জিনিস বোঝা দরকার।

প্রথম যে জিনিসটা বোঝা দরকার, 'টিকটিকি পড়েছে', এটা খটকা, থেমে যেতে হবে। অবতাররা বা খুব উচ্চমানের মহাত্মা যাঁরা, যাঁদের কথা গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে বলা হয়েছে, যাঁকে জীবনমুক্ত বলা হয়, সংসারের প্রতি এনাদের যে আচরণ, বিশেষ করে জগতের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে গীতায় খুব সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে – *যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনে।।*

আধ্যাত্মিক পুরুষ আর সাধারণ মানুষে তফাত কোথায়? বলছেন, সাধারণ মানুষ যেখানে জেগে থাকে, যে জায়গাতে অনেকগুলো জিনিস দেখছে – যুক্তি দেখছে, তর্ক দেখছে, বিজ্ঞান দেখছে, সাহিত্য দেখছে, কলা দেখছে, সংস্কৃতি দেখছে, এগুলো সব জ্ঞানীদের জন্য অন্ধকার। জ্ঞানীদের কাছে

ঈশ্বরজ্ঞানের সামনে এগুলো সব বিলীন হয়ে যায়। আর সংসারী লোকেদের কাছে যে জায়গাটা, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সত্যের জায়গাটা অন্ধকার, জ্ঞানীদের কাছে সেই জায়গাটা আলোকিত। অবতার যখন আসেন, আর অবতারের যাঁরা অন্তরঙ্গরা থাকেন, তাঁদের একটাই কাজ – লোকদের এটা বোঝান যে, তুমি যেটাকে নিশা মনে করছ, ওটা আসলে নিশা না, ওটা দিনের আলো; যেটাকে তুমি দিবা মনে করছ, আমার কাছে ওর কোন দাম নেই, তুমি যা যা করছ ঠিক আছে। টিকটিকি পড়াকে তুমি মানছ, মানো; মানতে চাইছ না, মানতে হবে না। এখানে এটাই মূল কথা।

এই জিনিসটাকে আমাদের ভাল করে বোঝা দরকার – অবতাররা যাঁরা আসেন তাঁরা কেউই সমাজ সংস্কারক নন, কিন্তু এই ব্যাপারটাকেই আমরা গুলিয়ে ফেলি। মেরি লুইবার্কের একটা বর্ণনা আছে, স্বামীজী লণ্ডনে থাকার সময় জগদীশ চন্দ্র বোসও সেখানে কোন ভাবে উপস্থিত ছিলেন, তখনও উনি অতটা বিখ্যাত হননি। বর্তমানে স্কুলের ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকে যেখানে সমাজ সংস্কারকের বর্ণনা আসে, এনারা সেখানে আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন এগুলোর নাম নেন। ছোটবেলা থেকে এগুলো পড়তে পড়তে কোথাও গিয়ে আমাদের মনে হয় স্বামীজী যেন ভারতের সমাজের সংস্কার করতে এসেছিলেন। ঠাকুরকে নিয়ে আমরা সরাসরি অতটা বলতে পারি না, বলার সাহস নেই বলে থেমে যাই। কিন্তু যারা রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত না, তাদের কাছে এটা পরিষ্কার – হ্যাঁ কিছু একটা করেছিলেন, ওই শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু আসলে উনি একজন সমাজ সংস্কারক। স্বামীজীকে একজন জিজ্ঞেস করছেন, মহাশয়, বিধবা বিবাহে আপনার কি মত? স্বামীজী উত্তর দিচ্ছেন – আমি বিধবাও না, আমি বিবাহও করতে যাচ্ছি না। আবার ভারতে ফিরে আসার পর ভারতে তিনি যে লেকচারগুলো দিয়েছেন, সেখানে তিনি বারবার বলছেন, লোকেরা একটা পরিবর্তন চাইছে, সংস্কার চাইছে। আমি কিন্তু একটু এখানে, একটু সেখানে, আমি এই ধরণের সমাজ সংস্কারক নই, আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কিছুর আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী। কেন?

যখন অবতার আসেন, অবতারের সঙ্গী শ্রীশ্রীমা, অবতারের সঙ্গী স্বামীজী, এনাদের উদ্দেশ্য একটাই – ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এ-ছাড়া অন্য কোন কিছু নেই। এই সত্যকে যখন সমাজে নামাতে যান তখন দু-চারটে জায়গাতে তাঁদের হাত দিতে হয়। যতটুকু হাত লাগালে ওই বিদ্যাটা এসে যাবে, অতটুকুই এনারা হাত লাগাবেন, তার বাইরে ছোবেন না। যেমনটি আছে তেমনটি থাকবে। সমাজের স্বাভাবিক গতিতে এগুলো যদি পাল্টে যায়, পালটে যাবে। সমাজের স্বাভাবিক গতিতে এগুলো যদি ধ্বংস হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যাবে। ওনাদের এটা কাজ না। আজকে ভারত স্বাধীন, চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে আমরা এখন অনেক স্বাধীন হয়ে গেছি, অনেক সময় হয়ত অতটা মনে হয় না, কিন্তু স্বামীজী তখন ভারতে লেকচারগুলিতে বলছেন, আমেরিকা থেকে চিঠিতে লিখছেন, ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত, আর ১৮৯৭ সালে এসে যখন লেকচারগুলি দিচ্ছেন, যদি আমরা কল্পনা করি তখন ভারতের কি অবস্থা, যারা ইয়ং তাদের রক্ত গরম হয়ে উঠবেই, তারা তখন চাইবে আমরা দেশের জন্য, সমাজের জন্য কিছু করি। উদ্দেশ্য কিন্তু স্বামীজীর একবারও এটা নয় যে, তিনি যুবকদের তাতাবেন। এগুলো হল বাই-প্রোডাক্ট, একটা জিনিস যখন তৈরী করা হয়, সেই জিনিসটা তৈরী হওয়ার সাথে সাথে তখন আরও কিছু তৈরী হয়ে যায়। ঠিক তেমনি অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো অবতার এলে হয় – সঙ্গীত জগতে প্রভাব পড়ে, নৃত্যকলাতে প্রভাব পড়ে, সাহিত্যে প্রভাব পড়ে, চিন্তা-ভাবনাতে প্রভাব পড়ে আর সমাজে প্রভাব পড়ে। অবতার কিন্তু সরাসরি কোথাও কখন হাত দেন না। তোমার যেগুলো বিশ্বাস, যেগুলো তোমার অন্ধ বিশ্বাস, যৌক্তিক অযৌক্তি যা কিছু আছে, ওগুলোতে উনি হাত দেবেন না।

যীশু যখন এলেন, তিনিও তখন এটাই বললেন, আমি ভাঙতে আসিনি আমি গড়তে এসেছি। যেটা ভাঙার সেটা নিজেই ভেঙে যাবে, যেটা চলে যাবার সেটা নিজেই চলে যাবে। আমরা অনেকবার গাছ কাটার উদাহরণ নিয়েছি। গাছ পুরো কাটা হয়ে গেছে, অল্প একটা কাটা বাকি, গাছের নিজের যা ভার তাতেই গাছটা আপনা থেকে ভেঙে পড়বে। আমাদের জীবনেও আমরা দেখি, স্কুলে গেছি, কলেজে

গেছি, পড়াশোনা করেছি, আমাদের মধ্যে একটা আভিজাত্য এসে গেছে। আভিজাত্যের প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের শেখানো হয় না। অঙ্ক যখন শেখান হয়েছিল, দুইয়ে দুইয়ে চার যখন শেখান হল, অঙ্ক কিভাবে কষতে হবে যখন শেখান হল, এখন যত সংখ্যারই যোগ হোক আমরা করে দেব। কিভাবে করে দিচ্ছি? আসলে মূল জিনিসটা আমাদের মধ্যে এসে গেছে, প্রত্যেকটাকে গিয়ে ধরতে হবে না। ধর্ম হল মূল, ওই মূলটা যখন আসে, আলাদা করে বাকি প্রত্যেকটা জিনিসকে গিয়ে ঠিক করতে হয় না, সবটাই নিজে ঠিক হয়ে যায়।

বলছেন, ধর্ম হল যেন বন্যার জল। যেখানে যা আছে সব রিচার্জড হয়ে যাবে। প্রচুর বৃষ্টিপাত যখন হয়, নদী তো ভরেই যায়, পুকুরগুলোও ভরে যায়, কুয়োগুলো ভরে যায়; তার থেকেও বেশী কুয়োকে যে চ্যানেলগুল যোগান দেয় সেই চ্যানেলগুলিও পুরো চার্জড আপ হয়ে যায়। অবতার যখন আসেন তখন সব কিছু চার্জড হয়ে যায়। ওনারা এই দিকে কখনই দৃষ্টি দেন না। এটা একটা দিক। তাহলে সমাজ যে জিনিসগুলোকে মানে, এগুলো কি কুসংস্কার? এগুলো কি অন্ধ বিশ্বাস? এটা বলা খুব মুশকিল। এর আগেও অন্যান্য জায়গায় আমরা এই জিনিসটাকে নিয়ে কয়েকবার আলোচনা করেছি।

আমরা যেটাকে লক্ষণ বলি, সংস্কৃতে শব্দটা হল নিমিত্ত। গীতাতে আমরা নিমিত্ত শব্দ পাই, গীতার প্রথমের দিকে অর্জুন বলছেন – *নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব*, হে কেশব, এই যে যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে এর লক্ষণগুলো কিন্তু আমি ভাল দেখছি না, সব কিছু বিপরীত দেখছি, আমার ধারণা যে এতে সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। এটাই আবার পরে যখন আসছে, তখন ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন*, অর্জুন, এদেরকে আমি আগেই মেরে রেখেছি, তুমি শুধু নিমিত্ত হও, তুমি সামনে এসো। তুমি যদি নাও আস তাতে কিছু আসে যায় না, আমি আর কাউকে নিমিত্ত করে নেব। ঠাকুরও মাস্টারমশাইকে বলছেন, একটা সময় মাস্টারমশাই লেখালেখি করবেন না বলে ভাবছেন, ঠাকুর বলছেন, কারিগরের কাছে অনেক কল থাকে, একটা কল কাজ না করলে আরেকটা লাগিয়ে দেন। কথামৃতের কথাগুলো আসবেই, মাস্টারমশাই হলেন সেই কল, যেখান দিয়ে কথাগুলো বেরোচ্ছে। মাস্টারমশাই যদি না থাকতেন কিছুই হত না, ঠাকুর আরেকজনকে আশ্রয় করতেন, তাঁর মাধ্যমে কথামৃত বেরিয়ে আসত। এটাকে বলা হয় নিমিত্ত।

তার মানে নিমিত্ত দুটো অর্থে হয়, গীতাতেই দু-বারই এসেছে। রামায়ণ, মহাভারত আদিতে নিমিত্ত শব্দ অনেকবার পাওয়া যাবে। নিমিত্তের একটা অর্থ হয়, তোমাকে আশ্রয় করে বা তোমাকে সামনে রেখে আর দ্বিতীয় অর্থ হয় লক্ষণ, যে অর্থে আমরা এখানে ব্যাখ্যা করছি। পুরো জিনিসটাকে যদি এক সঙ্গে নেওয়া হয়, এর অর্থ কিছুটা হল ঝড় আসার আগে আকাশ কালো হয়ে যায়, প্রকৃতির সব কিছু থেমে গিয়ে বিশেষ ভাবে শান্ত রূপ নেয়। তারপর হঠাৎ মিষ্টি বাতাস চলতে শুরু করে। এখন এই যে মিষ্টি বাতাস চলতে শুরু করল, এটাই হল নিমিত্ত। মিষ্টি বাতাস বইছে বলে পরে ঝড় হতে যাচ্ছে বা প্রকৃতি শান্ত হয়ে গেছে বলে কি ঝঞ্ঝা আসছে? নাকি ঝঞ্ঝা আসছে বলে প্রকৃতি শান্ত হয়ে গেছে। যারা জানে তার জানে যে, ওই ঝঞ্ঝা আসছে বলে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার মানে নিমিত্ত, সামনে যে থাকে ওর কোন দোষ নেই। একটা ভয়ঙ্কর কিছু হতে যাচ্ছে, কি শুভ কিছু হতে যাচ্ছে, তারই লক্ষণ এই ভাবে দেখা যাচ্ছে।

এখন যে সমাজ যত পুরনো, তার এই সামাজিক জ্ঞান অনেক বেশি থাকবে। অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কিছু দেখছে বলে অনেক কিছুকে গুছিয়-গাছিয়ে সামনে রাখে। এর মধ্যে অনেক কিছু আছে, যেমন খুব নামকরা হল, বেড়াল যদি রাস্থা কাটে। বেড়াল রাস্থা কেটে দিল, এটাকে বলে খটকা, ওখানে থেমে যেতে হয়। এগুলো অনেকে মানে, অনেকে মানে না। আমার নিজের বিশ্বাস, এবং আমার নিজের এতদিনের যেটা ধারণা, এই খটকাগুলো collective হয় না, এটা ব্যক্তিগত হয়। ব্যক্তিগত হওয়া মানে, আপনি দেখবেন আপনার সঙ্গে কিছু কিছু জিনিস হয়। যেমন খুব নামকরা একটা আছে –

এক শালিক দেখলে খারাপ হয়, দুই শালিক দেখলে ভাল হয়। আমি ঠিক করেছি, এক শালিক মানে রাজা, রাজা একাই হয়। এমন হয়েছে যে, এখন এক শালিক দেখলে আমি বেশি খুশিই হয়। কারণ আমি জানি, এক শালিক দেখেছি তার মানে আজকের দিনটা ভাল যাবে, রাজার মত যাবে। এক শালিক দেখলে আমার কখন খারাপ যায় না, কারণ আমি ওটাকেই ধরে নিয়েছি। বেড়ালের রাস্থা কাটাকেও আমি মানি। আমি কয়েকবার দেখেছি, একটা খুব দরকারি কাজে যাচ্ছি, বেড়াল রাস্থা কেটেছে, এখন উপায় নেই আমাকে যেতেই হবে, ঠাকুরের নাম করতে করতে বেরিয়ে গেছি। আবার গোলমাল হতেও দেখেছি। তাই এর মধ্যে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল আমরা জানি না। এটা খাটবে কি খাটবে না, জানা নেই। যদি একশ ভাগ ক্ষেত্রে খাটত, তাহলে বিজ্ঞান বলত, পঞ্চাশ ভাগের উপরে এর probability আছে, কিন্তু এটা বলছে না যে এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। এটাকে নিয়ে কেউ studyও করছে না। এগুলোকে বলে personal beliefs। প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু কিছু নিজস্ব বিশ্বাস থাকে, যেটাকে অবলম্বন করে মানুষ চলে। ওই জায়গাতে হাত দিতে নেই, ওখানে হাত দিলে গোলমাল বেঁধে যাবে। এটাকে আবার অনেকে বলে personal myths। মানুষ নিজের মত অনেক কিছু মানে, অনেক কিছু মানে না, সব কিছুতে হাত দিতে নেই। সবচেয়ে ভাল হয় মানুষের মধ্যে যখন শিক্ষার প্রসার আসে তখন অনেক কিছু জিনিস নিজে থেকেই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাদের এখানে সারা বছর কত আবর্জনা জমতে থাকে, যেই ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এলো, সব ধুয়ে মুছে সাফ্ হয়ে গেল।

গীতায় সেইজন্য ভগবান বলছেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানং কর্মসঙ্গিনাম্*, অন্য জিনিসের জন্য বলছেন – যারা কর্ম করে তাদের বুদ্ধিভেদ করতে নেই। বুদ্ধিভেদ করতে নেই মানে, মিছিমিছি বলতে নেই যে, তোমার এটা ভুল, এটা ঠিক না; এগুলো করতে নেই। *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বানযুক্ত সমাচারন্* - তুমি নিজে বিদ্বান, কিন্তু তুমি তাদের মতই করতে থাক, সেখান থেকেই ওকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যাও। অবতারদের কথা যেটা বলা হল, ওনারা ঠিক এটাই করেন। ওনারা অযথা এই কথা বলে কোন বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদে নামতে যান না যে, তোমার এটা ঠিক, এটা ভুল। এসব করতে গেলে মারামারি লেগে যাবে। ইদানিং একটা খুব সুন্দর শব্দ এসেছে politically correct। আমরা ইউটিউবে যে লেকচারসগুলো দিচ্ছি, তার উপর মাঝে মাঝে খুব কড়া কড়া মন্তব্য আসে – আপনি ওটা কেন বললেন, এটা কেন বলছেন। অনেক সময় উপেক্ষা করি, অনেক সময় ডিলিট করে দিই। কারণ এরা চায় আপনাকে সব সময় politically correct হতে হবে। শেষে দেখা যাবে, একটা কোন সাধারণ কথা বলেছিলেন, যেখানে আপনার ভুল কিছু করার কোন intention নেই, সেটাকে নিয়ে এমন তোলপাড় মাচাবে যে আপনার কাজটাই বন্ধ করে দেব। অবতারদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হয়, তাঁরা জানেন যে politically correct যদি না থাকেন, যদিও ঠাকুর বলছেন, আমি তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না, কিন্তু সমাজ উদ্ধারে যে নেমে পড়েন, সেখানে এমন মারামারি, এমন ঝগড়া-ঝাটি লাগবে যে, আসল কাজটাই অসম্পূর্ণ হয়ে থেকে যাবে।

সেইজন্য অবতাররা কক্ষণ সমাজের এই জিনিসগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন না, যেমনটা আছে, তেমনটাই ছেড়ে দেবেন। বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করতে হবে, করুন; বিধবা বিবাহ করা যাবে না, করবেন না। আচার্য শঙ্করও তিনি যখন ভাষ্য লিখছেন, তিনি তখন ঠিক তাই করেছেন। শাস্ত্রে যেখানে যা আছে সেটাকে তিনি ইয়েস করে গেছেন, হ্যাঁ এটাই ঠিক। সৃষ্টি আছে – সৃষ্টি আছে, সৃষ্টি নেই – সৃষ্টি নেই। শাস্ত্র যেখানে বলছে, ভগবান সৃষ্টি করেছেন, আচার্যও সেখানে বলে দিচ্ছেন, হ্যাঁ ভগবান সৃষ্টি করেছেন। আবার শাস্ত্র যখন বলছেন, ব্রহ্মই সত্য বাকি সব মিথ্যা; আচার্যও বলছেন, ব্রহ্মই সত্য বাকি সব মিথ্যা। Provided যতক্ষণ আপনি বলছেন একমাত্র আত্মাই সত্য, এই সত্যটাকে আপনি যদি মেনে নেন, বাকি সব কিছুকে উনি মানতে রাজী আছেন। ঠাকুরও তাই করছেন, ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না। যতক্ষণ আপনি বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু; যদি এগুলো সত্যিকারের অবস্তু হয়, তাহলে টিকটিকি পড়াটা আপনি মানলেন কি, মানলেন না, তাতে কি আসে

যায়। ওটাকে মানলেও যা, না মানলেও তাই। মূল বক্তব্য সমাজ এই জিনিসগুলিকে মানে, কারণ অনেক দিন ধরে যখন দেখে আসছে, বিজ্ঞানেও যেমন হয়, যেমন observation, measurement এই জিনিসগুলিকে করে করে ওনারা একটা structure দাঁড় করান, এটাকে ওনারা বলছেন বিজ্ঞান। নূতন কোন ডাটা আসার পর যখন দেখছেন ওটা মিলছে না, তখন ওনাদের যে মডেল, ওটাকে পাল্টে নেন। সমাজেও ঠিক তাই হয়। হাজার হাজার বছরে দেখে আসছেন এ-রকম হলে এ-রকম হয়, তখন ওটাকে ওনারা সিস্টেমে নিয়ে নিতেন।

আমাদের পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, উনি জ্যোতিষবিদ্যাকে খুব মানতেন, খুব বিদ্বান ছিলেন; ওনার নামেই শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। একবার মায়াবতী থেকে উনি ফিরছেন, পথে প্রচুর বিভ্রাট, এত বিভ্রাট হয়েছিল যে তিনি মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে পথঘাট ভাল ছিল না, ঘোড়ার পিঠে চেপে আসতে হত। উনি ঘোড়ার পিঠে বসেছেন। হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি আরম্ভ হল, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছাতাটা খুলেছেন, ছাতা খুলতেই কিভাবে বাতাসে ঘোড়ার মুখের কাছে ছাতাটা চলে গেছে। ঘোড়া ভয়ে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে। ঝোপঝাঁড়ের মাঝখান দিয়ে যেতে গিয়ে গায়ে কাটা লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড। যাই হোক কোন ভাবে পৌঁছালেন। উনি কেবলই তখন জ্যোতিষবিদ্যার কি একটা শ্লোক আছে, সেটা আউড়ে যাচ্ছেন – এই নক্ষত্রের অবস্থানে যে যাত্রা করে তার মৃত্যু হবেই হবে। এখন ট্রেন ধরার জন্য বেরোতেই হবে, কোন উপায় ছিল না। অন্যরা যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের কিছু হয়নি।

এগুলো কি হয়, কেন হয়, আমরা জানি না। এগুলো যেমন আছে তেমনটাই রাখতে হয়, হাত দিতে নেই। যারা মানে তারা মানুক। ঠাকুরও সবটাতেই আছেন, এটাতেও আছেন, ওটাতেও আছেন। এই জিনিসগুলো যেগুলো ঠাকুর এখানে বলেছেন, এগুলোকে খুব বেশি সিরিয়াসলি নিতে নেই। আমি রাম মহারাজের কাছে যেতাম, ওনার কাছে অনেক কিছু শিখেছি। একদিন ওনার কাছে বসে ছিলাম, উঠে চলে আসব, ঠিক সেই একটা টিকটিকি আওয়াজ করেছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বসিয়ে দিলেন, একটু দাঁড়িয়ে যাও, এটা খটকা হয়ে গেছে। আমি হেসে ফেলেছি, খুব বেশি মানতাম না। মানলেও কিছু না, না মানলেও কিছু না। কিন্তু যিনি আচার্য, যিনি অবতার, তিনি যদি এগুলো মেনে থাকেন, তখন ওটা বুঝতে হয়ে কি কারণে তিনি মেনেছেন। উনি সমাজে অযথা কোন বিরোধিতাতে যাবেন না। অল্প একটু যেটা উনি বলেন, সেটা হল খুব কমে যেটা চলে যায়, তাতেও আপনি যদি তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখেন, যেমন শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে আছেন, থেকে থেকে ওখানকার লোকেদের নামে বলছেন এই পোড়ো দেশে শুধু জাতপাত। জাতি নিয়ে গ্রামে পুরো সমস্যা লেগে থাকত, সেইজন্য মা ওদের পুরোটাই মেনে চলছেন। গ্রামের সবাই যদি বিরোধিতাই করে দেয়, তাহলে তো আর কোন কাজই করা যাবে না, সবই তো শেষ হয়ে যাবে। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন এগুলো মানতে হয়। এই ধরণের কিছু কথা বলার পর, ঠাকুর আরও একটা দুটো কথা বলার পর বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ - ... ... ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না? কামিনী-কাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে কি করে সেদিন ও-কথাটা বললে যে, আমার কাছে একজন পরমহংস এসেছিলেন, বাবা তাঁকে কুঁকড়ো রেঁধে খাওয়ালেন। (বলরামের হাস্য) 'আমার অবস্থা' এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ হলে একটু খেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না – তবে আঙুলে করে একটু চাখি, পাছে মা রাগ করেন। (সকলের হাস্য)

এখানে এই যে বলছেন কামিনী-কাঞ্চনই মায়া, এই কথা কথামৃতে ঘুরে ঘুরে আসে। একটা ঘটনা শুনেছিলাম। আমেরিকার এক সেন্টারে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক এসেছিলেন। সেই সেন্টারের অধ্যক্ষ তাঁকে কথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ 'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' পড়তে দিয়েছিলেন। বইটা দেখিয়েছেন, দেখার পর বলছেন, 'আমার এ-সবে আগ্রহ নেই'। বইটা তিনি নিলেন। ছ-মাস পরে এসে

বলছেন, 'পড়ে দেখলাম সবটাই সত্য কথা'। এই কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে যেটা এই বইতে বলছেন, সত্যিই পুরো জগৎ এই দুটোকে নিয়েই চলছে, এর বাইরে আর কিছু নেই। উপনিষদ কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে কিছু বলে না। উপনিষদ যাঁরা পড়তেন, যাঁরা পড়াতেন তাঁরা একটু সভ্য লোক ছিলেন, তাঁদের একটা আভিজাত্য ছিল, পড়াশোনা ছিল।

উপনিষদে তাঁরা তিনটে জিনিস বলছেন – পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা। মানুষ যখন সভ্য হয়ে যায়, তখন তারা এই তিনটি জিনিস চায় – আমার একটা সন্তান হোক; দ্বিতীয়, আমার কিছু টাকা-পয়সা হোক যাতে সংসারে সুখে থাকতে পারি; আর তৃতীয়, মৃত্যুর পর আমি যেন স্বর্গে যেতে পারি। ঠাকুর যখন এসেছেন, তখন ওই আভিজাত্যটা চলে গেছে, আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিটা চলে গেছে, থেকে গেছে শুধু একটা সাধারণ জীবন-যাপন, কোন রকমে জীবন চালিয়ে যাওয়া। ঠাকুর এগুলোকে পাল্টে দিয়ে বলছেন – কামিনী-কাঞ্চন।

নিউজপেপারে, ইন্টারনেটে স্ক্যাণ্ডালগুলি যদি আমরা দেখি, সেখানে প্রথমে আমরা পলিটিক্যাল সিদ্ধান্তগুলিকে নিয়ে চেঁচামেচি দেখতে পাই, যা সারা বিশ্বেই আছে। কিন্তু সত্যিকারের যেটা স্ক্যাণ্ডাল, যেখানে নামকরা লোকগুলোকে উপড়ে ফেলে দেয়, তার সব কটায় জড়িয়ে আছে কামিনী আর কাঞ্চন। হয় কোন কামিনীর ব্যাপার ছিল, নয় প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছে। জাপানকে এত সৎ ও নিষ্ঠবানদের দেশ বলা হয়; কিছু দিন আগে ওদের প্রাইম মিনিস্টারকে সরে যেতে হল – তার বিরুদ্ধে এত বড় ঘুষের কেলেঙ্কারি। সারা বিশ্ব জুড়ে এই জিনিস চলছে আর সব রকমেরই আছে, চার্চে আছে, আমাদের হিন্দুদের সাধু-মহাত্মাদের আছে, রাজনৈতিক নেতাদের আছে। খুব নামকরা, যাকে সমাজ সম্মান দেয়, হঠাৎ দেখা গেল কোথা থেকে একটা মেয়ে এসে অভিযোগ করল, উনি আমার সঙ্গে দুষ্কর্ম করার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যস, তার নাম, সম্মান সব ধুলোয় নামিয়ে আনল।

কামিনী আর কাঞ্চন ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন তো অনেক পরে, তার আগে সমাজেই দাঁড়ানো যায় না। তাই বলে, কামিনী-কাঞ্চনে যদি কারুর মন লিপ্ত থাকে, সমাজই তাকে উপড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক পথে আছেন, ষোল আনা মন যদি তাঁর ঈশ্বরে না থাকে, এই পথে চলা যাবে না। যতটুকু দিলাম, ততটুকু পেলাম, এটা হবে না। আগেকার দিনে ওজন মাপার মেশিনে দাঁড়িয়ে দশ পয়সা ফেলে দিলে তার ওজন জানিয়ে একটা স্লিপ মেশিন থেকে বেরিয়ে আসত। এখনও অনেক জায়গায় দেখা যায়। অল্প বয়সে খুব মজা লাগত, বিশেষ করে ওই কাগজে ভাগ্যটাও লেখা থাকত, ভাগ্যটা জানার জন্য মেশিনে দাঁড়াতে মজা লাগত। তখন তো বুঝতাম না যে, আমার ভাগ্যটা তো পাল্টাবে না, যারা আমার পয়সাটা পাচ্ছিল তাদের ভাগ্যটা পাল্টে যাচ্ছিল। ইদানিং বিভিন্ন এয়ারপোর্টে দেখা যায়, ওদের এই রকম আছে, কয়েন দিলে জিনিস বেরিয়ে আসবে। এক টাকার কয়েনই দিতে হবে, এক টাকার কয়েন না দিয়ে আপনি আট আনার কয়েন দিচ্ছেন, যত খুশি আপনি আট আনার কয়েন দিয়ে যান, জিনিস আর বেরোবে না। ওর এক টাকা মানে এক টাকা।

ধর্ম পথে, ঈশ্বরের পথে ঠিক এটাই হয়, হয় পুরো নয় জিরো। আমাদের বাস্তবিক জীবনে এ-রকম হয় না। আপনি বাজারে আনাজ কিনতে যান, আনাজের দাম যদি বেড়ে যায়, আপনার কাছে পয়সা কম আছে, আপনি না হয় একটু কম আনাজ কিনে চলে আসবেন। আপনি বলবেন, হে প্রভু আমার ভক্তিটুকু কম, তোমার পুরোটা নিলাম না, তোমার প-টুকু কি মুণ্ডু-টুকু নিয়ে এলাম, না এ-ভাবে হবে না। কামিনী-কাঞ্চনের দেহের সাথে সরাসরি সম্পর্ক। কাঞ্চন মানে দেহসুখ, দেহসুখ মানেই কাঞ্চন। কামিনীও তাই – দেহসুখ। মানুষের মন দেহের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে যে, দেহের যদি কিছু হয় মনকে একেবারে আলোড়িত করে ছাড়বে। দেহের এই সুখের ইচ্ছা, যেভাবে হোক একটা সুখ পাব, এই ইচ্ছার একটু আঁশও যদি থাকে, আঁশেরও আঁশ যদি থাকে, একদিকে যেমন বলা হল ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারবে না; অন্য দিকে এটা হল ভাইরাস। ভাইরাসটা কি মৃত জিনিস না জীবন্ত কিছু, এটা

কেউ জানে না। ভাইরাসকে জমিয়ে ক্রিস্টালাইজড করে পুরো পাথরের মত বানিয়ে দিতে পারেন, ওটাকে আপনি টুকরো টুকরো করে দিন; ক্রিস্টালাইজেশান হল পিওরিটির শেষ কথা, ভাইরাস একেবারে পিওর হয়ে গেল। আপনি যত দিন খুশি রেখে দিন, বার বছর, চোদ্দ বছর পাথরের মত পড়ে থাকবে। এবার ওর অনুকূল যে পরিবেশ সেখানে একটা ছোট্ট টুকরো দিয়ে দিন, রাতারাতি আবার পুরো ভাইরাস জন্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ভাইরাস এমন বিচিত্র জিনিস বলেই বৈজ্ঞানিকরা কিছু করতে পারছেন না, তাঁদের মাথায় হাত পড়ে যায়। আমাদের আশেপাশে হাজার হাজার ভাইরাস ঘুরছে। যেমনি বৃষ্টি পড়ল, আবহাওয়াটা একটু পাল্টালো, আমাদের শরীরটাও একটু অন্য রকম হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস আক্রমণ করবে। এই শরীরে এতক্ষণ সে কিছু করতে পারছিল না, এবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উলটে ফেলে দেবে।

কামিনী-কাঞ্চন জিনিসটা ঠিক তাই, ভাইরাসের মত। তাকে আপনি নিংড়ে শুকিয়ে পাথর বানিয়ে ফেলে দিয়েছেন, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। যেমনি তার মনের মত একটা অবস্থা পাবে, যেখানে ভোগ করা যেতে পারে বুঝে গেল, রাতারাতি দেখা যাবে ফেকড়ি আর বেরিয়ে আসছে না, পুরো অশ্বত্থ গাছটাই বেরিয়ে এসেছে। কামিনী-কাঞ্চন জিনিসটা এই রকমই। যত বড় সাধু সন্ন্যাসী হন, বিশ্বামিত্রের মত এত বড় সন্ন্যাসী, উনি সব কিছু থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁর মনে একটাই বাসনা – আমি ব্রহ্মর্ষি হব আর বশিষ্ঠের সমকক্ষ হব। মাঝখান থেক মেনকা এসে দুটো ডান্স মারল, বিশ্বামিত্র উলটে পড়ে গেলেন। এটাই ঠাকুর বারবার সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছেন। ওই যে আমরা বললাম, যারা পলিটিক্যালি কারেক্ট বলেন, তারা বলবে, আপনারা কি বলতে চাইছেন? মেয়েরা খারাপ বলতে চাইছেন? না, না, মেয়েদের খারাপ কেন বলব। ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বলতেন উনি পুরুষকে নিয়ে বলছেন। অর্থ হল কাম ভাব, যেটা দিয়ে জগৎ চলে। আমরা তো আর পশুপাখি না যে অন্য ভাবে শক্তি দিয়ে হবে, আমাদের যেটা হয় সেটা টাকা-পয়সা দিয়ে হয়।

যার কামিনীর প্রতি দুর্বলতা নেই, তাহলে টাকা রাখতে যাবে কেন। এরপরেও যদি সে টাকার পিছনে দৌড়ায়, তাহলে বুঝতে হবে সে মানসিক ভাবে দুর্বল। চার্লস ডিকেন্সের খুব নামকরা একটা বইয়ের নাম স্ক্রুজ, স্ক্রুজের ওই টাকার রোগ আছে, খালি টাকা জমাবে, কাউকে পয়সা দেবে না, ওটা ওর রোগ, এক ধরণের মানসিক রোগ। টাকার দরকার হয় শুধু ঘর চালানোর জন্য। ঘর চলে মানে একজন গিন্নি আছে, গিন্নি না থাকলে ঘরে চলে না। ঘুরে ফিরে ওই একটা জিনিসকে নিয়েই বলা হয়। কিন্তু দ্বিতীয়টা অর্থাৎ কাঞ্চন, এটা যদি গিন্নি না থেকেও হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটা মানসিক ব্যাধি।

ঠাকুর নিজের মত কথা বলছেন। অনেক আগে আমি কানপুর সেন্টারে ছিলামে। ওখানে একজন ডাক্তার ছিলেন, উনি কানপুরেরই লোক। কিভাবে কিভাবে উনি কথামৃত পড়েছিলেন, তারপর বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছিলেন। উনি আমাকে বলছেন, আপনাদের মন্দিরে যে পাঠগুলো হয়, আমার খুব ইচ্ছে এটা না করে, ঠাকুর যে-রকম নিজের মত বলে যাচ্ছেন, এটা হলে কত ভাল হত। পাঠগুলো ভাল, ওখানে ব্যাখ্যা আদি করছেন, কিন্তু কথামৃতে যেখানে সব রকমরেই কথা হচ্ছে, কিন্তু ঘুরে ফিরে সব সময় ঈশ্বরীয় কথা।

"আচ্ছা আমার একি অবস্থা বল দেখি। ও-দেশে যাচ্ছি বর্ধমান থেকে নেমে আমি গরুর গাড়িতে বসে – এমন সময় ঝড়বৃষ্টি। আবার গাড়ির সঙ্গে কোত্থেকে লোক এসে জুটল। আমার সঙ্গের লোকেরা বললে, এরা ডাকাত! আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখন রাম রাম বলছি, কখন কালী কালী, কখন হনুমান, হনুমান – সবরকমই বলছি, এ কিরকম বল দেখি"।

ঠাকুর বা যে কোন পরমহংস বিভিন্ন অবস্থায় থাকেন। যখন তাঁর বালকের অবস্থা হয়, তখন তাঁর অবস্থা এই রকমই হয়। স্বামীজী এক সময় লণ্ডনে ছিলেন। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ রব উঠল একটা ষাঁড় আসছে। স্বামীজীর সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি একটা গলিতে লুকিয়ে গেলেন। স্বামীজী রাস্তায়

দাঁড়িয়ে থাকলেন। ষাঁড়টা এলো, স্বামীজী একটু শুঁকে চলে গেলে। সেই ভদ্রলোক খুব লজ্জা পেয়ে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা ষাঁড়টা যখন তেড়ে আসছিল তখন আপনি কি ভাবছিলেন'? ভদ্রলোক ভাবলেন, স্বামীজী খুব উচ্চ একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বলবেন। স্বামীজী বললেন, 'আমি হিসাব কষে দেখছিলাম, ষাঁড়টা যদি ছুঁড়ে ফেলে আমি কত দূর গিয়ে পড়ব'। আমরা ইষ্ট নাম করি, মাঝে মাঝে বলি হে ঠাকুর রক্ষা কর। ঠাকুরও এই জিনিস করছেন, কথায় কথায় মা কালীর কাছে যাচ্ছেন, নরেন হয়ত কিছু বলে দিয়েছেন তাতে ঠাকুরের সমস্যা হয়ে গেছে, মেটাবার জন্য দৌড়ে মা কালীর কাছে চলে গেলেন। এগুলো একটা অবস্থা। আমরা নিজেরা সন্ন্যাসীদের মধ্যে মাঝে মাঝে মজা করে বলি, এমন অবস্থা কখন সখন হয়ে যায়, তখন কখন ওকে ডাকছি, কখন তাকে ডাকছি। কিন্তু ভগবান সেই এক। একটু পরেই ঠাকুর বলবেন, ভগবান কখন রাম রূপ ধরে আসছেন, কখন কালী রূপ ধরে আসছেন, কখন দূর্গা রূপে আসছেন, তখন আবার দশ রকম অস্ত্র ধারণ করতে দেরী করে ফেলেন, ততক্ষণে যা গোলমাল হওয়ার ছিল হয়ে যায়। সেইজন্য ভগবান ঠাকুরকে রক্ষা করার জন্য আর কেউ এলেন না। কিন্তু ঠাকুরের এগুলো হল বালক স্বভাব। সব সময় যে এই স্বভাবে থাকছেন তা না। এই যে বলছেন, আমার এ কিরকম অবস্থা বল দেখি? অবস্থা পালটায়, আর যাঁরা সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন, তাঁদেরও অবস্থা পাল্টাতে থাকে, এক সময় এক রকম ভাব, পরে অন্য সময় অন্য রকম ভাব। এরপর আবার সেই কামিনী-কাঞ্চনকে নিয়ে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি – কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায় – মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয় – বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

শুধু কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরেই না, যে কোন জিনিসের ভিতরে থাকলে হুঁশ চলে যায়। বলছেন, মনে হয় বেশ আছি। মেথরের উদাহরণ দিচ্ছেন। এখন যে বয়সে আছেন, যখনই দরকার পড়ে একটা মিথ্যা কথা বলে দেন। কিন্তু বাচ্চা বয়সে মা-বাবা, স্কুলের মাস্টাররা বলে দিয়েছেন মিথ্যা কথা বলতে নেই, তখন মিথ্যা কথা বলতে সাহস হত না। কিন্তু প্রথম যেদিন মিথ্যা কথা বলতে হল, তখন আমাদের কি অবস্থা হয়েছিল ভাবুন – ঠোঁট আড়ষ্ঠ হয়ে আসছিল, হাত-পা কাঁপছিল। লোকেরা ভাবছে আপনি ভয়ে কাঁপছেন, আসলে কাঁপছেন অন্য কারণে, মিথ্যা কথা বলার জন্য কাঁপছেন। তারপর দেখলেন, ধরা তো পড়লাম না। তাই তো মিথ্যা কথা বলা তো সোজা জিনিস। জিম করবেট বলছেন, বাঘ মানুষকে খুব ভয় পায়। কিন্তু অনেক দিন শিকার না পেয়ে খিদেয় যখন পিছন থেকে মানুষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে, তখন দেখে আরে, একে তো মারা খুব সোজা ব্যাপার। সেখান থেকে বাঘ man-eater, মানুষ-খেকো হয়ে যায়, আমরা সে-রকম truth-eater হয়ে যাই। যখন তখন দুমদাম মিথ্যা কথা বলে যাই। এরপরে মিথ্যার প্রতি যে ভয়, ঘেন্না, এটা চলে যায়। সেইজন্য বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন জিনিসটা, যেটা মনকে টেনে নিচ্ছে, যেটা আগে বর্ণনা করা হল, এই কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি ঘেন্নাটা চলে যায়। সেইজন্য বলছেন, ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

ঠাকুর টিকটিকি পড়া থেকে শুরু করে, কামিনী-কাঞ্চনে গিয়ে, নিজের অবস্থা, যেটা বর্ধমানের রাস্তায় হয়েছিল, সব বলে বলে আবার সেই একটা জায়গায় এনে ফেললেন – ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়। এতক্ষণ যা যা বলছিলেন, এখানে এসে সবটাই শেষ হয়ে গেল। টিকটিকি পড়াকে আপনি মানলেন কি মানলেন না, কামিনী-কাঞ্চন থেকে বেরিয়ে আসতে আপনি কত চেষ্টা করছেন কি করছেন না; কিন্তু একবার যদি ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন করা শুরু হয়, তাহলে ভক্তি আসবে, আর ভক্তিতে এতক্ষণ যা কিছু বলা হচ্ছিল সবেতে ইতি পড়ে গেল। নামকীর্তন মানে, ভাগবতে আমরা যে নবধাভক্তির কথা পাই, সেখানে বলছেন, কোন এক ভাবে যে হবে তা না, অনেক ভাবেই হয়। নামজপ আছে, স্মরণম্ আছে, কীর্তন আছে, পাদসেবম্ আছে, বন্দনম্ আছে ইত্যাদি। এগুলো যত করা হয় তত ভিতরে ভক্তির উদয় হয়, যত ভক্তির উদয় হয় তখন তত কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি ঘেন্না

আসতে শুরু হয়ে যায়। হুঁশ যেন আসতে শুরু হল। এরপর মাস্টারমশাইকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, মাস্টারমশাই কীর্তনাদি অত করতেন না, ওনার অন্য স্বভাব ছিল।

(মাস্টারের প্রতি) – ওতে লজ্জা করতে নাই। 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয় – তিন থাকতে নয়'। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ঈশ্বরের নামে বলা হয়। এটাকে অনেক সময় লোকের মজায় বা অজ্ঞানে বলেন – লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকতে নেই। কিন্তু সমাজে থাকতে গেলে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় পুরো দমে রাখতে হয়। যার এগুলো নেই তার সর্বনাশ অবশ্যাম্ভাবি। কিন্তু যখন ঈশ্বরের নাম করব, আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করবে, সেই সময় এই তিনটে থাকতে নেই। কেশব সেন ঠাকুরকে একটা জায়গায় বলছেন, এখন অতদূর না, লোকে কি বলবে, বলবে গোঁড়া বৈষ্ণব। আমাদেরও অনেক সময় হয়, লোকে কি বলবে। ঠাকুরের মন্দিরে যাব – লোকে কি বলবে; ঠাকুরের নামগুণগান করব – লোকে কি বলবে। ধর্ম জীবনে এই কথাগুলোকে নিয়ে ভাবতে নেই।

পুরো আলোচনার বক্তব্য হল – প্রথমে ঠাকুর ঠিকই বলছেন, এই জিনিসগুলো মানতে হয়। সেখান থেকে আস্তে আস্তে নিয়ে আসছেন এই বক্তব্যে – ঈশ্বরের নাম করলে যাবতীয় যত বাধক আছে, যা কিছু বিঘ্ন আছে; বিশেষ করে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই জিনিসগুলো, লোকে দেখলে কি বলবে, এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। যদি না বেরিয়ে আসা হয়, তাহলে অপরে কি ভাবছে, অপরে কি বলছে, এই ভাবতে ভাবতেই ভক্তি পথে আর এগোন হয় না। ভক্তি পথে এগোতে না পারা মানেই, কামিনী-কাঞ্চনের জগতের মধ্যেই ঘুরঘুর করতে থাকবে। ফলে, ঠাকুর মেথরের যে উদাহরণ দিচ্ছেন, ওই নোংরার মধ্যে থাকতে থাকতে মনে হবে এটাই তো ঠিক, এটাই স্বাভাবিক। দেখবেন ঠাকুর মাঝে মাঝে বর্ণনা করছেন, বাড়িতে ছেলেপিলে, নাতিপোতা আছে, ডাক্তার আসছে, এ আসছে সে আসছে। মানুষ ওতে রোমে যায়। আমাদের এখানে নূতন ব্রহ্মচারী যখন জয়েন করতে আসে, আমরা দেখেছি, তার বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধবরা কত মন খারাপ করে আর চিন্তা করে অস্থির হয়ে ওঠে – কি করে থাকবে এখানে? কি করে সারাদিন কাটাবে? আমরা সন্ন্যাসীরা সবাই এগুলো পেয়েছি। কিছু দিন পরে আমরা ওদেরকে নিয়ে ভাবি, হে ভগবান, এটাতে ছিলাম; ভাবলে তখন অবাক লাগে। কামিনী-কাঞ্চনের যে জগৎ, ওই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার পর বোঝা যায়, কি দুরবস্থায় ছিলাম। এই পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়। এরপরে কেশব সেনের সঙ্গে নৌকাবিহার।